বিপ্লব-তাপস

মহারাজ ত্রৈলোক্যনাথ

ললিতকুমার সান্যাল

"দেবতার দীপ হস্তে যে আসিল ভবে
সেই রুদ্র দূতে, বলো, কোন্ রাজা কবে
পারে শাস্তি দিতে। বন্ধন শৃঙ্খল তার
চরণ বন্দনা করি করে নমস্কার
কারাগার করে অভ্যর্থনা।"

—রবীন্দ্রনাথ

প্রথম প্রকাশ ঃ
৯ই আগষ্ট ১৯৪৯

প্রকাশক ঃ
মহারাজ ত্রৈলোক্য চক্রবর্ত্তী
স্মৃতিরক্ষা কমিটি
অনুশীলন ভবন
৩২।৮, চণ্ডী ঘোষ রোড,
কলিকাতা-৪০

প্রচ্ছদপট ঃ
শিল্পী ঃ শ্রীশুচিব্রত দেব

মুদ্রাকর ঃ
অজিতমোহন গুপ্ত
ভারত ফোটোটাইপ স্টুডিও
৭২।১, কলেজ স্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

উৎসর্গ

সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে যে মানুষীসত্ত্বা অন্যায়ের প্রতিবাদে মুখর, অপশাসনের বিরুদ্ধে সোচ্চার, অবদমনের গ্লানি হইতে মুক্তি প্রচেষ্টায় জীবনাহুতি দিতেও কুণ্ঠিত হ'ন নাই; রাজনৈতিক নিপীড়ন, সামাজিক কুসংস্কার, আত্মিক কলুষতার অপনোদনে একক হইয়াও সকল অত্যাচার, অনাচার ও অভিশাপ হাসিমুখে বরণ করিয়াছেন, নিজে কাঁটার মুকুট পরিয়া অপরকে কণ্টকহীন করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন, সকল জ্বালা সকল যন্ত্রণা নিজে ভোগ করিয়া মানুষকে অমৃত জীবনের বাণী শোনাইয়াছেন, তিনি খ্যাত হউন বা অখ্যাত হউন, জ্ঞাত হউন বা অজ্ঞাত হউন, তিনি নামী হউন বা অনামী হউন, পথ-পরিক্রমায় আলোকবর্ত্তিকাসম যাঁহারা ছিলেন, যাঁহারা আছেন ও যাঁহারা আসিবেন সেই সকল জীবনের উদ্দেশ্যে প্রণাম জানাইয়া আমার এই গ্রন্থখানি উৎসর্গ করিলাম।

লেখক



ভারত-পরিক্রমায় ত্রৈলোক্যনাথ



শ্রীঅরবিন্দ



ভগিনী নিবেদিতা



প্রমথনাথ মিত্র



দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ



সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রকাশকের নিবেদন

২৪শে জুন, ১৯৪০ সাল; আমরণ সংগ্রামী মহারাজ ত্রৈলোক্যনাথ তাঁর জীবনের শেষ অঙ্কে চির বিদায়ের পূর্বে ভারত তীর্থ পরিক্রমা শুরু করেন। ৪৫ দিন ভারতবর্ষের এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত পর্যন্ত অবিশ্রান্ত পরিক্রমা শেষে ভারত ইতিহাসের অবিস্মরণীয় দিনে ৯ই আগষ্ট মাতা বসুধা আপন ক্রোড়ে টেনে নিয়ে দুরন্ত সন্তানকে চিরশান্ত করে দিলেন। এই ৪৫ দিনের ঘটনা প্রবাহ অবিশ্বাস্য, অভাবনীয়।

যাত্রা শুরুর পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে ওপারে স্বাধীনোত্তর যুগে মহারাজের ২৫ বছরের পুর্ব্ব বাংলায় সংগ্রামের সাথীরা অশ্রুসজল নেত্রে তাঁদের অকৃত্রিম দরদী বন্ধুকে বিদায় দিলেন। সেই বিদায়লগ্নে প্রিয়জন বিরহে মহারাজ নিজেও প্রথমে খানিকটা কাতর হলেন; কিন্তু বিপ্লবী নায়ক সামলে নিলেন স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতেই—সান্ত্বনা দিলেন—কিছু ভেবো না, আমি আবার ফিরে আসবো—বেশীদিন নয়; শীঘ্রই আসবো। নিয়তি সেদিন বোধহয় অলক্ষ্যে হেসেছিল; মহারাজের আকাঙ্ক্ষা অপূর্ণই রয়ে গেল।

এপারে সেদিন অভিনব দৃশ্য—দারুণ চাঞ্চল্য, ভীষণ উন্মাদনা। সমগ্র সীমান্ত অঞ্চলটি জুড়ে উৎসবের সজ্জা। কত গাড়ী—সরকারী বেসরকারী—কত জনসমাগম—জানা অজানা লোক ছুটে এসেছে স্বাগত জানাতে। ভারত-সীমানায় প্রবেশের সাথে সাথে শুরু হল সম্বর্ধনার পালা। কলকাতা মহানগরী তখন বিপ্লব-তাপসের সম্বর্ধনার জন্য প্রস্তুত। নাগরিকবৃন্দের প্রতিনিধি কলকাতা কর্পোরেশন জানালেন সম্বর্ধনা। শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন বিভিন্ন বিপ্লবী গোষ্ঠী একত্র সমাবেশে; ছোট বড় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান আত্মীয়

স্বজন জানালেন তাঁদের আবেগ-সমৃদ্ধ শ্রদ্ধা—মালায় মালায় আর ফুলের তোড়ায় মহারাজকে ঢেকে ফেলা হল। মহারাজ অভিভূত। একি দৃশ্য! কল্পনাতীত, অবিশ্বাস্য! অন্তরঙ্গরা পরামর্শ দিলেন—একটু ধীরে, চিকিৎসা আগে হোক। মহারাজ স্মিত হাস্যে তাঁর অতি প্রিয় বন্ধু শ্রীভূপতি মজুমদার মশাইকে বললেন—"যাবার ডাক শুনেছি; সময় কম অনেক কাজ, অনেকের সাথে শেষ দেখা শেষ করতে হবে, এবার আর বাধা দেবেন না।' প্রাজ্ঞ ঋষি-অন্তিমের পদধ্বনি পূর্ব্বাহ্নেই শুনেছিলেন। তাই সময় আর বেশী নেই জেনেই দেশের একপ্রান্ত থেকে অপরপ্রান্ত পর্যন্ত নিরলস ছুটে বেড়িয়েছেন। যাঁরা অতিবৃদ্ধ অশক্ত চলৎশক্তি রহিত অথচ যৌবনে দুর্দ্ধর্ষ সংগ্রামী বলে খ্যাত ছিলেন তাঁদের সাথে বাড়ীতে বাড়ীতে যেয়ে দেখা করতে হবে—করেছেনও তাই। যৌবনকেও যেন হার মানিয়েছেন।

কিন্তু সম্বর্ধনার এই বিপুল আয়োজন দেখে একটি প্রশ্ন আমাদের সামনে এসে উপস্থিত হয়: স্বাধীনতা লাভের পর বিগত ২৫ বছরে জনসাধারণ দূরের কথা, মহারাজের অনেক ঘনিষ্ঠ এবং অতীতের বহু বৈপ্লবিক কর্ম্মের অন্তরঙ্গ সাথীও তাঁকে প্রায় ভুলেই গিয়েছিলেন। এখবরও হয়ত অনেকের জানা নেই যে বছর কয়েক আগে মহারাজ আর একবার অল্প কিছুদিনের জন্য পশ্চিমবাংলায় এসেছিলেন এবং পাকিস্তানে নির্য্যাতিত জীবন-যাপন করেও ভারতের আত্মীয় স্বজনদের ভুলে যান নি। সকলের সাথে দেখা করে গিয়েছিলেন। কিন্তু কই, তখনতো এবারের মতো এমন ঘটা করে শ্রদ্ধা সম্বর্ধনা জানানো দূরের কথা তেমন খোঁজ-খবরও অন্তরঙ্গ ছাড়া কেউ বড় একটা নেয়নি। কিন্তু স্বল্প কয়েক বছরের ব্যবধানে এমন কি কারণ ঘটল যে এই বিস্মৃত-প্রায় অশীতিপর বৃদ্ধের দর্শনের জন্য লক্ষ লক্ষ জানা অজানা মানুষের প্রাণ এমন ব্যাকুল হয়ে উঠল!

অন্তরঙ্গরা এবার লক্ষ্য করেছিলেন মহারাজ যেন কোন এক অদৃশ্য নিয়ন্তার নির্দেশে বিশেষ এক নতুন বার্ত্তা বহন করে পূব্ব বাংলার আসন্ন সংগ্রামের অগ্রদূতরূপে এসেছেন ভারতাত্মার কাছে সে বার্ত্তা নিবেদন করতে। ভারতবর্ষের আপামর জনসাধারণ মহারাজের সেই ভূমিকাকে শ্রদ্ধার সঙ্গে, প্রীতির সঙ্গে বরণ করে নিল।

ভারতের প্রাণ কেন্দ্র দিল্লী। পৌছাইবা মাত্র ষ্টেশন থেকেই শুরু হল সম্বর্ধনার পালা। ৬ই আগষ্ট লোকসভার অধ্যক্ষ শ্রীধীলনের সভাপতিত্বে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ও তাঁর মন্ত্রী সভার সদস্যবৃন্দসহ লোকসভা এবং রাজ্য সভার সভ্যগণ যৌথ সম্মেলনে মহারাজকে সম্বর্ধনা জানান। উত্তরে মহারাজ তদানীন্তন পূর্ব্ব পাকিস্থানে আসন্ন ঝড়ের এমন এক নতুন ছবি আঁকলেন এবং দুই প্রতিবেশীর মধ্যে মৈত্রী সেতুবন্ধনের আশু প্রয়োজনীয়তার উপর এমন সুদৃপ্ত যুক্তি উপস্থাপনা করলেন, যা' অনেকের পক্ষে সম্যক উপলব্ধি করা সম্ভব না হয়ে থাকলেও অন্ততঃ ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধীর মনে বিশেষ রেখাপাত করেছিল। নইলে যাঁর এক মুহূর্ত্ত সময় নেই—কী প্রয়োজনে, কী জানবার উদ্দেশ্যে এই অশীতিপর প্রায়-ভুলে-যাওয়া বৃদ্ধের সাথে তিনি বার বার পরামর্শ করলেন? কী আলোচনা হয়েছিল তাঁদের মধ্যে তা অবশ্য শুধু তাঁরাই জানেন। দু'দিন পরে শ্রীসুরেন্দ্র মোহন ঘোষ মহাশয়ের বাস ভবনে আয়োজিত নৈশ ভোজে শ্রীমতী ইন্দিরা মহারাজকে নিজের হাতে মিষ্টান্ন পরিবেশন করেন। সেদিন সেখানে শ্রীমতী ইন্দিরা ভারতের প্রধানমন্ত্রীর ভূমিকা গ্রহণ করেন নি; তিনি যেন বহুদিন পর তাঁর হারানো পিতাকে কাছে পেয়ে কন্যারূপে আপ্যায়িত করলেন। তারপর মাত্র কয়েক ঘণ্টার ব্যবধান। তিন দিন আগে যাঁরা এই বিপ্লব-তাপসকে রাজকীয় সম্মানে সম্বর্ধিত করেছিলেন, তিন দিন পর দিল্লী মহানগরীতেই তাঁকে অশ্রুজলে শেষ প্রণামে চিরবিদায় দিলেন।

মাত্র কয়েক ঘণ্টা। জ্বালা নেই; যন্ত্রনা নেই, সমস্ত কর্ত্তব্য সমাপন করে নীরবে বিদায় নিলেন—সব শেষ। না, ভুল হল। দেহা বসান মাত্র; সব তো শেষ নয়। তারাশঙ্করের ভাষায়—"এই অন্তিম যাত্রায় বোধ হয় তাঁর জীবন-দেবতা মহারাজের জীবনে তাঁর শেষ অভিপ্রায় পূর্ণ করলেন এবং এই যাত্রা সমাপ্তির শেষ মূহূর্ত্তে তাঁর এই নবকালের বিচিত্র তীর্থ-পরিক্রমা সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে আপন ক্রোড়ে তুলে নিলেন। তাঁর নিবেদন করা প্রেম ও সৌভ্রাত্রের স্বর্ণদীপ এখনও ঘৃতগন্ধে চতুর্দিক স্নিগ্ধ করে উজ্জ্বল শিখায় ভাগীরথী ও পদ্মার দুই তীরে অনির্বান জ্বলছে। সেই শিখার উত্তাপ উজ্জ্বলতার মধ্যেই মহারাজের স্মিতহাস্যের স্মৃতি অম্লান হয়ে থাকবে।"

সেদিন অপরাহ্ণে দমদম বিমান বন্দর মানুষের ভীড়ে ভেঙে পড়ছে। সামরিক বাহিনীর একটি বিমান ত্রৈলোক্যনাথের মরদেহ বহন করে আনছে। লক্ষ লক্ষ দর্শনার্থী উদগ্রীব। নির্ধারিত কার্য্যসূচী বন্ধ করে দিয়ে আকাশবাণী সারাদিন করুন সুরে জনতার ক্রন্দনকেই যেন প্রতিধ্বনিত করে যাচ্ছে। দমদম থেকে নানা জায়গায় থেমে অনুশীলন ভবন ঘুরে দেহ রাখা হল দেশপ্রিয় পার্কে। সারারাত্রি সারিবদ্ধ জনতা শেষ প্রণাম জানিয়ে গেল। পরদিন সকালে শুরু হল অন্তিম যাত্রা কেওড়াতলা মহাশ্মশানের দিকে। আকাশবাণী ধারা বিবরণী দিচ্ছে, করুণ সুর তখনও বাজছে, এতটুকু পথ যেতে কয়েক ঘণ্টা লেগে গেল। সকলেই শেষ বারের মতো প্রণাম জানাতে চায়। মহাশ্মশানে জনতার ক্রন্দন রোলের মাঝে বিপ্লব-তাপসের নশ্বর দেহ ভস্মীভূত হয়ে গেল।

মহাজতি সদনে শ্রদ্ধা নিবেদন করতে যেয়ে বহু যজ্ঞের হোতা প্রবীন বিপ্লবী নায়ক শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ বললেন—"বিধাতার কাজ এখানেই শেষ হল না। মহারাজকে নিয়ে এলেন তিনি দেশবন্ধুর পদতলে, যতীন দাশের পার্শ্বে চিতা শয্যায় চির-নিদ্রাতুর থাকার

জন্য। পুণ্যতীর্থে মহারাজের মরদেহ ভস্মীভূত হল। মহারাজের বিদেহী আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা-জ্ঞাপন-সভার স্থান নির্ণয়ের পিছনেও সেই "মাষ্টার প্ল্যান"-এর নির্দেশ বহাল রয়েছে। নইলে আমরা মহাজাতি সদনে সমবেত হলাম কেন? মহাবিপ্লবী নেতাজীর এই 'মহাজাতি সদন' বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের আশীর্ব্বাদে মহাতীর্থের রূপ ধারণ করে আছে। সেই তীর্থে তাই আমাদের সমবেত হতে হয়েছে বিপ্লবী নায়ক মহারাজকে স্মরণ করার আগ্রহে।"

সর্ব্বত্যাগী এই সন্ন্যাসী পৃথিবী থেকে বিদায়ের শেষক্ষণেও ভারতবর্ষের এ-প্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত পর্যন্ত যা কিছু উপহার সামগ্রী পেয়েছিলেন তার সবটুকুই দান করে গেলেন প্রাণপ্রিয় অনুশীলন ভবনকে। অনুশীলন ভবনও কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করেছে মহারাজের স্মৃতিকে—সর্ব সাধারণের দর্শনের জন্য আজোও উন্মুক্ত করে রেখেছে মহারাজের শবাধারটিকে।

মহারাজ চিরকালের মত স্তব্ধ হয়ে গেলেন সত্য; কিন্তু তাঁর সতীর্থদের ওপর কিছুটা দায়িত্ব দিয়ে গেলেন। তাঁদের যোগ্যতা অযোগ্যতা নিষ্ঠা চতুরতার পরীক্ষা এবার হবে। মহারাজের সুদীর্ঘ এবং বিচিত্র কর্ম্মকাণ্ডের স্মৃতি বিজড়িত ভারতে বিশেষতঃ এপার-ওপার বাংলায় চিতাভস্ম বিলিয়ে দেওয়া, স্মৃতি সৌধ তৈরী করা, রাস্তার নাম মহারাজ স্মরণে নামাঙ্কিত করা— এগুলি মামুলি কাজ। অপেক্ষাকৃত সহজ, অথচ চিরাচরিত। এগুলি করতেও হবে, করাও হয়েছে। কেওড়াতলা মহাশ্মশানে স্মৃতি সৌধ নির্ম্মাণ করে প্রথম মৃত্যু বার্ষিকী তারই পাদদেশে উদ্‌যাপিত হয়েছে এবং তদবধি প্রতি বছর ৯ই আগষ্ট বার্ষিক স্মারক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। কলকাতা কর্পোরেশন ব্র্যাবোর্ন রোডের নাম বদলিয়ে "বিপ্লবী মহারাজ ত্রৈলোক্য শরণী"তে নামাঙ্কিত করেছেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আর্থিক আনুকূল্যে মহারাজের আশীষ-ধন্য রিষড়া সেবা সদনে দশ শয্যা বিশিষ্ট একটি পৃথক ওয়ার্ড নির্ম্মিত

হয়েছে—যেখানে রুগ্ন স্বাধীনতা সংগ্রামীগণ চিকিৎসা লাভ করছেন। এলাহাবাদে ত্রিবেণীর পুণ্য সলিলে এবং স্বাধীন বাংলায় বুড়ী গঙ্গায় মহারাজের চিতাভস্ম বিসর্জন দেওয়া হয়েছে। মহাজাতি সদনে সর্ব্ব সাধারণের প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে মহারাজের তৈলচিত্রের আবরণ উন্মোচন করা হয়েছে। স্মারক সংখ্যা, সংক্ষিপ্ত জীবন-স্মৃতি প্রকাশ করা হয়েছে এবং বাংলা দেশের মুক্তি যুদ্ধকালে এপার থেকে আন্তরিক সমর্থন জানিয়ে হাজার হাজার ইস্তাহার ওপারে বিলি করা হয়েছে। স্মৃতিরক্ষা কমিটির প্রথম পর্যায়ের কর্ম্মসূচীর মধ্যে বাকী ছিল মহারাজের সুদীর্ঘ সংগ্রামী জীবনের ঘটনাবহুল·বিচিত্র কীর্ত্তি গাথা প্রকাশন। সেই কর্ম্মসূচীর ফলশ্রুতি—"বিপ্লব-তাপস মহারাজ ত্রৈলোক্যনাথ"।

স্মৃতি রক্ষা কমিটির অর্থ ভাণ্ডার শূন্য। অনুশীলন ভবন ট্রাষ্টীগণ তাঁদের সীমিত আর্থিক ক্ষমতা সত্ত্বেও সাময়িক ভাবে ঋণ স্বরূপ প্রকাশনার আর্থিক দায় বহন করেছেন। বিক্রয় লব্ধ অর্থ হতে আমরা কৃতজ্ঞতার সাথে এই ঋণ পরিশোধ করব। বন্ধুবর শ্রীললিত কুমার সান্যাল অক্লান্ত পরিশ্রম করে গ্রন্থনার কাজ সম্পন্ন করেছেন। তাঁর ঋণ কোন কালেই শোধ হবে না সত্য, তবে পুণ্যার্জনে যদি হিসাব নিকাশের বিধি থাকে তবে পাল্লা চিরদিন তাঁর দিকেই ভারী থাকবে। প্রচ্ছদ পট এঁকেছেন তরুণ শিল্পী শ্রীশুচিব্রত দেব; তাঁকে অশেষ ধন্যবাদ জানাই। তা ছাড়া পরোক্ষে এবং প্রত্যক্ষে যাঁরা এই প্রকাশনায় সাহায্য করেছেন কৃতজ্ঞতার সাথে তাঁদের দান স্মরণ করি।

কিন্তু এই স্বল্প কাজ সমাপন করেই যদি মহারাজের উত্তর সূরীরা থেমে যান তবে তা হবে তাঁদের অযোগ্যতার পরিচায়ক এবং দায়িত্ব ভার বহনের অক্ষমতার গ্লানিই শুধু তাঁদের মাথা পেতে নিতে হবে। যাতে করে এমন সুহৃদ, এমন আপনজন, এমন নিষ্ঠাবান বিপ্লবী সাধক কালোস্রোতে আবার হারিয়ে না যায় সেই

উদ্দেশ্যে স্মৃতিরক্ষা কমিটি উপযুক্ত কর্ম্মসূচী গ্রহণ করেছেন। বিশেষ করে মহারাজের শেষ অভিলাষ—দুই প্রতিবেশীর সার্ব্বভৌমত্বে আন্তরিক শ্রদ্ধা রেখে, উভয়ের মধ্যে মৈত্রীর সেতুবন্ধন রচনা করা। এ কাজ শক্ত হলেও অসম্ভব নয়। চাই দৃঢ়তা, চাই নিষ্ঠা আর চাই নিষ্ঠাবান কর্ম্মীর নিঃস্বার্থ প্রয়াস।

মহারাজের সুদীর্ঘ কর্ম্মজীবনের নিরলস তপস্যার এই কীর্ত্তি-গাথা অন্যায়ের বিরুদ্ধে, অসত্যের বিরুদ্ধে, শোষনের বিরুদ্ধে, আমরণ সংগ্রাম কাহিনী অনাগত কালের সংগ্রামীদের বিপ্লব সাধনায় উদ্বুদ্ধ করতে সাহায্য করলে এই প্রকাশনার উদ্দেশ্য সার্থক হ'ল বলে মনে করব।

সীমিত সামর্থ্যে, স্বল্প সময়ের মধ্যে, বহু প্রতিকূল অবস্থা অতিক্রম করে এই গ্রন্থ প্রকাশনার কাজ সমাপ্ত করতে হয়েছে; অতএব অনিচ্ছাকৃত কিছু না কিছু ত্রুটি বিচ্যুতি এতে থেকেই যাবে, তারজন্য ক্ষমা প্রার্থনা করি।

মহারাজ ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্ত্তী
স্মৃতিরক্ষা কমিটির পক্ষে—প্রকাশক
দীনেশচন্দ্র ঘটক
সম্পাদক

নান্দী

মহারাজের সঙ্গে আমার পরিচয় বহু বৎসরের। ১৯০৮ সালে তাঁর সাথে আমার প্রথম দেখা। তারপরে সশস্ত্র বিপ্লবের বহুমুখী কর্ম্মধারায় তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় নিবিড় হতে নিবিড়তর হয়ে ওঠে। পরিচয় যত ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠল ততই একথা মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করলাম যে, স্বাধীনতা সংগ্রামের এই একনিষ্ঠ সৈনিকের সান্নিধ্যলাভ না করলে হৃদয়ে একটা বিরাট ফাঁক থেকে যেত। সত্য কথা বলতে কি, জীবনে এমন একাগ্র, নির্ভীক ও আত্মভোলা বন্ধু সঙ্গ খুব কমই লাভ করেছি। তাঁর অকপট সারল্য আমাকে মুগ্ধ করেছে। আলাপ আলোচনায় মুহূর্তের জন্য একদিনও অনুভব করিনি যে অন্য দলের প্রখ্যাত এক নেতার সঙ্গে আমি কথা বলছি। এমন অনাড়ম্বর ছিল তাঁর গতিবিধি, এমন সহজ তাঁর কথাবার্ত্তা, এমন সরল তাঁর আচরণ। আমার মনে হয় তাঁর বিপ্লবী জীবনের সাফল্যের চাবি-কাঠি এখানেই।

যে অনুশীলন সমিতি একদা সারা ভারতবর্ষে সশস্ত্র বিপ্লবের আয়োজনকে সম্পূর্ণ করবার কাজে সর্ব্বস্বপণ করেছিল, বীরত্ব, ত্যাগ ও দুঃখ বরণে যে দলের সভ্যেরা ভারতবর্ষের অলিখিত ইতিহাসে অক্ষয় গৌরব অর্জ্জন করেছেন, সেই সমিতির সাধারণ সভ্যপদ হতে কি করে তিনি সে দলের অবিসম্বাদিত নেতার পদে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন, তার বিচিত্র ইতিহাস আমি জানি। এ কথাও আমি জানি, কোন্ গুণে তিনি একটি বিশিষ্ট দলের নেতা হয়েও অতি সহজেই সর্ব্ব ভারতের বিপ্লবী নেতৃবর্গের অন্যতম নেতারূপে চিহ্নিত হয়েছিলেন। কেউ সন্দেহ প্রকাশ করে নি, কেউ প্রশ্ন করেনি, কেউ তাঁকে ছোট করতে চায়নি। তাঁর অন্তরের ঐশ্বর্যই তাঁকে এই উচ্চাসনে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে।

স্বাধীনতা অর্জ্জনের পরে বহুদিন মহারাজের সঙ্গে আমার দেখা হয় নি। তার কারণ, আমরা তখনই দুই বিভিন্ন রাষ্ট্রের অধিবাসী। তবে এ কথা জানতাম যে দেখা একদিন আমাদের হবেই। সেই দেখা হল মহারাজের দিল্লী যাত্রার কয়েক দিন আগে। এবার মহারাজকে দেখলাম অন্যরূপে বিপ্লবের বহ্নিশিখা যেন পরিণত হয়েছে স্নিগ্ধ দীপালোকে। অতীতের দুর্দ্ধর্ষ বিপ্লবী আজ অর্জ্জিত স্বাধীনতার অতন্দ্র প্রহরী। তিনি বলেছেন—স্বাধীনতা সংগ্রামের শেষে সুরু হয়েছে স্বাধীনতা রক্ষার সংগ্রাম। সে সংগ্রাম শুধু—বাইরের নয়, ভিতরের-ও। তাঁর মতে যেহেতু পাকিস্তানের নাগরিক তিনি, সেইহেতু, পাকিস্তানের মুক্তিতেই তাঁর মুক্তি, পাকিস্তানের সাফল্যেই তাঁর সাফল্য। সেই কারণেই আগামী দিনের কর্ম্মসূচীতে তিনি চান ভারত ও পাকিস্তানের জনগণের সর্ব্বাঙ্গীন মুক্তি আর সেই সঙ্গে পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে নিবিড় বন্ধুত্বের সম্পর্ক। দুই দেশের এই সম্পর্কই এই উপমহাদেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করে তুলবে। বিরোধের পথে, সংঘর্ষের পথে না আছে পাকিস্তানের মুক্তি, না ভারতের। এই বিশ্বাস নিয়ে জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত স্বাধীনতা রক্ষার কাজে তিনি নিযুক্ত ছিলেন। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই ভারতবর্ষে তাঁর আগমন। তিনি দেখেছেন ওপার বাংলার তরুণেরা আজ উপলব্ধি করেছেন যে তারা বাঙ্গালী এপার বাংলার অধিবাসীরাও বাঙ্গালী। বাসভূমি এদের পৃথক রাষ্ট্রে অবস্থিত হলেও মনের রাজ্যে, ভাবের রাজ্যে এরা পরস্পরের সগোত্র। ভাষা, সাহিত্য ও কৃষ্টির ক্ষেত্রে দুই বাংলার প্রাণপ্রবাহ একই সাগরে এসে মিশেছে। দুই রাষ্ট্রের মধ্যে যে-বিরোধকে বিদেশী শক্তি বাঁচিয়ে রাখতে চেষ্টা করছে বাস্তবের রূঢ় আঘাতে তা চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যাচ্ছে। তাঁর বিশ্বাস, ভারতবর্ষও এ বাস্তব সত্যকে স্বীকার করেই আগামী দিনের স্বপ্নকে সার্থক করে তুলবে। এই আশাই তিনি পোষণ

করে গেছেন। মৃত্যুতে তাঁর সেই অন্তহীন আশারই ফলশ্রুতি। তাই মহারাজের মৃত্যু দুঃখের হলেও গৌরবের। এমন মৃত্যু জগতে বিরল। এতো মৃত্যু নয়, নূতন করে জীবনের অভিব্যক্তি। আমরা জানি মৃত্যুতে জীবনের পরিসমাপ্তি, কিন্তু মহারাজের মৃত্যুতে তো তাঁর জীবনের পরিসমাপ্তি নয়, জীবনের পরিপূর্ণতা। তাঁর মৃত্যু তিথি ৯ই আগষ্ট। আগষ্ট-বিপ্লবের ঐতিহ্যমণ্ডিত এ পুণ্য দিনটি সমগ্র দেশের সংকল্প সাধনের দিন। সে সংকল্প সাধনে ভারতের নরনারী যে দুরূহ সংগ্রাম ও অফুরন্ত আত্মত্যাগের পরিচয় দিয়েছিল তার কথা আজ কে না জানে। সেকথা লেখা আছে গ্রাম গ্রামান্তে, লেখা আছে পথেপ্রান্তরে আর লেখা আছে মহারাজের সমগ্র জীবন প্রবাহে। তাই তাঁর মৃত্যু তিথিতে তাঁকে আর একবার দেখলাম, তাঁর আহ্বান আর একবার শুনলাম। জীবনে যে সাধনার ধ্বনিমাত্র শুনেছিলাম, মৃত্যুতে তারই প্রতিধ্বনি।

মনে আছে মহারাজের মহাপ্রয়াণের পরে মহাজাতি সদনের স্মরণ সভায় আমি বলেছিলাম, “মৃত্যুর মত প্রত্যক্ষ সত্য আর কিছু নেই। মরব আমরা প্রত্যেকে। যে শিশু এই মুহূর্ত্তে জন্মেছে তার ললাটেও মৃত্যুর তারিখটি লেখা আছে। আমরা শুধু কামনা করব আমাদের মৃত্যু যেন মহারাজের মৃত্যুর মত বরণীয় হয়। আদর্শের জন্য জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত কর্ম্মমুখর থেকে যে মৃত্যু লাভ, তার তুলনা নেই। আজ আমার জীবন সায়াহ্নে এ কথা নিঃসংকোচে বলে যাব, এই দুর্নিবার দুঃখ বরণ, এই নিঃশঙ্ক জীবন যাত্রা, এই বিস্ময়কর ত্যাগ স্বীকারের সত্যি কোন তুলনা নেই। তুলনা নেই তাঁর দুঃসহ জীবনের, তুলনা নেই তাঁর মহান মৃত্যুর। মহারাজই শুধু মহারাজের তুলনা।

ভারতবর্ষের যদি সত্যিকারের ইতিহাস থাকত তা হলে দেশের এইসব বীর সন্তানদের কথা দেশবাসী জানতে পারত। ভারতবর্ষের ইতিহাস নেই, তাই মহারাজকে আমরা চিনি না।” লেখক

শ্রীললিত কুমার সান্যালকে ধন্যবাদ যে তিনি মহারাজের জীবন কাহিনী রচনা করে ইতিহাসের এক অতি প্রয়োজনীয় অভাব মিটাবার কাজে এগিয়ে এসেছেন। যাদের নিয়ে এই দেশ, যাদের নিয়ে এই ভারতবর্ষ—ভারতবর্ষ; তাদের কাহিনী যদি ইতিহাসে লেখা না থাকে তবে তাকে আর ভারতবর্ষের ইতিহাস বলে লাভ কি! এই মিথ্যার হাত থেকে সমগ্র ইতিহাসকে উদ্ধার করে তা জাতির সমক্ষে উপস্থাপিত করতে না পারলে দেশের দুর্গত রাত্রির অবসান আর কোন দিনই ঘটবে না। তাই বলছিলাম লেখকের এ প্রয়াস শুধু প্রশংসনীয় নয়, ভবিষ্যৎ ইতিহাস রচনার কাজে এর মূল্য অপরিসীম; কেন না, মহারাজের জীবন-কাহিনী তো কোন ব্যক্তি বিশেষের জীবনকাহিনী নয়, একটা যুগের আশা আকাঙ্খার, আঘাত সংঘাতের, জীবন মৃত্যুর প্রচ্ছন্ন কাহিনী। ভারতের অগ্নিযুগের বিভিন্ন বিচ্ছিন্ন যত ধারা, তা তার একক জীবন প্রবাহেই বিধৃত। এই সব বিস্ময়কর ঘটনাবলীর সঙ্গে পরিচিত না হলে ভারতবর্ষকে ভালবাসা তো দূরের কথা, তাকে কোনদিন চেনাই যাবে না।

হেমচন্দ্র ঘোষ

[Trilokyanath Chakrovarty shall ever live in our hearts as a mighty Indian, as a noble son, as a firy fighter and patriot and as an uncompromising and unyielding fighter against the British with a record full of selfless service and suffering.]

মহারাজ ত্রৈলোক্যনাথ

—শেষ অধ্যায়—

৬ই আগষ্ট, ১৯৭০ খ্রীঃ। ভারতীয় লোকসভার সেদিন যৌথ অধিবেশন। রাজ্যসভা ও লোকসভার সমবেত সদস্যের মিলিত গুঞ্জন। বাদল অধিবেশনের কর্ম্মসূচীতে এক স্মরণসমৃদ্ধ লগ্ন।

চিরাচরিত প্রাত্যাহিক কার্য্যসূচীর কর্ম্মচঞ্চলতা নয়, সবিশেষ কার্য্যক্রম। আজ চিরসংগ্রামীর বলিষ্ঠ প্রত্যয়ের অভিনন্দন, অমৃতসন্ধানী অনুপ্রেরণার অকুণ্ঠ আহ্বান; মৃত্যুঞ্জয়ী মানবতার স্বতঃস্ফুর্ত্ত সম্বর্দ্ধনা।

মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাসে এক অনন্যনাম শ্রীত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্ত্তী। বজ্রকঠিন ও পুষ্পপেলব তাঁর ব্যক্তিত্ব। নিঃশঙ্ক নির্ব্বিকার, নির্লিপ্ত অথচ নিষ্করুণ গতিশীল। কোন প্রতিবন্ধক সে গতি শ্লথ করে নাই, কোন বিভীষিকা সে চলা স্তিমিত করিতে পারে নাই, কোন অমানুষিক অত্যাচার সে সঙ্কল্প থেকে বিচ্যুত করে নাই। আপন মহিমায় সে আপনি গতিশীল, আপন প্রেরণায় আপনি সম্পুর্ণ। লক্ষ্যে অনন্যচিত্ত, আদর্শে অনন্যনিষ্ঠ, ত্যাগে সর্ব্বস্বপণ।

১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্টের প্রচণ্ড আবর্ত্তে আত্মহননের সেই তামসী রজনীর পিচ্ছিল কাললগ্নে তিনি খণ্ডিত ভারতের উপকূলে নিরাপদ ও নিরুপদ্রব জীবনের আশায় উপস্থিত হন নাই, তিমির-বিদারী অভ্যুদয়ের আজন্ম উপাসক, অভী মন্ত্রের একান্ত সাধক সেই

অন্ধকারের মোহমুহ্য পলে হারাইয়া গেলেন, মানুষের গড়া অলক্ষ্য যবনিকা চিরবন্দিত ভারতজননীর কোল হইতে তাঁহাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিল।

জনতার জাগ্রত অভীপ্সা শঙ্কিত অবসন্ন জনতার সাথে একাত্ম হইয়া খণ্ডিতাঙ্গ ভারতের নিকট অপ্রকট হইলেন। ১৯০৬ সাল হইতে ১৯৪৬ সালের মধ্যে দীর্ঘ ত্রিশ বৎসর ব্রিটিশের কারাগারে যিনি নানা অত্যাচার, চরম উৎপীড়ন সহ্য করিয়াছিলেন তিনিই আবার ১৯৪৭ হইতে ১৯৭০ সাল অবধি ধর্ম্মান্ধতা, প্রমত্ততা ও অন্ধ মাদকতার বশবর্ত্তী হইয়া স্বাধীনতোত্তর কালে মানসিক গ্লানি ও লাঞ্ছনার শিকার হইলেন।

ভগ্নস্বাস্থ্য অশীতিপর সাগ্নিক সংগ্রামী ভারতনেত্রী শ্রীমতী গান্ধীর প্রচেষ্টায় ও ভারত-পাকিস্তানের অগণিত জনতার ঐকান্তিক কামনায় ১৯৭০ সালের ২৪শে জুন যশোহর-বনগাঁও পথে পশ্চিম বাঙলায় প্রবেশ করিলেন। হয়ত ক্ষণেকের তরে স্বপ্নদ্রষ্টা বিপ্লবী তাঁহার আজন্ম স্বপ্নের এই বিকৃতরূপ দেখিয়া, মানুষের গড়া এই অলীক প্রাচীর দেখিয়া অন্যমনা হইয়াছিলেন। বিস্মরণের গহ্বর হইতে দীর্ঘ তেইশ বৎসর পর আবার তিনি ভারতের জনগণের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন।

ভারতবর্ষ তাঁহার মধ্যে আবার আপন মর্ম্মবাণী শুনিতে পাইল। আপন স্বপ্নের বেদনা অনুভব করিল। তাঁহার মনের মুকুরে আপন রূপ দেখিয়া সচকিত হইয়া উঠিল।

ভারতের জনপ্রতিনিধিগণ তাহারই প্রতিধ্বনি করিলেন সেদিন-কার ঐ সজল মেঘমেদুর লগ্নে রোদনভরা সন্ধ্যায়।

মহামান্য অতিথি অসুস্থ, তাই আবেদন করিলেন—

"মিঃ স্পীকার, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং বন্ধুগণ!

আমি অসুস্থ, হৃদ্‌রোগে ভুগিতেছি, দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দিতে

পারি না, আপনারা আমাকে বসে বলবার অনুমতি দিন। প্রথমেই আমি প্রধানমন্ত্রীকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই, তাঁর এবং আরও কয়েকজন বন্ধুর প্রচেষ্টায় আমি কিছুদিনের জন্য ভারতে আসার সুযোগ পেয়েছি। ১৯০৭-০৮ সন থেকে সুরু ক'রে যে সব বন্ধু-বান্ধবদের সাথে একত্রে দেশের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করেছিলাম জীবনসন্ধ্যায় তাঁদের দেখবার বড়ই আকাঙ্ক্ষা ছিল। ভারতের এইসব পুরানো বন্ধু এবং সহযাত্রীদের সাথে মিলিত হবার সুযোগ পেয়ে খুবই আনন্দ লাভ করেছি। এমন কি দিল্লীতেও আমার অনেক পুরানো বন্ধু ও সহকর্ম্মী আছেন, তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়ায় আমি খুব খুশী হয়েছি।"

বিচিত্র ভারতবর্ষের বহুভাষী সদস্যদের তিনি শোনালেন—"১৯০৬ থেকে ১৯৪৬ সনের মধ্যে আমি ছ'বার কারারুদ্ধ হয়েছি—ভারতবর্ষ এবং বর্মার বিভিন্ন কারাগারে। সর্ব্বসমেত ৩০ বছর কারাগারে আবদ্ধ ছিলাম এবং ঐ কারাজীবনে ভারতের অনেকগুলি প্রান্তীয় ভাষা শিখেছিলাম ; কিন্তু দুর্ভাগ্য সবগুলিই এখন ভুলে গেছি।"

কল্পনা-উদ্বুদ্ধ বিপ্লবী স্মৃতির সায়রে ডুব দিলেন। "১৯১৫ সনে আন্দামান সেলুলর জেলে ছিলাম। তখন সেখানে একশজন রাজনৈতিক বন্দী ছিলেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন সাভারকর ভ্রাতৃদ্বয়, গুরুমুখ সিং, জোয়ালা সিং, পৃথ্বী সিং, শের সিং, ভাই পরমানন্দ এবং আরও অনেকে। বাঙালী বিপ্লবীদের মধ্যে ছিলেন আশুতোষ লাহিড়ী, শচীন সান্যাল, বারীন ঘোষ, পুলিন দাস প্রমুখ। আন্দামানে থাকাকালে উর্দু এবং গুরুমুখী এবং সাভারকার ভাইদের কাছ থেকে শিখেছিলাম মারাঠী কিন্তু দুঃখের বিষয় সে সব ভাষা এখন ভুলে গেছি।"

মুক্তপক্ষসম সঞ্চরণ করিয়া চলে অতীত দিনের সেই হর্ষবেদনায় ভরা উজ্জ্বল চিত্তলোক।

"নেতাজী সুভাষচন্দ্র, সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ এবং আরও অনেকের সাথে ১৯২৫/২৬ সনে মান্দালয় জেলে দিন কাটিয়েছি। সে সময় ব্রহ্মভাষা শিখেছিলাম, তাও এখন ভুলে গেছি। ১৯৩০-এ কেরলের কন্নমুর জেলে ছিলাম। সহবন্দী ছিলেন এ, কে, গোপালন, ই, এম, এস, নাম্বুদ্রিপাদ, কৃষ্ণ পিল্লাই, গোবিন্দ নায়ার, সদাশিব রাও, মাধব মেনন প্রমুখ ব্যক্তিরা। মালয়ালম শিখেছিলাম—তাও এখন ভুলে গেছি। ১৯৩২ সালে আমাকে ভেল্লুর সেণ্ট্রাল জেলে স্থানান্তরিত করা হয়। তখন সে জেলে ছিলেন—প্রফেসর এন্, জি, রঙ্গ, বাপোনির্দি, নারাণ মেনন এবং মোপলা বিদ্রোহের বন্দী আরও অনেকে। সেখানে আরও দু'একটি ভাষা শিখেছিলাম, এখন ভুলে গেছি। হিন্দীও শিখেছিলাম; কিন্তু আমি স্বীকার করি তাও ভুলে গেছি। কারণ দীর্ঘকাল যাবৎ পূর্ব্ব পাকিস্তানে আছি, সেখানে হিন্দীতে কেউ কথাবার্ত্তা বড় একটা বলে না, আমারও চর্চ্চা নেই—ফলে হিন্দীও প্রায় ভুলে গেছি।"

ত্রৈলোক্যনাথ আপন ভাষণ বাঙলাতেই প্রদান করিলেন। সহিংস সংগ্রামী হইয়াও তিনি অহিংসার সংগ্রামকে উপেক্ষার চক্ষে দেখেন নাই। তাই তাঁহারই মুখে শুনিতে পাই:

"নোয়াখালীর দাঙ্গার পর বিশেষতঃ দেশবিভাগের পর মহাত্মা গান্ধীর প্রিয় শিষ্য শ্রীযুক্ত সতীশ দাশ গুপ্তের সাথে গান্ধীজীর প্রদর্শিত পথে কিছু গঠনমূলক কাজ সুরু করি; দেশবিভাগের পর কিছুকাল সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা, দাঙ্গা, মারপিট দেশে চলতে থাকে। আমি স্থির করলাম—আমি পাকিস্তান ছাড়ব না। সেখানে দেশবাসীর পাশে দাঁড়াব এবং জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত পাকিস্তানেই বসবাস করব।"

যিনি বিপ্লবী তিনি চিরদিনই আশাবাদী; কোন হতাশা তাঁকে ম্লান করিতে পারে না। অতীত তাঁহার নিকট স্মৃতি, বর্ত্তমান স্বপ্ন-

সাধনার সোপান এবং ভবিষ্যতের কল্পনাই জীবনের প্রকৃত প্রতিবেদন। তাই স্মৃতি ত্যাগ করিয়া বর্ত্তমান পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে তিনি আশার বাণী শোনাইলেন, ভবিষ্যতের রূপরেখা আঁকিয়া চলিলেন।

"বন্ধুগণ, আমি আনন্দের সঙ্গে আপনাদের জানাচ্ছি যে এককালে বিশেষতঃ দেশবিভাগের অব্যবহিত পরে পাকিস্তানে মুসলমানদের মধ্যে যে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা এবং বিদ্বেষের ভাব বর্ত্তমান ছিল অনেক বছর কেটে যাবার পর তা এখন আর নেই। আজকাল সেখানে সাধারণ মানুষ, মুসলমান নওজোয়ান সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষভাব থেকে মুক্ত। পাকিস্তানে একটা নূতন জাগরণের হাওয়া বইছে। পাকিস্তানের তরুণেরা কে মুসলমান কে হিন্দু সে কথা ভাবে না। তাদের মনে একটা নূতন জাতীয়তাবোধ জাগছে—তাদের শ্লোগান—'বাঙলা আমার দেশ, বাঙলা আমার ভাষা, বাঙলা দীর্ঘজীবী হোক'। এই চিন্তাধারা সেখানে সকল সম্প্রদায়ের মধ্যেই বর্ত্তমান। পাকিস্তানের জনতা নূতন চিন্তাধারায় উদ্বুদ্ধ হয়ে নূতন শ্লোগান দিচ্ছে। বিশেষ করে পূর্ব্বপাকিস্তানের জনতা চায় ধর্ম্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র, Full autonomy এবং সমাজতন্ত্রবাদের প্রতিষ্ঠা।"

দীর্ঘকাল অবিশ্বাস, ঘৃণা ও বিভেদের বিরাট প্রাচীরে আবদ্ধ পূর্ব্বপাকিস্তান আমাদের নিকট অজ্ঞাত হইয়া পড়িয়াছিল। ত্রৈলোক্যনাথের কণ্ঠে নূতন জীবনের নূতন স্পন্দনধ্বনি অনুভব করিয়া, অগ্নিশুদ্ধ নবচেতনার বাণী শুনিয়া দেশ সচকিত হইল। নিঃসঙ্গ বিহঙ্গ ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে একক কণ্ঠে জানাইল পূর্ব্বাচলে আলোর পরশ সমাসন্ন। ভেঙেছে দুয়ার এসেছে জ্যোতির্ম্ময়; নবজীবনের বার্ত্তা এনেছে সে আলোর ধারা, যা কিছু অন্ধ যা কিছু তামস হবে, হবে সব ক্ষয়। দূরদ্রষ্টা রাজনীতিক শুনাইলেন—

"পূর্ব্বপাকিস্তানের আসন্ন নির্ব্বাচন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ পাকিস্তানের সাধারণ নির্ব্বাচনের উপর পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ শুভাশুভ এমন কি জীবনমরণ সমস্যা নির্ভর করছে। বিশেষতঃ এই নির্ব্বাচনে যারা জয়ী হবে তারাই করবে সরকার গঠন আর সঙ্গে সঙ্গে সংবিধানও পরিবর্ত্তন করবে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে আসন্ন নির্ব্বাচনে প্রগতিশীল দলই জয়লাভ করবে এবং সংবিধানকে গণতান্ত্রিক আদর্শে রূপায়িত করবে। আর এক কথা এই যে, প্রগতিশীল দল যদি ক্ষমতায় আসে তবে পাকিস্তানের সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের ন্যায্য দাবী ও অধিকার রক্ষার ব্যবস্থা নিশ্চয় করবে।"

ইতিহাস এই অমোঘ ও অকপট বিশ্বাসের বাণীকে পরবর্ত্তী কালে বাস্তবায়িত করিয়া তুলিল।

"পাকিস্তানের সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের দাবী হচ্ছে একটি পূর্ণ গণতান্ত্রিক ধর্ম্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র। যদি সেখানে সত্যিকার ধর্ম্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয় এবং গণতান্ত্রিক অধিকার স্থির নিশ্চিতভাবে স্বীকৃত হয় তাহলে সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায় আর বাস্তু ত্যাগ করবে না এবং পাকিস্তানকেই নিজেদের স্বদেশ ও মাতৃভূমি মনে ক'রে সেখানেই নিশ্চিন্তে বসবাস করবে।

"বন্ধুগণ, আমি পাকিস্তানে বাস করি এবং একজন পাকিস্তান নাগরিকও বটে। পাকিস্তানের সাধারণ মানুষের সংস্পর্শে এসে আমি তাদের যতটুকু জেনেছি, আপনাদের আমি জোর দিয়েই বলতে পারি যে, পাকিস্তানের জনগণ এখন আর ভারতবিরোধী নয়। তারা সত্যি সত্যি ভারতের সঙ্গে বন্ধুভাবে বসবাস করতে চায়। আমি ভারতে এসে বিভিন্ন পর্য্যায়ের লোকের সঙ্গে আলাপ-আলোচনান্তে এই সিদ্ধান্তে এসেছি যে ভারতীয়রাও পাকিস্তান-বিরোধী মনোভাব পোষণ করে না এবং পাকিস্তানের সঙ্গে বন্ধু-ভাবেই বসবাস করতে চায়। অথচ কার্য্যতঃ তা হচ্ছে না। এর

কারণ কি ? হতে পারে কোথাও কিছু একটা অসুবিধা আছে। তবুও তাদের মিলিতভাবে এ বিষয়ে সমাধানে আসতে হবে।"

তিনি দৃপ্তকণ্ঠে পরম সত্যটি উচ্চারণ করিলেন।

"আমার বিশ্বাস এই দুই দেশের মধ্যে যে মিত্রতার বন্ধন স্থাপিত হচ্ছে না তার মূলে কাজ করছে বৈদেশিক শক্তি, যেহেতু এই দুই দেশের মধ্যে মৈত্রীর বন্ধন প্রতিষ্ঠিত হ'লে কোন কোন বৈদেশিক শক্তির কাছে তা অসুবিধার কারণ হয়ে উঠতে পারে।

"যদি উভয় দেশের মধ্যে মৈত্রীর বন্ধন প্রতিষ্ঠিত হয় তবে দেশ-রক্ষার ব্যাপারে যে বিপুল অর্থব্যয় হয় সেই অর্থ শিল্পোন্নয়নে ও অর্থ-নৈতিক পুনর্গঠনে ব্যয়িত হতে পারে এবং তা যদি হয় তবে আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে আগামী দশবছরের মধ্যে ভারতবর্ষ ও পাকিস্তান বৈষয়িক উন্নতিতে অনেক দূর এগিয়ে যাবে এবং বিশ্বের দরবারে তাদের যথোপযুক্ত স্থান ক'রে নেবে। কেবল তাই নয়, উভয় দেশের মধ্যে মৈত্রীর বন্ধন প্রতিষ্ঠিত হ'লে কাশ্মীর সমস্যা, ফরাক্কা সমস্যা কোন সমস্যা বলেই মনে হবে না। সব কিছুর তখন সমাধান খুঁজে পাওয়া যাবে এবং কাশ্মীররক্ষার ব্যাপারে যে অর্থব্যয় হয় তা অন্যান্য গঠনমূলক কাজে ব্যয়িত হতে পারবে। উভয় দেশের মধ্যে মৈত্রীর বন্ধন প্রতিষ্ঠিত হ'লে ফরাক্কা দিয়ে পাকিস্তানের যতটা জল প্রয়োজন ভারতবর্ষ তা তাকে দেবে। ভারতবর্ষ উত্তর বঙ্গকে মরুভূমিতে পরিণত করতে কখনও চায় না। বরং ভারতের স্বার্থেই উত্তরবঙ্গকে শস্যভাণ্ডারে পরিণত করবে এবং তা দ্বারা ভারতবর্ষও যথেষ্ট উপকৃত হবে।"

পরিশেষে তিনি ভারতবাসী তথা ভারতের নেতৃবৃন্দের নিকট মর্ম্মস্পর্শী আবেদন জানাইলেন।

"সমগ্র ভারতে আমার বন্ধুবান্ধব এবং নেতৃবৃন্দ যাঁরা উপস্থিত আছেন তাঁদের কাছে আমার বিনীত অনুরোধ, আপনারা পাক-

ভারত মৈত্রীর বন্ধন গড়ে তুলতে সচেষ্ট হউন। এটা মনে রাখবেন যে উভয় দেশের মধ্যে এই মৈত্রীর বন্ধন এবং মধুর সম্পর্ক সকলের স্বার্থেই প্রয়োজন। বন্ধুগণ, আমি কিছুটা দুঃখের সঙ্গেই আর একটা ব্যাপারে আপনাদের মনোযোগ আকর্ষণ করছি। ভারতবর্ষ একটি ধর্ম্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র। এখানে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা কেন ঘটবে? ভারতে যখন সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা ঘটে তখন পাকিস্তানের সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায় অত্যন্ত দুঃশ্চিন্তার মধ্যে দিন কাটায়; মেয়েরা বিনিদ্র রজনী যাপন করে।

"পাকিস্তান ঐশ্লামিক রাষ্ট্র, সেখানে আমাদের সমানাধিকার নেই; তৎসত্ত্বেও আমরা সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায় পাকিস্তানকে মাতৃভূমি বলেই মনে করি। ভারতে সাতকোটী মুসলমান; ভারতে যারা সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন তাদের একথা জানা উচিত যে তারা এই সাতকোটী মুসলমানকে ধ্বংস করতে পারবে না। আর যদিও বা তারা এ স্থান ত্যাগ করে তবে ভারতবর্ষ দুর্ব্বলই হবে।

"আমার মুসলমান বন্ধুরা বলেন যে ভারতবর্ষ ধর্ম্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র; কাজেই তাঁরা এখানে সংখ্যালঘিষ্ঠ নয়। পাকিস্তানে হিন্দুরা সত্যি সত্যি সংখ্যালঘিষ্ঠ, যেহেতু পাকিস্তান ঐশ্লামিক রাষ্ট্র। ভারতবর্ষে মুসলমানরা হিন্দুদের সঙ্গে সমান অধিকার ভোগ করে। এখানে তাঁরা গভর্ণর, জজ বা উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী হতে পারেন; এমন কি গণতান্ত্রিক ভারতের প্রেসিডেন্ট হতে পারেন। কিন্তু পাকিস্তানে এরকমটা কল্পনাও করতে পারে না।

"আমি ভারতীয় মুসলমানদের বলব তাঁরা যেন সত্যিকারের ভারতীয় বলে মনে করেন; ভারতবর্ষকে তাঁরা যেন তাঁদের মাতৃভূমি বলে মনে করেন; কারণ তাঁদের সকল স্বার্থ, সকল শুভাশুভ ভারতের বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত। আমরা পাকিস্তানী, আমরা চাই পাকিস্তান বড় হোক। আমরা পাকিস্তানে

-ধর্ম্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র চাই এবং পাকিস্তানেই গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্যে আপ্রাণ সংগ্রাম ক'রে চলেছি। পাকিস্তান যদি বড় হয় তবে আমরাও বড় হব এবং আমরা আমাদের পাকিস্তানী বলে ঘোষণা করতে গর্ব্ব বোধ করব।"

সকল সদস্য হর্ষধ্বনি করিয়া অতিথিকে সমর্থন জানান। পরিশেষে আবেগাপ্লুত কণ্ঠে নিজের সংগ্রামমুখর দিনগুলি স্মরণ করেন।

"আজ যদিও আমি পাকিস্তানী নাগরিক কিন্তু ভারতবর্ষ যখন ব্রিটিশের অধীনে ছিল তখন ইন্দো-পাক মিলিত এই অখণ্ড মহা-দেশের স্বাধীনতার জন্য আমিও সংগ্রাম করেছি। আজ দেশ স্বাধীন। একজন স্বাধীনতা সংগ্রামী হিসেবে আমি আজকের ছাত্র ও যুব সম্প্রদায়কে এর জন্য গর্ব্ব বোধ করতে বলব। আমি মনে করি এ উপদেশ দেওয়ার অধিকার আমার আছে। কারণ আজ তারা যে স্বাধীনতা উপভোগ করছে সে স্বাধীনতা-সংগ্রামীদের আমিও একজন। উভয় দেশের যুব সম্প্রদায়ের কাছে আমি এই আবেদন রাখব তারা যেন সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে, সংগ্রাম করে অনগ্রসরতার বিরুদ্ধে এবং সর্ব্বোপরি চেষ্টা করে শৃঙ্খলা-পরায়ণ হতে যাতে তাদের মাতৃভূমি জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করে।"

ভাষণ শেষ হইল। সমগ্র সভা প্রশান্ত স্পন্দনে পূর্ণ হইল।

আজন্ম ব্রহ্মচারী নির্লিপ্ত সন্ন্যাসী কর্ম্মযোগের পরম প্রতীক তাঁহার মৈত্রীর যাত্রায় এক অনাস্বাদিত বাণী শুনাইলেন—"আমার বাঙলা, তোমার বাঙলা, সোনার বাঙলা"। পূর্ব্ব বাঙলার সম্যগত যৌবনের এই জীবনমন্ত্র। রাজনৈতিক সংবাদ সংবাদপত্রের মাধ্যমে মধ্যে মধ্যে হয়ত আমরা কিছু জানিতাম কিন্তু মানুষের প্রাণের খবর আমাদের নিকট আসিত না বা আসিতে পারিত না। তাই সেখানকার মানুষ আমাদের নিকট হইতে বহুদূরে সরিয়া গিয়াছিল।

পূর্ব্ব বাঙলা আমাদের নিকট প্রায় ভৌগোলিক সত্তায় পরিণত হইয়া গিয়াছিল।

ত্রৈলোক্যনাথের বাণীতে আমরা আবার পূর্ব্ব বাঙলা আমারই বাঙলার একাত্ম বলিয়া অনুভব করিলাম। রাজনীতির পাশাখেলায় দ্বিধাবিচ্ছিন্ন দুই বাঙলার সাংস্কৃতিক অখণ্ডতার ভাবমূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা পর্ব্বের বোধন হইল।

৮ই আগস্ট সন্ধ্যালগ্নে ত্রৈলোক্যনাথ প্রধানমন্ত্রীর সহিত নিভৃত আলোচনায় আবার মিলিত হইলেন। কি ছবি যে তিনি আঁকিলেন, কি বাণী যে তিনি শোনাইলেন তাহা তৃতীয় ব্যক্তির জানা না-ই বা রহিল কিন্তু পরের দিন ৯ই আগস্ট ত্রৈলোক্যনাথের মৃত্যুসংবাদে যে ব্যথা ও যে ছবি প্রধানমন্ত্রীর ভাষায় ফুটিয়া উঠিল—"...Keen awareness of contemporary situation. Meeting him was a moving experience. He awakened something deep in ourselves."—তাহা হইতে নিঃসন্দেহে বলিতে পারা যায় ইতিহাসের বিশ্বস্ত পুরোধা সমাসন্ন ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর দৃশ্যপট উদ্ঘাটিত করিয়া গিয়াছিলেন।

তাঁহার মৃত্যু দিবস ৯ই আগস্ট ১৯১০ কোন অহেতুক যোগাযোগ নহে। ভারতের ইতিহাসে এই রক্তক্ষরণের দিনটি চিরদিনের জন্য চিহ্নিত হইয়া গিয়াছে। এই দিনই সারা ভারতবর্ষ একই সঙ্গে একই সুরে গর্জিয়া উঠিয়াছিল "করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে"। ভারতবর্ষ ভারতবাসীর, পরাধিকার নাই। হিংসার অহিংসার তত্ত্ব নাই। প্রাণ দিয়া প্রাণ পাইব। প্রয়োজন হইলে রক্তের তর্পণে মহাযজ্ঞের সমাধা করিব।

কাশ্মীর হইতে কন্যাকুমারিকা ও দ্বারকা হইতে আসাম যে বিপ্লববহ্নি অচিরাৎ প্রজ্বলিত হইয়াছিল তাহারই স্বপ্নে বিভোর ছিলেন আজীবন এই চিরবিপ্লবী।

সেই তারিখটিতে ভারতের রাজধানী দিল্লীতে অলক্ষ্য বিধাতা তাঁহার ললাটে মহানির্ব্বাণের জয়তিলক আঁকিয়া দিয়া জীবনকে পূর্ণ অর্থ দান করিলেন, পরিপূর্ণ রূপে বিকশিত করিলেন।

শত শহীদের স্মৃতিপূত, শত রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহের নীরব সাক্ষী, শত ঐতিহাসিক অনুপ্রেরণার পাদপীঠ এই কলিকাতার বুকেই তাঁহার মরদেহ মহাগ্নিতে বিলীন হইল। অমোঘ ইতিহাসের এক অকল্পনীয় অনুশাসন। যিনি লুকাইয়া ইহার অলি গলিতে অবস্থান করিতেন তাঁহারই মরদেহ লক্ষ লক্ষ নরনারীর জয়ধ্বনিতে মুখরিত হইয়া প্রকাশ্য রাজপথে যাত্রা করিল।

ঘটনাপরম্পরায় তাঁহার মৃত্যু অঘোষিত, অশোচিত, অকীর্ত্তিত ও অশ্রদ্ধেয় থাকিবার কথা কিন্তু পরম করুণারসঘন মহাকালের ইচ্ছায় তাহার বিপরীত দৃশ্যই সংঘটিত হইল।

বেদনাবিধুর বিপুল জনারণ্যের আকুলতায় বন্দিত জীবনসত্তা ইতিহাসের ইঙ্গিতে অনন্ত সত্তায় স্থান গ্রহণ করিল।

কবির ভাষায় বলিতে ইচ্ছা করে—

"বিমূঢ় নির্ব্বাক আজি স্তব্ধ চারিদিক
তোমার এই আত্মদান জীবনসন্ধ্যায়;
সেই শেষ প্রতিশ্রুতি
প্রোজ্জ্বল করিয়া দিবে অনাগত সংগ্রামীর
পথপরিক্রমা।"

আজন্ম অভিযাত্রী হয়ত তাঁর শেষ যাত্রায় এমন কিছু বুঝিয়াছিলেন, দেখিয়াছিলেন ও শুনিয়াছিলেন যাহাতে তাঁহার বিশ্বাস হইয়াছিল যে বাস্তব তাঁহার কল্পনার পাণিগ্রহণ করিবে। তাই তাঁহার মৃত্যুতে শ্রীমতী গান্ধীর মুখে স্বতঃস্ফূর্ত্তভাবে উচ্চারিত হইল **"He seemed relaxed and full of future."**

বিপ্লবী চিরদিন কর্ম্মচঞ্চল অকুণ্ঠচিত্ত স্থিরসঙ্কল্প। সেই দিনই

তিনি প্রশান্ত যে দিন তাঁহার স্বপ্ন সত্য। হয়ত মৃত্যুর আগে ভারতের মাটিতে সেই স্বপ্নের রূপায়ণলগ্ন আসন্ন অনুভব করিয়াছিলেন। তাই প্রশান্তচিত্ত মরণের কোলে আত্মসমর্পণ করিলেন ৯ই আগস্ট ১৯৭০, মহাবিপ্লবের পুণ্যতিথিকে মহাবিপ্লবী আপন মরণে অর্ঘ্য দিয়া গেলেন।



১৮৮৯ সাল। উনবিংশ শতাব্দীর শেষপাদ। ইংলণ্ড ও বাঙলার উভয়েরই স্বর্ণযুগ; পরিপূর্ণতায় ইংলণ্ড মধ্য-গগনে। সসাগরা পৃথিবী ব্যাপী তাহার বিরাট সাম্রাজ্য; ইংরাজের রাজকীয় পতাকা সপ্ত দ্বীপে ও সপ্ত সাগরে উদ্ধত ভঙ্গিমায় উড়িতেছে। বিশ্ববাসী সভয়ে ও সসম্ভ্রমে তাহার পানে তাকাইয়া আছে। ইংরাজ শাসকগোষ্ঠীর ইচ্ছায় বিশ্বের সব দেশেই এমন কি স্বাধীন দেশগুলিতেও তাহাদের কর্ম্মপন্থা নিরূপিত হয়, ইংরাজ রাজশক্তির চোখের ইসারায় বিশ্বের প্রায় সকল দেশের উত্থানপতন সূচিত হয়।

ইংরাজ কবির কণ্ঠে তাই সদম্ভ উক্তি—"Rule Britannia rule the waves" রাজা ক্যানুটের মর্ম্মান্তিক ব্যর্থতা ইংরাজ কবির দম্ভ বিকৃত আত্মগরিমায় উচ্চকিত।

বাঙলায় অন্য প্রকাশ। ইংরাজ-শাসিত ভারতের প্রত্যন্ত দেশ—বহু প্রদেশের একটি প্রদেশ। বেঙ্গল প্রেসীডেন্সী—বিহার-উড়িষ্যা আসামের সহিত এক সূত্রে গ্রথিত।

বহুযুগের পরাধীনতার গ্লানিতে ক্ষয়িষ্ণু হিন্দুসমাজ কক্ষভ্রষ্ট, লক্ষ্যহারা, গতিহীন। পচনশীল সমাজ শাস্ত্রের নামে অবিচারে, সত্যের নামে ব্যভিচারে, পৌরষের নামে কাপুরুষতাজনিত প্রমত্ততায় আকণ্ঠ নিমজ্জিত। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদ হইতে সেই তামস রাত্রি ধীরে ধীরে রঙীন হইতে সুরু করিয়াছে। নানা বাণীর নানা কাকলী দীপ্ত উষার হিমস্নিগ্ধ বাতাসে সুপ্ত সমাজে জাগরণের গান শোনাইতে সুরু করিয়াছে। যুগান্তকারী চেতনায় উদ্বুদ্ধ ও উদ্দীপ্ত মানবতার মিছিল বাঙালীর ঘরে আসিতে সুরু করিয়াছে।

১৮৮৯ সাল। পরমহংসদেব তাঁহার জ্যোতির্ম্ময় জীবনধারায় সমাজের বুকে আলোড়ন তুলিয়া সবেমাত্র কয়েক বৎসর হইল দেহ রাখিয়াছেন। তমসার গহ্বর হইতে শাস্ত্রবাণীকে উদ্ধার করিয়া সাধারণের ভাষায় সাধারণের ব্যঞ্জনায় সাধারণ মানুষকে শোনাইয়া গিয়াছেন। শ্লথ, অসংহত নিরর্থক শব্দ-সম্ভারের শৃঙ্খল হইতে মুক্ত করিয়া বাংলা ভাষাকে বাংলা মায়ের অন্তর স্পর্শে সঞ্জীবিত করিয়া বিদ্যাসাগর, মধুসূদন, বঙ্কিম তাহাকে জীবন্ত করিয়াছেন।

এই সময় উনসত্তর বয়স্ক বিদ্যাসাগর বাঙালীর সমাজজীবন ও সাংস্কৃতিক জীবনের মধ্যমণি। পঞ্চাশোত্তর বঙ্কিমচন্দ্র বন্দেমাতরমের মহামন্ত্রে মাতৃবন্দনা সমাপ্ত করিয়াছেন। মধুসূদন কাব্যে-নাটকে রুদ্ধগতি স্রোতস্বিনীর বাঁধ ভাঙিয়া তাহাকে স্রোতময়ীরূপে প্রবাহিত করাইয়া বিগত হইয়াছেন। আগামী দিনের রবীন্দ্রনাথ তখন আটাশ বৎসরের যুবা—ভবিষ্যতের তেজঃপুঞ্জ অলক্ষ্যে তাঁহার অন্তরে সঞ্চারিত হইতেছে। ছাব্বিশ বৎসরের দীপ্তিমান চারণ সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ ভারত-আত্মার সন্ধানে ভারত পরিক্রমায় রত। উনিশ

বৎসরের তরুণ দেশবন্ধু সুপ্ত-ভাবনার পরশে হিল্লোলিত; সতের বৎসরের কিশোর অরবিন্দ সাগরপারে অধ্যয়নরত।

১৮৮৯ সালের ইহাই ছবি। অলক্ষ্য ইতিহাস বঙ্গজননীর কণ্ঠে দোলাইতে মহাজীবনের মালা গাঁথিয়া চলিয়াছেন।

ইংলণ্ড বাহ্যসম্পদ ও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় গর্ব্বোদ্ধত; সাচ্ছল্যে কল্লোলিত; আর বাঙলা মানব আত্মার মহাসম্পদে বলীয়ান হইয়া পর্য্যুদস্ত সমাজজীবনের নবচেতনায় অমৃত সিঞ্চন করিয়া চলিয়াছে।

ভবিষ্যতের সংঘাতপর্ব্ব—শক্তিমদমত্ততার সহিত স্বাতন্ত্রের, শোষণের সহিত সাম্যের—দুই প্রান্তের দুই দেশে ধীরে ধীরে অঙ্কুরিত হইতেছে। একজন শাসক, অন্যজন শাসিত; একজন শোষক, অন্যজন শোষিত; একজন লুণ্ঠনকারী, অন্যজন লুণ্ঠিত।

নবীন বাঙলার উদ্দাম চৈতন্য-বিপ্লব ধীরে ধীরে সুনিয়ন্ত্রিত ভাব-ধারায় বাঙালীর জীবনাদর্শে পথ কাটিয়া চলিয়াছে। ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের বেদ-বিদিত উদাত্ত আহ্বানে অবলুপ্ত বিশ্ব-চেতনা আবার নূতন ভাবনায় সম্পৃক্ত হইয়া উঠিতেছে। নীরন্ধ্র অন্ধকারময় অচলায়তনের প্রস্তর-প্রোথিত বাতায়নের কয়েকটি প্রস্তর স্থানচ্যুত হইয়া নূতন আলোক, নূতন বাতাস বদ্ধ ঘরের জমাট বায়ুস্তরে নূতন পরশ প্রদান করিতেছে। পশ্চিম পূর্ব্বকে পশ্চিম করিতে আসিয়া পূর্ব্বের সহিত সংযুক্ত দিগ্বলয়ে এক অলক্ষ্য রেখায় মিলিত হইয়াছে। বাঙালীর শ্যামল অঙ্গন সেই সংযুক্তির মিলনতীর্থ।

চার বৎসর হইল শিক্ষিত সম্প্রদায় ভারতবর্ষের স্বাজাত্য ও ভারতবাসীর স্বনির্ভরতার অধিকারে অনুপ্রাণিত হইয়া জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। এমনই লগ্ন ১৮৮৯ সাল। বাঙালীর জীবন স্পন্দনময়। বাঙলা নবচেতনায় দীপ্তিময়ী, ধ্যানবিহ্বলা।

৫ই মে, ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দ, ২২শে বৈশাখ ১২৯৬ বঙ্গাব্দ শনিবার যে শিশু অবিভক্ত বাঙলার ময়মনসিংহ জেলার কুলিয়ারচর থানার

অন্তর্গত কাপাসাটিয়া গ্রামের সচ্ছল মধ্যবিত্ত ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্ম গ্রহণ করিলেন তিনিই পরবর্ত্তীযুগে বিপ্লববাদের অন্যতম প্রবক্তা, বিপ্লবের নৈষ্ঠিক প্রতিমূর্ত্তি মহারাজ ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্ত্তী নামে প্রখ্যাত হইলেন।

পিতা দুর্গাচরণ চক্রবর্ত্তী ও মাতা প্রসন্নময়ী দেবী। চার ভ্রাতার মধ্যে সর্ব্বকনিষ্ঠ ত্রৈলোক্যনাথ। জ্যেষ্ঠ শ্যামাচরণ, মধ্যম কামিনী-মোহন, তৃতীয় চন্দ্রমোহন, চতুর্থ ভগ্নী মনোমোহিনী, পঞ্চম ত্রৈলোক্যনাথ ও শেষ সন্তান ভগ্নী বসন্তকুমারী।

১৯০৭ সালে আঠার বৎসর বয়সেই ত্রৈলোক্যনাথ পিতৃহারা হন। তাহার আগের বৎসরই **১৯০৬ সালে** তিনি অনুশীলন **সমিতির সভ্য** তালিকাভুক্ত হইয়াছেন।

পিতামাতা নাম রাখিলেন ত্রৈলোক্যমোহন, কিন্তু অলক্ষ্য ভাগ্য-দেবতা সে নাম পরিবর্ত্তন করিলেন, অন্য কাহারও মাধ্যমে নহে—স্বয়ং ব্রিটিশরাজের সরকারী দপ্তর মারফত ত্রৈলোক্যমোহন হইলেন ত্রৈলোক্যনাথ।

পরবর্ত্তী ইতিহাস তাঁহার জীবনভাষ্যে বিপ্লবের শাশ্বত প্রতিভূ একনিষ্ঠ বিপ্লবীর নামান্তরের সার্থকতা প্রমাণ করিয়াছে। ভাগ্যচক্র তাঁহার নামকরণ করিল ত্রৈলোক্যনাথ আর সহযোগী অনুগামী ও অনুরাগী অগণিত জনতা তাঁহাকে উপাধি দিলেন মহারাজ। এ উপাধি ভালবাসার, শ্রদ্ধার ও স্বীকৃতির। রাজদরবারের বাহ্যিক অনুষ্ঠান নহে।

মহারাজেরই উপযুক্ত নাম ত্রৈলোক্যনাথ, আর নামের উপযুক্ত উপাধি মহারাজ। মণিকাঞ্চন যোগ। তাই তিনি মহারাজ ত্রৈলোক্য-নাথ। এমনই অন্তরমথিত উপাধি মহাত্মা, বিশ্বকবি, দেশবন্ধু।

ত্রৈলোক্যনাথের বিদ্যারম্ভের সময় আসিল। স্থির হইল মালদহ জেলার কানসাট গ্রামের পুখুরিয়া মাইনর স্কুলে তাঁহাকে ভর্ত্তি করা

হইবে। ময়মনসিংহের জমিদার মহারাজা সূর্য্যকান্ত আচার্য্য চৌধুরীর মালদহ জমিদারীর বড় কাছারী এই কানসাট গ্রামে। ম্যানেজার জনৈক ইংরাজ—নাম জে, আর, হলো। ত্রৈলোক্যনাথের মেজদাদা কামিনীমোহন সেই কাছারীর কোষাধ্যক্ষ। তাই শৈশবেই ত্রৈলোক্যনাথ পিতামাতা ও গৃহপরিবেশ পরিত্যাগ করিয়া দাদার কাছে আসিলেন। নূতন পরিবেশ দেখিলেন, গ্রামের গণ্ডী ছাড়িয়া অল্পবয়সেই দৃষ্টি প্রসারিত হইল। ভাল শিকারী হওয়ায় ম্যানেজার সাহেব শিকারের সময়ই কামিনীমোহনকে সঙ্গে লইতেন। অল্পবয়স হইতেই ত্রৈলোক্যনাথের বন্দুকের সহিত পরিচয় ঘটিল; বালক হয়ত দাদাকে লুকাইয়া দাদার বন্দুক সেই বয়সেই নাড়াচাড়া করিতে সুরু করিয়াছিলেন। হয়ত বা সেই বাল্য পরিচয়ের সূত্রেই বন্দুককে ভালবাসিয়া ফেলিয়াছিলেন।

সেই সময় মাইনর স্কুলের হেডমাস্টার ছিলেন কেফাতুল্লাহ মিঞা, প্রথম পাঠ তাঁহারই হাতে। তাঁহার বাড়ীতে প্রত্যহ সকাল বেলায় দশ বার জন ছাত্রকে তিনি বিনা পারিশ্রমিকে পড়াইতেন। ত্রৈলোক্যনাথ ইহাদেরই একজন। বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ আশা করিয়াছিলেন ত্রৈলোক্যনাথ মাইনর পরীক্ষায় বৃত্তি পাইবেন। কিন্তু মাইনর পরীক্ষার পূর্ব্বেই তাঁহাকে ঢাকার রায়পুরা হাই স্কুলে যাইতে হয়, হয়ত বা ইংরাজী শিখাইবার উদ্দেশ্যে তাঁহাকে ইংরাজী স্কুলে ভর্ত্তি করা হইল। এর পর তিনি স্কুল বোর্ডিং-এর বাসিন্দা, বার তের বৎসরের বালক সম্পূর্ণরূপে স্বাবলম্বী হইবার পাঠ সুরু করিলেন। ছুটীর সময় রায়পুরার সন্নিকটস্থ বড় চর গ্রামে যাইতেন। সেখানেই তাঁহার পিতার নিজস্ব কাছারী বাড়ী। সেজদাদা চন্দ্রমোহন সেখানেই থাকিতেন। গৃহসংলগ্ন আমকাঁঠালের বাগানেই বালকের ছুটীর দিনগুলি কাটিয়া যাইত।

এক বৎসরের মধ্যেই তিনি ময়মনসিংহ জেলার ধলা হাই স্কুলে

ভর্ত্তি হইলেন। এখানেও বোর্ডিং। এইখানে থাকিবার সময় বঙ্গবিভাগ হইল। ১৯০৫ সাল। ত্রৈলোক্যনাথ তখন ১৬ বৎসরের কিশোর।

ত্রৈলোক্যনাথের ভাষায় সেই বিপুল উদ্দীপনার ছবি—

"স্বদেশী আন্দোলনের প্রবল বন্যায় সমগ্র বাঙ্গলা দেশ প্লাবিত হইয়াছিল। সেই বন্যায় আমার ক্ষুদ্র জীবন-তরণীখানিও ভাসিয়া যায়। স্বদেশী আন্দোলনের সময় বাঙ্গলার যুবক, জমিদার, কৃষক সকলেই স্বদেশপ্রেমে মাতিয়া উঠে, সকলের মনেই নূতন উৎসাহ—আমরা স্বাধীনতা চাই, ব্রিটিশের অধীনে থাকিব না। স্বদেশী আন্দোলনের নেতাগণ নির্দ্দেশ দিয়াছেন বিদেশী দ্রব্য বয়কট করিতে হইবে, দেশের সর্ব্বত্র বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদ জানাইতে হইবে। বঙ্গ-ভঙ্গের প্রতিবাদকল্পে দেশের সর্ব্বত্র সভা ও শোভাযাত্রা হইতে লাগিল, হাটে বাজারে পিকেটিং চলিতে লাগিল। স্বদেশী আন্দোলনের ঢেউ ধলায় আসিয়া পৌঁছিল, জমিদার বাড়ীতে তাঁত চরকা বসিল, সভা শোভাযাত্রা পিকেটিং চলিতে লাগিল—বন্দে মাতরম্, আল্লাহো আকবর, ভারত মাতাকী জয় ধ্বনিতে আকাশবাতাস প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। যুবকের দল ডন, কুস্তি কুচকাওয়াজ করিতে লাগিল।"

লোকের মনে সে কী উৎসাহ কী উদ্দীপনা! ধলার আন্দোলনে কিশোর ত্রৈলোক্যনাথ মাতিয়া উঠিলেন।

স্বদেশী আন্দোলনের ঢেউ তাঁহাদের ক্ষুদ্র গ্রামেও পৌঁছিল। পিতা দুর্গাচরণ বাড়ীতে বিদেশী বর্জ্জন করিলেন। দেশী কাপড় ও দেশী লবণ প্রচলিত হইল। গ্রামের আপামর জনসাধারণ একই পথ লইলেন।

ধলার স্কুল বোর্ডিংএ ত্রৈলোক্যনাথের নামে একদিন একটি পার্সেল আসে—খুলিয়া দেখেন একজোড়া মোটা দেশী ধুতি। পিতা পুত্রকে পাঠাইয়াছেন। 'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়' মাথায় তুলিয়া

লইবার নীরব ইঙ্গিত। অনুশীলন সমিতির মন্ত্রলাভের পুর্ব্বেই পিতা পুত্রকে স্বদেশসেবার ও স্বদেশপ্রীতির দীক্ষা দান করিলেন।

অলক্ষ্য নিয়তি এইবার আপন হাতে ত্রৈলোক্যনাথের ভার লইলেন। ১৯০৬ সালে তাঁহাকে ঢাকা জেলার সাটিরপাড়া স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দেওয়া হয়। তাঁহার জীবননাট্যের যবনিকা এইখানেই উন্মোচিত হইল। ঢাকার প্রসিদ্ধ উকিল ও জমিদার স্বদেশী আন্দোলনের বিশিষ্ট নেতা ললিত মোহন রায় এই সাটিরপাড়া স্কুলের সেক্রেটারী। ত্রৈলোক্যনাথের সেজদাদা ইঁহার বিশেষ পরিচিত, সেই সূত্রে ত্রৈলোক্যনাথের আগমন। বোর্ডিংয়ের নবাগত কিশোর অচিরেই ললিতবাবুর পরম প্রিয় পাত্র হইয়া উঠিলেন। এই বৎসরই ত্রৈলোক্যনাথ অনুশীলন সমিতির সদস্যভুক্ত হন। বাঙ্গলার তথা ভারতের বিপ্লবের ইতিহাসে যে অবিচ্ছিন্ন ধারা এই ১৯০৬ সালে সুরু হইল, ত্রৈলোক্যনাথ সেই সংগ্রামের আদিপর্ব্বে নিজের জীবনকে যুক্ত করিলেন।

একদিন শনিবার বিকালে সাটিরপাড়া বিদ্যালয়ের ছাত্রাবাসে দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্র বরদাকান্ত রায়ের পরিচিত এক ভদ্রলোক আসিলেন ও ত্রৈলোক্যনাথের সহিত দুজনকেই অনুশীলন সমিতির প্রতিজ্ঞা করাইলেন। সাটিরপাড়ায় দুজন সদস্যের শাখা স্থাপিত হইল।

পরদিন যাত্রাকালে তিনি সমিতির নিয়মাবলী ও প্রতিজ্ঞাপত্র দিয়া বলিয়া গেলেন—'সর্ব্বদা মনে রাখিবে তোমাদের জীবন দেশের জন্য।' বীর সন্ন্যাসীর উদাত্ত বাণীর প্রতিধ্বনি—তুমি মাতৃপূজায় বলিপ্রদত্ত। উর্ব্বর ও কর্ষিত মনমৃত্তিকায় বীজ পড়িল। যোগ্য পাত্রে অস্ত্র প্রদত্ত হইল। প্রদীপ প্রজ্বলিত হইল। এ প্রদীপ্ত দীপ-শিখা কোন ঝড়েই আজীবন নিভে নাই।

প্রতিজ্ঞাগুলি অতি সাধারণ। (১) আমি কখনও এই সমিতি

হইতে বিচ্ছিন্ন হইব না ; (২) সর্ব্বদা আমি আমার চরিত্র নির্ম্মল ও পবিত্র রাখিব ; (৩) নেতার আদেশ আমি বিনা বাক্যব্যয়ে প্রতিপালন করিব। সেই দিনের সেই প্রথম প্রতিজ্ঞা তাপস ত্রৈলোক্যনাথ জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত পালন করিয়া গিয়াছেন।

ত্রৈলোক্যনাথ সম্পাদক ও বরদাকান্ত সহকারী সম্পাদক হইয়া সাটিরপাড়া গ্রামে সমিতির কার্য্য আরম্ভ করিলেন। দিনে দিনে সমিতির সভ্যসংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে—সমিতির শাখা প্রতিষ্ঠিত হইয়া চলিল। তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্র ত্রৈলোক্যনাথ লেখাপড়া ভুলিয়া জীবনসাধনায় মাতিয়া উঠিলেন। অন্যের অসুখে সেবা করা, চোরের উপদ্রব হইলে রাত্রে পাহারা দেওয়া, মেলায় জলসত্র খোলা, যাত্রীসাধারণকে সাহায্য করা ও শান্তি রক্ষা করা— সমিতির সামাজিক কাজ সুষ্ঠু ভাবেই চলিতে লাগিল। সাথে সাথে চলিল লাঠি খেলা, ছোরা খেলা, ডন, কুস্তি ও ড্রিল শিক্ষা। শারীরিক ও মানসিক উৎকর্ষ বৃদ্ধি করাই হইল সমিতির লক্ষ্য। মানুষ গড়া চলিল। মানুষ চাই। বাঙ্গলা তখন মানুষ গড়ার কারখানা।

মেধাবী ছাত্র ত্রৈলোক্যনাথের উপর সাটিরপাড়া স্কুলের শিক্ষকদের বহু আশা—এই দেশব্যাপী জোয়ারে তাঁহারাও ভাসমান। তবু ত্রৈলোক্যনাথকে বলিলেন—'তুমি যতটা সময় সমিতির জন্য দাও ততটা অন্ততঃ লেখাপড়াতেও দাও। সকালে দুঘণ্টা রাত্রে এক ঘণ্টা অন্ততঃ তোমাকে লেখাপড়া করিতে হইবে। আমাদের বিশ্বাস তুমি প্রবেশিকা পরীক্ষায় স্কলারশিপ পাইবে। ত্রৈলোক্যনাথ কথা দিলেন।

প্রতিশ্রুতি পালনের যথাসাধ্য চেষ্টা সত্ত্বেও বিধাতা ত্রৈলোক্যনাথকে ভাল ছেলে হইতে দিলেন না। প্রবেশিকা পরীক্ষার পূর্ব্বেই ১৯০৮ সালে ১৮।১৯ বৎসর বয়সেই তিনি নারায়ণগঞ্জে গ্রেপ্তার হইলেন ও তরুণ বয়সেই প্রথম কারাবরণ করিলেন।

ছয় মাসের মেয়াদ। পাঠ্যজীবন শেষ হইল। জীবনবেদের পাঠ সুরু হইল।

কবি সুকান্তের ভাষায় বলিতে হয়—

"আঠারো বছর বয়সের নেই ভয়
পদাঘাতে চায় ভাঙ্‌তে পথের বাধা
এ বয়সে কেউ মাথা নোয়াবার নয়—
আঠারো বছর বয়স জানে না কাঁদা।"



১৯০৫ সাল। ভারতবর্ষের ইতিহাসে এক চিরস্মরণীয় বৎসর, বিশ্ব ইতিহাসের পথরেখায় এক চিরভাস্বর দিগন্ত-দিশারী জাগ্রত কাল। ভারতবর্ষের মুক্তিযজ্ঞের বেদীতে, এই বাঙ্গলার মাটিতে এই বৎসরই সমিধে অগ্নি সংযোজিত হয়। তখন সুরুর লগ্ন, সবে মাত্র বোধন, তাই সমাগত তাপসের দল হয়ত নগণ্য, মুষ্টিমেয়। কারণ এ যজ্ঞাগ্নি মহাভারতের একপ্রান্তেই আয়োজিত বিস্তৃত হয় নাই, বাঙ্গালীর অন্তরের জ্বলন্ত শিখায় এর প্রজ্বলন। এই হোমাগ্নিই ক্রমান্বয়ে ধীরে ধীরে সমগ্র ভারতব্যাপী প্রধূমিত হইল, আসমুদ্র

হিমাচল সেই প্রদীপ্ত জ্যোতি শিখায় আপন চিরবাঞ্ছিত সত্তার রূপ দেখিল; জড়তার আবরণ ভেদ করিয়া জাগ্রত জনতা জীবনের স্বাদ পাইল। শেষ আহুতির লগ্ন আসিল ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট—ক্ষমতাদর্পী ব্রিটেনের সাম্রাজ্যিক শাসনের অবসানে।

এই বিয়াল্লিশ বৎসরের ইতিহাস ভারতবর্ষের তথা বাঙ্গলার মুক্তি সংগ্রামের নিরবচ্ছিন্ন ইতিহাস। বহু স্রোতে, বহু সংলাপে, বহু ভাবে, বহু ভাবনায়, বহু উৎপীড়নে উৎকীর্ণ; বহু অত্যাচারে উচ্ছ্বসিত, বহু সাধনায় সমাহিত, বহু ক্রন্দনে ক্লিষ্ট, বহু বাধায় আকীর্ণ, বহু কল্পনায় কল্লোলিত।

এই বিয়াল্লিশ বৎসরও বিশ্ব ইতিহাসের একটি মহান্ ও পার্শ্ব-পরিবর্ত্তনের অধ্যায়। পশ্চিমের বাহুবলে বিশ্বাসী তাবৎ সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির অবক্ষয়ের ইতিহাস। সমাজ অথবা জাতি প্রস্তুত হয় অনেক আগে—অজান্তে। ধর্ম্মে, সামাজিক চেতনায়, সাহিত্যে, সঙ্গীতে, শিল্পে, আত্মচেতনায়, আত্মিক প্রেরণায় নূতন জোয়ার আসে। মানুষের মন গড়িতে থাকে, কর্ষণ চলে। কুসংস্কারের শৃঙ্খল ভাঙে, সংস্কৃতির পুষ্পমাল্য কণ্ঠে দোলে। পতিত জমি আগাছামুক্ত হইয়া নিবিড়ভাবে কর্ষিত হইতে থাকে। ঠিক সময়ে শুধু বীজ ছড়ানোর পালা। অনুকূল আবহাওয়ায় অচিরে মাটি ভেদিয়া অঙ্কুর জাগিয়া উঠে। দেখিতে দেখিতে দিগন্তচুম্বী বিশাল প্রান্তর যাহা বন্ধ্যা বলিয়া মনে হইয়াছিল অকস্মাৎ সবুজের হিল্লোলে লীলায়িত হইয়া উঠে।

বাঙ্গালীর মনোজগৎ এই ভাবেই ঊনবিংশ শতক জুড়িয়া আবর্জ্জনা অপসৃত ও কর্ষিত হইয়া চলিয়াছিল। কী সামাজিক জীবনে, কী ধর্ম্মজীবনে, কী সাহিত্যে, কী সঙ্গীতে, কী শিল্পে বাঙ্গলা সেদিন প্রাণসঞ্চারিণী রসে নিত্যসিক্ত। যে বাঙালী একদিন বণিকের মানদণ্ডকে মুক্তির উদ্যোক্তা ভাবিয়া রাজদণ্ডে রূপান্তরিত হইতে শুধু

সাহায্য করে নাই, বণিককুলের ভাবনা, তাঁহাদের চেতনা, তাঁহাদের সংস্কৃতিকে পরম সমাদরে আপনচিত্তে আহরণ করিয়াছিল, নবজীবনের রূপায়ণে সমাদৃত করিয়াছিল সেই বাঙালীই উনবিংশ শতাব্দীর শেষে বুঝিতে পারিল "স্বাধীনতা-হীনতায় কে বাঁচিতে চায় রে কে বাঁচিতে চায়"। সে হৃদয়ঙ্গম করিল, "পুরাতন চীন নবীন জাপান তারাও স্বাধীন তারাও প্রধান—জাগ্রত সবাই মানের গৌরবে—ভারত কেবল ঘুমায়ে রয়।"

বেদদাত্রী, বিশ্বদেউলের অন্নপূর্ণা, ভুবনমোহিনী তাহাদের ভারতবর্ষ—মোহনিদ্রাভিভূতা। তাই সর্ব্বাশ্রয়ী মহামায়ার উদ্দেশ্যে প্রার্থনা ধ্বনিত হইল, শক্তি দাও, সাহস দাও, যশঃ দাও, বীর্য্য দাও, দাও পূর্ণতা। বীর সন্ন্যাসীর উদাত্ত কণ্ঠের আহ্বান আসিল—আগামী পঞ্চাশ বৎসরের জন্য সব দেবদেবী তুলিয়া রাখ। তোমার একমাত্র আরাধ্য হল তোমার স্বদেশ, তোমার মাতৃভূমি। সেটা ১৮৯৭ সাল।

বাঙ্গালী বুঝিল পরদেশী ভিন্ন ঐতিহ্যের শাসকগোষ্ঠীর ভালবাসা স্বার্থসিদ্ধির ছলনা। তাহার স্বার্থের সহিত আমাদের স্বার্থের মিলন হওয়া কখনই সম্ভব নয়। শোষণেই তাহার স্ফীতি, তাই আমাদের উত্তরোত্তর দারিদ্র্য বরণ ছাড়া গত্যন্তর নাই। সকল কর্ম্মে সকল বিভবে সিংহভাগ তাহাদের প্রাপ্য, কারণ তাহারা শাসক। সামান্য যাহা অবশিষ্ট কিম্বা যাহা উচ্ছিষ্ট তাহাই আমাদের দান করিয়া শান্ত ও অনুগত রাখিতে তাহারা বদ্ধপরিকর। ছলেবলে কৌশলে কার্য্যোদ্ধার করাই তাহাদের চিরন্তন নীতি, সুশাসন ও সুবিচারের আচরণ নিতান্ত মৌখিক ও আবরণ মাত্র। তাই দরিদ্র জনতা দিন দিন দরিদ্রতর হইতে লাগিল। আত্ম-উদ্বুদ্ধ জাতি আত্মচেতনায় আঘাত পাইল। দিনে দিনে বারুদ শুষ্ক হইয়া চলে—কেবলমাত্র অগ্নিস্ফুলিঙ্গের প্রয়োজন, কাল অপেক্ষায় থাকে।

ইংরাজ সাধ করিয়া চিরকালের রসিক ইতিহাসের শিকার হইল।

বাঙ্গালীকে জব্দ করিতে ইংরাজ রাজশক্তির বলদর্পী সর্ব্বময় প্রতিভু আত্মস্ফীত বড়লাট—লর্ড কার্জ্জনের হুকুমনামায় ১৯০৫ সালের ১৬ই অক্টোবর, ৩০শে আশ্বিন ১৩১২ বঙ্গাব্দ—বাঙ্গলা দেশ দ্বিধা বিভক্ত হইল। পূর্ব্ব বাঙ্গলা ও আসাম লইয়া একটা স্বতন্ত্র প্রদেশ আর পশ্চিমবাঙ্গলা ও বিহার ওড়িষ্যা লইয়া আর একটি প্রদেশ। কল্পনায় ইংরাজ রাজ স্বপ্ন দেখিল বিচ্ছিন্ন বাঙ্গালী ধীরে ধীরে শুষ্কপ্রাণ নির্ম্মূল হইয়া যাইতেছে। তাহার সংস্কৃতির ভরা গাঙে হঠাৎ রুদ্ধস্রোত; ভবিষ্যতে ব্রিটিশ রাজত্বের কণ্টক উৎপাটিত হইতেছে।

মহাকালের মুদ্রিত নয়ন বারেক উন্মোচিত হইল, ইতিহাস বাঁকা হাসি হাসিল।

ব্রিটিশ জাতি যে কয়েকটি গুণে বিশ্ব-অঙ্গনে নিজের স্বাধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল তাহার মধ্যে লোকচরিত্র নির্ণয়ের ক্ষমতা একটি প্রধান গুণ। তাহারা যখনই যেখানে গিয়াছে সেই দেশের, সেই জাতির বা সেই গোষ্ঠীর চরিত্রের দোষগুণ সম্যকরূপে আয়ত্ত করিয়াছে। দোষের সোপান বহিয়া তাহারা নিজের স্বার্থসিদ্ধি করিয়াছে, গুণ দেখিলে গোপনে তাহা নির্ম্মূল করিতে যত্নবান হইয়াছে।

ব্রিটিশ রাজশক্তি যেদিন নিঃসংশয়ে উপলব্ধি করিল বাঙ্গালী চরিত্রের স্বকীয়তা তাহাদের স্বার্থের পরিপন্থী সেইদিন তাহারা মনস্থির করিল, এ জাতির মেরুদণ্ড ভাঙিতে হইবে। তাহারা আশা করিয়াছিল ইংরাজের ভাবভাবনায় অভিষিক্ত বাঙ্গালী বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় ইংরাজের ছায়া হইয়াই থাকিবে, স্বাতন্ত্র্যের অভিলাষ করিবে না। ইংলাণ্ডের মাটিতে শিক্ষিত বাঙ্গলার নব্য সমাজ নকল ইংরাজ সাজিবে, ইংরাজত্ব লইয়া ভারতবাসী হইবে না। কালচক্রে তাহাদের কল্পনা বাস্তবায়িত হইল না। এমন কি সরকারী পদস্থ কর্ম্মচারীরাও স্বাদেশিকতায় উদ্বুদ্ধ হইলেন।

মহারাজ ত্রৈলোক্যনাথ

ইংরাজ সরকারের ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট রায়বাহাদুর বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সি. আই. ই. বন্দেমাতরম মন্ত্রের উদ্গাতা হইলেন। ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট নবীন চন্দ্র সেন "বানর ঔরসে আর রাক্ষসী উদরে জন্ম" বলিয়া ইংরাজের হীনতা ও নৃশংসতাকে চিত্রিত করিলেন। আরও একজন সরকারী কর্ম্মচারী দীনবন্ধু মিত্র "নীলদর্পণ" নাটক রচনা করিয়া বাঙ্গলায় নীলবিদ্রোহের প্রেরণা দিলেন। ইংরাজের অন্নে হাত পড়িল। সরকারী সংস্থার প্রভাবশালী শিক্ষক পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর অপমানের প্রত্যুত্তরে চটিপরা চরণ-যুগল টেবিলে তুলিয়া উর্দ্ধতন ইংরাজ অধিকর্ত্তাকে সম্বর্দ্ধনা করিলেন। সরকারী উকিল হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় "তূণীর কৃপাণে কর রে পূজা, এসব দৈত্য নহে তেমন" অগ্নিমন্ত্র উদ্ধত শিঙা-রবে বাঙ্গালীর অন্তরে ছড়াইতে লাগিলেন। যে হরিশ মুখার্জ্জী একদিন সিপাহী বিপ্লবের সময় ইংরাজ রাজশক্তিকে তাঁহার লেখনী দ্বারা প্রভূতভাবে সাহায্য করিয়াছিলেন, তিনিই আবার নীলবিদ্রোহের সময় তাঁহার লেখনীতে যে অনল উদ্গীরণ করিতে সুরু করিলেন তাহা কামানের অগ্নি-গোলক হইতে কম ভয়াবহ নয়।

জ্ঞানে গুণে বিত্তে বিভবে সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত ইংরাজীশিক্ষিত সম্প্রদায়—সবাই স্বাতন্ত্র্যের স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন। ১৮৮৫ খৃঃ এই বাঙ্গলায় বাঙ্গালীর অনুপ্রেরণায় সর্ব্বভারতীয় সংগঠন গড়িয়া উঠিল যাহারই ফলশ্রুতি সর্ব্বভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস। ব্যক্তিসত্তা যূথবদ্ধ হইল। ইংরাজ প্রমাদ গণিতে সুরু করিল।

তাহারও পূর্ব্বে হিন্দু মেলার মাধ্যমে স্বাদেশিকতা বাঙ্গলার অন্তরে প্লাবন আনিতে আরম্ভ করিয়াছে। ভারতের প্রথম সিবিলিয়ন সত্যেন্দ্র নাথ ঠাকুর, তিনিও এই মেলার উদ্যোক্তাদের অন্যতম। ইংরাজ রাজশক্তির দেশীয় বাহকেরাই ইংরাজের শিরঃপীড়ার কারণ হইল। অনেক দেখিয়া অনেক শুনিয়া অনেক

বুঝিয়া ব্রিটিশ সরকার স্থির করিল বাঙ্গলা দ্বিধা বিভক্ত কর। বাঙ্গলার প্রাণশক্তি বাঙ্গালীত্ব নিঃশেষিত কর। তাই বঙ্গ-বিভাগ। ইতিহাসের ফাঁদে ইংরাজ রাজশক্তি স্বেচ্ছায় চরণ চালন করিল। শুষ্ক বারুদে অগ্নি স্ফুলিঙ্গের সমাবেশ হইল—বাঙ্গালী জ্বলিয়া উঠিল। জ্বলিবার আগে সেই ভীম গর্জ্জনে আসমুদ্রহিমাচল নূতন প্রাণকল্লোল অনুভব করিল। এতদিন ভারতের খণ্ডিত আকাশে "হর হর মহাদেও" "গুরু ওয়াহি ফতে" কিম্বা "আল্লাহো আকবর" ধ্বনিত হইত, এইবার মহাভারতের অখণ্ড আকাশ 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনিতে শিহরিত হইতে লাগিল। এই নব উন্মেষে বাঙ্গালীর সত্তা ও সংস্কৃতি একটি অখণ্ড সত্তায় নব রূপে রূপান্তরিত হইল।

মহারাজের নিজের ভাষায় আমরা জানিতে পারি—"এই বঙ্গভঙ্গ উপলক্ষ্য করিয়াই স্বদেশী আন্দোলনের জন্ম। জাতীয় কংগ্রেস নেতাদের কৃতিত্ব এই, তাঁহারা উপযুক্ত সময়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। এই বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনই ভারতের স্বাধীনতার প্রথম সোপান।"

বঙ্গভঙ্গের নির্দ্দেশনামা প্রচারিত হইলে সারাদেশ একসঙ্গে প্রতিবাদ মুখর হইয়া উঠিল। সমগ্র বাঙলা দেশের সমস্ত স্তরের মানুষ এই প্রতিবাদে সামিল হইল। জমিদার, প্রজা, বুদ্ধিজীবী, শ্রমজীবী, ধনী, নির্ধন, পণ্ডিত, মূর্খ—কৃষক মজুর—শিক্ষক ছাত্র সবাই একসাথে এক কণ্ঠে এর প্রতিবাদ করিলেন। সভায় সভায় সারা দেশ সরব হইল, মিছিলে মিছিলে শহর নগর গ্রাম গঞ্জের পথ মাতোয়ারা হইয়া উঠিল। ঋষি বঙ্কিমের নব মন্ত্র 'বন্দেমাতরম্' আকাশে বজ্রনির্ঘোষ তুলিল। মুসলমান পাশে আসিয়া দাঁড়াইল —আওয়াজ উঠিল "আল্লাহো আকবর"।

এত সত্ত্বেও গর্ব্বিত ব্রিটিশ রাজশক্তি ঘোষণা করিল স্থিরীকৃত সিদ্ধান্ত শিথিল হইবে না। "Settled facts cannot be

unsettled." সারা বাঙ্গলার প্রতিভূ হিসাবে জনতার মানসিক রাষ্ট্রের কুলপতি সুরেন্দ্রনাথ বজ্রদীপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করলেন—"Settled facts will be unsettled"—স্থিরীকৃত সিদ্ধান্ত শিথিল হইবেই। ইতিহাস তাঁহার মাধ্যমে ভবিষ্যৎ বাণী শুনাইল।

সারা দেশ ব্যাপিয়া তখন বিপুল নেতৃত্বের সমারোহ; শুধু কলিকাতায় নয়—প্রতি জেলায়, প্রতি মহকুমায় প্রতি গ্রাম নগর উন্নতশির কম্বুকণ্ঠ নেতৃবৃন্দের আহ্বানে মুখরিত, উদ্দীপিত, উত্তপ্ত।

কলিকাতায় সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিপিনচন্দ্র পাল, শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী, পি-মিত্র, ভূপেন বসু, সুরেন্দ্রনাথ হালদার, যোগেশচন্দ্র চৌধুরী, প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য, আশুতোষ চৌধুরী, কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ, শচীন্দ্রনাথ বসু, কৃষ্ণকুমার মিত্র, অরবিন্দ ঘোষ, ব্রহ্ম বান্ধব উপাধ্যায়, মতিলাল ঘোষ, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, বিনয় সরকার, রাধাকুমুদ মুখার্জ্জী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, আনন্দমোহন বসু, লাল মোহন ঘোষ, গীষ্পতি কাব্যতীর্থ, মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা, এ. রসুল, মৌলবী লিয়াকৎ হোসেন, সুন্দরী মোহন দাস প্রভৃতি প্রধান ছিলেন।

ঢাকায় আনন্দ চন্দ্র রায়, আনন্দ চন্দ্র পাকৃরাশী, ললিত মোহন রায়, ত্রৈলোক্য বসু, পি সি সেন, রজনীকান্ত গুপ্ত, রসিক চক্রবর্ত্তী, কুঞ্জলাল নাগ, যোগেশচন্দ্র দাশগুপ্ত, যোগেন্দ্র গুহঠাকুরতা, দীনবন্ধু মজুমদার, শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, মনোরঞ্জন ব্যানার্জ্জী, পুলিন বিহারী দাস, কবি হরিচরণ আচার্য্য, রজনীকান্ত বসাক, হরকুমার গুপ্ত প্রভৃতি প্রধান।

ময়মনসিংহে মহারাজ সূর্য্যকান্ত আচার্য্য, অনাথবন্ধুগুহ, ডাঃ বিপিন সেন, হেমেন্দ্র কিশোর আচার্য্য, ব্রজেন্দ্র গাঙ্গুলী, অমর ঘোষ প্রভৃতি প্রথম সারির নেতা।

ফরিদপুরে—অম্বিকাচরণ মজুমদার।

বরিশালে—অশ্বিনী কুমার দত্ত, দুর্গামোহন সেন, সুরেন সেন।

চট্টগ্রামে—যাত্রামোহন সেন (দেশপ্রিয়ের পিতা)।

কুমিল্লায়—বসন্ত মজুমদার, হরদয়াল নাগ, উপেন্দ্র মোহন মিত্র।

নোয়াখালিতে—যশোদা দাস।

রাজসাহীতে—কিশোরী মোহন চৌধুরী, সুদর্শন চক্রবর্ত্তী, সুরেন্দ্র মিত্র।

দিনাজপুরে—যোগেন্দ্র নাথ চক্রবর্ত্তী।

বহরমপুরে—বৈকুণ্ঠ নাথ সেন।

রঙপুরে—উমেশচন্দ্র গুপ্ত, ঈশান চক্রবর্ত্তী।

যশোহরে—যদুনাথ মজুমদার।

মেদিনীপুরে—উপেন্দ্র নাথ মাইতি, নরেন্দ্রলাল খাঁ, নারাজোলের মহারাজা।

বর্দ্ধমানে—আবুল কাসিম, নলিনাক্ষ বসু।

ময়মনসিংহের মহারাজা সূর্য্যকান্ত আচার্য্য চৌধুরীর নিকট স্বয়ং বড়লাট লর্ড কার্জ্জন উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদ সমর্থন করিতে অনুরোধ করিলেন। মহারাজা শুধু অস্বীকার করিলেন না, বিরুদ্ধগোষ্ঠীর নেতৃত্ব লইলেন।

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন সর্ব্বস্তরের আন্দোলন—সর্ব্বমানসের আন্দোলন। তাই ১৯০৬ সালের ১৬ই অক্টোবর, ৩০শে আশ্বিন বৎসরান্তে বাঙ্গালী নূতন করিয়া শপথ লইল। যে প্রতিবাদ ছিল বহিরাঙ্গনে তাহা অন্তঃপুরে লইয়া আসিল। সারা বাঙ্গলায় প্রতিটি ঘরে সেদিন অরন্ধন। চুল্লীতে অগ্নি সংযোজিত হইবে না। রন্ধন বন্ধ। অশিক্ষিত কৃষকবধূও এর তাৎপর্য্য বুঝিল, অজ্ঞ গ্রাম্য বালকও ইহার স্পন্দন অনুভব করিল।

৩০শে আশ্বিন প্রভাত লগ্নে সবাই দলবদ্ধ হইয়া নদী পুষ্করিণীতে স্নান সমাপনান্তে দলে দলে নগ্নপদে পথে বাহির হইলেন। কণ্ঠে

সঙ্গীত আর দেশমাতৃকার আহ্বানমন্ত্র—"বন্দেমাতরম্" রবীন্দ্রনাথ প্রাণের আকুলতায় ভাষা দিলেন—সুর দিলেন।

বাঙলার মাটি বাঙলার জল
বাঙলার বায়ু বাঙলার ফল
পুণ্য হউক হে ভগবান।
বাঙলার ঘর, বাঙলার হাট—
বাঙলার বন বাঙলার মাঠ—
পূর্ণ হউক পূর্ণ হউক
পূর্ণ হউক হে ভগবান।
বাঙালীর পণ বাঙালীর আশা
বাঙালীর কাজ বাঙালীর ভাষা
সত্য হউক হে ভগবান।
বাঙলীর প্রাণ বাঙলীর মন
বাঙালীর ঘরে যত ভাইবোন
এক হউক এক হউক হে ভগবান।

প্রায় চারিশত বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালী আর একদিন এমনি করিয়া মাতিয়াছিল—সকল বাঁধন ভাঙিয়া নিমাইয়ের সঙ্গে পথে পথে নগর পরিক্রমায় বাহির হইয়াছিল। উচ্চ-নীচ ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল ধনী-নির্ধন সে দিন কাঁধে কাঁধ মিলাইয়া একসাথে মহানন্দে নৃত্য করিয়াছিল—কণ্ঠে সেদিনও ছিল গান। সে গান সামাজিক বন্ধনকে ভাঙিয়া মনুষ্যত্ব বিকাশের গান। সেদিনের মত আজও বাঙ্গালীর জীবনে তাহার চিরন্তনী স্বপ্ন ও সাধনা "একদেশ একভগবান, এক জাতি একমনপ্রাণ" আর একবার বাস্তবে রূপায়িত হইল। তাই আজ বাঙ্গালী তেমনি ভাবেই আর একবার মাতিল পথে পথে কাঁধে কাঁধ মিলাইয়া সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া বাহির হইল। সঙ্ঘশক্তিতে প্রাণশক্তির উদ্দীপন হইল—প্রাণের আর্ত্তি কণ্ঠে সঙ্গীত হইয়া ধ্বনিত

হইল। এবারের গান পরাধীনতার শিকল ভাঙার গান—আপন সত্তায় স্বকীয় সাধনায় প্রতিষ্ঠিত হইবার গান।

"ও আমার দেশের মাটি
তোমার পায়ে ঠেকাই মাথা ;
তোমাতে বিশ্বময়ীর তোমাতে বিশ্বমায়ের
আঁচল পাতা।"

অনুভূতির আন্দোলন কর্ম্মসূচীতে বাস্তবায়িত হইল। যাহা কিছু রাজশক্তির যাহা কিছু ব্রিটিশ শাসনের অঙ্গীভূত সব বর্জ্জন কর ; নূতন শব্দ জন্মগ্রহণ করিল—'বয়কট' ; ইংরাজের শিক্ষাপদ্ধতি বয়কট কর—ছাত্রেরা স্কুল কলেজ ছাড়িল। ইংরাজ শাসন ও বিচারালয় বয়কট কর—বহু ব্যক্তি ওকালতি ছাড়িলেন। ইংরাজ রাজশক্তি বণিকদেরই প্রতিভূ ; তাই ইংরাজের পণ্য বর্জ্জন কর, বিদেশাগত দ্রব্যসম্ভার অঙ্গে আর তুলিও না। মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নে রে ভাই। তাই বিলাতী বর্জ্জনের সহিত স্বদেশী আন্দোলন যুক্ত হইল। নিজের দেশে নিজের শ্রমে প্রস্তুত দ্রব্যাদির প্রতি মন ফিরিল। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনই দেশীয় শিল্প উন্মেষ ও সংগঠনের আদিপর্ব্ব। বিশেষ করিয়া ভারতীয় বস্ত্রশিল্পের। বাঙ্গলার ঘরে ঘরে আবার তাঁত চরকার আদর হইল। একদিন ইংরাজ রাজশক্তি ইংরাজ বণিকদের সহায়তায় স্বার্থবশেই বাঙ্গালী তাঁতীর অঙ্গুলি উৎপাটন করিয়াছিল—বাঙলীর তাঁতশিল্পের ধ্বংস করিয়াছিল আবার সময়চক্রে তাহাদের ডাক পড়িল।

স্রোতে স্রোতে বাঙ্গালীর জীবন কানায় কানায় তখন পরিপূর্ণ। সেই আবেগ, সেই উচ্ছ্বাস, সেই প্রাণমত্ততা বাঙ্গালীকে এক নবজীবনের আস্বাদ দিয়া চলিয়াছে।

বাঙ্গালী মনীষার এক শতকের সাধনা আজ ফুলে ফুলে বিকশিত হইয়া বাঙ্গালীর সমাজজীবনকে আনন্দ-উদ্বেল করিয়া তুলিল। একসূত্রে সহস্র সহস্র মন বাঁধা পড়িল।

"অতি বিস্তৃত অরণ্য। অরণ্য মধ্যে অধিকাংশ বৃক্ষই শাল, কিন্তু তদ্ভিন্ন আরও অনেক জাতীয় গাছ আছে। গাছের মাথায় মাথায় পাতায় পাতায় মিশামিশি হইয়া অনন্তশ্রেণী চলিয়াছে। বিচ্ছেদশূন্য ছিদ্রশূন্য আলোক প্রবেশের পথমাত্র শূন্য।+ + + নীচে ঘনান্ধকার মধ্যাহ্নেও আলোক অস্ফুট, ভয়ানক।

'একে এই বিস্তৃত অতি নিবিড় অন্ধতমোময় অরণ্য তাহাতে রাত্রিকাল। রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর। রাত্রি অতিশয় অন্ধকার, কাননের বাহিরেও অন্ধকার, কিছু দেখা যায় না। কাননের ভিতরে তমোরাশি ভূগর্ভস্থ অন্ধকারের ন্যায়।

'পশুপক্ষী একেবারে নিস্তব্ধ। কত লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি পশু, পক্ষী, কীট-পতঙ্গ সেই অরণ্য মধ্যে বাস করে। কেহ কোন শব্দ করিতেছে না। বরং সে অন্ধকার অনুভব করা যায় শব্দময়ী পৃথিবীর সে নিস্তব্ধ ভাব অনুভব করা যাইতে পারে না। সেই অন্তশূন্য অরণ্য মধ্যে সেই সূচীভেদ্য অন্ধকারময় নিশীথে সেই অননুভবনীয় নিস্তব্ধতা মধ্যে শব্দ হইল "আমার মনস্কাম কি সিদ্ধ হইবে না ?"

শব্দ হইয়া আবার সেই অরণ্যানী নিস্তব্ধতায় ডুবিয়া গেল। তখন কে বলিবে যে এ অরণ্য মধ্যে মনুষ্য শব্দ শুনা গিয়াছিল। কিছুকাল পরে আবার শব্দ হইল, আবার সেই নিস্তব্ধতা মথিত করিয়া মনুষ্যকণ্ঠ ধ্বনিত হইল 'আমার মনস্কাম কি সিদ্ধ হইবে না ?' এইরূপে তিনবার সেই অন্ধকার সমুদ্র আলোড়িত হইল। তখন উত্তর হইল 'তোমার পণ কি ?'

প্রত্যুত্তর বলিল, 'পণ আমার জীবনসর্ব্বস্ব।

প্রত্যুত্তরে বলিল—'জীবন তুচ্ছ, সকলেই ত্যাগ করতে পারে।'

"আর কি আছে ? আর কি দিব ?"

তখন উত্তর হইল "ভক্তি"।

সাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার যুগদিশারী উপন্যাস আনন্দমঠে যে জিজ্ঞাসা রাখিলেন তাহাই পরবর্ত্তীকালে তাঁহার ধর্ম্মতত্ত্ব-অন্তর্গত অনুশীলন প্রবন্ধে সুস্পষ্ট ও সুচারুরূপে প্রকাশ করিলেন। সাহিত্যিকের ইঙ্গিতকে তিনি তাত্ত্বিকের মীমাংসা দিলেন।

বঙ্কিমের অনুশীলনতত্ত্ব জীবনবাদ ও মানববাদের সঙ্গে অধ্যাত্ম-বাদের সংযুক্তি। এই ত্রিধারা পরস্পরবিচ্ছিন্ন নয়—মানুষের জীবন-সঙ্গমে সম্মিলিত মুক্তধারা। জীবনকে জানিতে হয় বহির্বিজ্ঞানে ও অন্তর্বিজ্ঞানে। তারপর জানিতে হইবে ঈশ্বরকে। ঈশ্বর জানিব কিসে? জানিব আমাদের উপনিষদে, দর্শনে, পুরাণে, ইতিহাসে, প্রধানতঃ গীতায়।

অনুশীলন কি? মানুষের কতকগুলি শক্তি আছে যাহাকে আমরা বৃত্তি নামে প্রকাশ করি। সেই বৃত্তিগুলির অনুশীলন, প্রস্ফুরণ ও চরিতার্থতায় মনুষ্যত্ব।

মনুষ্যত্বই মানুষের ধর্ম্ম। মনুষ্যত্বের পরিপূর্ণ বিকাশই মানব জীবনের সাধনা। তাই মানুষ হওয়াই ব্যক্তিজীবনের সমাজজীবনের একান্ত কাম্য।

বাঙ্গলার কবি চণ্ডীদাস তাই গাহিয়াছেন—'সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই।' উত্তরসূরী ভারত-চেতনা বিবেকানন্দ প্রার্থনা করিলেন 'মা আমায় মানুষ কর'।

বঙ্কিমের অনুশীলনতত্ত্ব মানুষ হওয়া ও মানুষ গড়ার তত্ত্ব। মনুষ্যজীবনের এই বৃত্তিগুলির সীমা নির্দ্ধারণ ও সামঞ্জস্য বিধানই সুখ।

ঈশ্বরমুখিতাই উপযুক্ত অনুশীলন। ইহাই ভক্তি।

ঈশ্বর কি ও কেমন?

ঈশ্বর সর্ব্বভূতে আছেন ইহাই পরম প্রত্যয়। তাই সর্ব্বভূতে প্রীতিই ঈশ্বরে ভক্তি। সর্ব্বভূতে প্রীতি ব্যতীত ঈশ্বরভক্তি নাই।

এই প্রকার প্রীতিবিহীন মানুষ, সমাজ বা জাতি মনুষ্যত্বহীন, ধর্ম্মহীন। যুগপুরুষ রামকৃষ্ণ তাই শুনাইয়া গেলেন—শিবজ্ঞানে জীবপূজা। রামকৃষ্ণের মানসপুত্র ঘোষণা করিলেন—

"বহুরূপে সম্মুখে তোমার কোথা তুমি খুঁজিছ ঈশ্বর
জীবে পূজা করে যেইজন সেইজন সেবিছে ঈশ্বর।"

আত্মপ্রীতি, স্বজনপ্রীতি, স্বদেশপ্রীতি এই প্রীতিরই অন্তর্গত। অনুশীলন তত্ত্বের প্রবক্তা বঙ্কিমচন্দ্রের মূলকথা সকল ধর্ম্মের উপর স্বদেশপ্রীতি। নিজেকে প্রকৃত ভালবাসিতে না শিখিলে যেমন পরকে ভালবাসা যায় না, আপন জন্মভূমির প্রতি ভালবাসার সঞ্চার না হইলে বিশ্বজনীন ভালবাসা অলীক ও নিরর্থক।

এ স্বদেশপ্রীতি য়ুরোপের Patriotism নহে। য়ুরোপীয় Patriotism ধর্ম্মের তাৎপর্য্য হইল—পরের সমাজের কাড়িয়া ঘরের সমাজে আনিবে। স্বদেশের শ্রীবৃদ্ধি করিবে, কিন্তু অন্য সমস্ত জাতির সর্ব্বনাশ করিয়া তাহা করিতে হইবে।

ধর্ম্মহীন স্বদেশপ্রীতি Imperialism-এর মূল। বঙ্কিমের স্বদেশ-প্রীতি বিশ্বপ্রীতির নামান্তর। তাঁহারই ভাষায় "দেশপ্রীতি ও বিশ্ব-লৌকিক প্রীতি উভয়ের অনুশীলন ও পরস্পরের সামঞ্জস্য চাই। তাহা ঘটিলে ভবিষ্যতে ভারতবর্ষ শ্রেষ্ঠ জাতির আসন গ্রহণ করিতে পারিবে। পরবর্ত্তীকালে এই সামঞ্জস্যের সাধনায় সমাহিত হন স্বাদেশিকতার বিপ্লবী নেতা শ্রীঅরবিন্দ এবং সিদ্ধ হন শ্রীঅরবিন্দ-রূপে—বিশ্বজনীন মানবতার প্রবক্তা রূপে।

বঙ্কিমের মতে দেশপ্রীতিকে সর্ব্বজনীন প্রীতিতে ডুবাইয়া দেওয়াতেই অতীতে ভারতবর্ষের অবনতি ও অধোগতি। স্বদেশের মানুষকে, স্বদেশের ফুলফলকে, স্বদেশের কৃষ্টি ও কল্যাণকে ভাল না বাসিয়া বিশ্বজীবনের কলা ও কৃষ্টিকে ভালবাসিতে যাওয়া শূন্যে সৌধ নির্ম্মাণের মত হাস্যাস্পদ। দুয়ারের পাশে নবতৃণ বুকে প্রভাতের

স্নিগ্ধ একবিন্দু শিশিরের কম্পন না দেখিয়া বিশ্ব ব্যাপিয়া সিন্ধু দর্শনে যাওয়ায় অহমিকা থাকিতে পারে—আত্মতৃপ্তি নাই। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার স্বদেশ বন্দনায় এই ভাবেরই প্রতিধ্বনি করিয়াছেন "তোমাতে বিশ্বময়ীর তোমাতে বিশ্বমায়ের আঁচল পাতা .

অনুশীলনে আদর্শের প্রয়োজন। সেই আদর্শ ভারতের মানুষ কৃষ্ণ। আর কৃষ্ণকণ্ঠে-উচ্চারিত গীতাতেই সেই অনুশীলনের মহামন্ত্র উচ্চারিত।

তাই বঙ্কিমের সুস্পষ্ট মতবাদ—"যিনি বাহুবলে দুষ্টের দমন করিয়াছেন, বুদ্ধিবলে ভারতবর্ষ একীভূত করিয়াছেন, জ্ঞানবলে অপূর্ব্ব নিষ্কাম ধর্ম্মের প্রচার করিয়াছেন আমি তাঁহাকে নমস্কার করি। যিনি সর্ব্ববলাধার, সর্ব্বগুণাধার, সর্ব্বধর্ম্মবেত্তা, সর্ব্বপ্রেমময়—তিনি ঈশ্বর হউন বা না হউন আমি তাঁহাকে নমস্কার করি।"

এমনি পরিপূর্ণ মানবসত্তার যে বাণী তাহাই গীতা। এই গীতাতেই অনুশীলন ধর্ম্মের পরিস্ফুরণ, তাই গীতাই মনুষ্যত্বের পরম বেদ। সেই দিনের ভারতের মাটিতে বেদ-প্রবল দেশে বেদ-প্রবল সময়ে পুরুষোত্তম পূর্ণ প্রত্যয়ে বলিয়াছিলেন—সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ—অর্থাৎ আমার বাণীর শরণ লও, মানুষ হও—মনুষ্যত্বের সাধনা কর। বেদ সত্বরজঃ তমঃ গুণাশ্রিত—তুমি এই ত্রিগুণকে উত্তরণ কর—পরিপূর্ণ প্রভাবে প্রতিভাত হও। তোমার বিজয় সুনিশ্চিত।

"বেদ ধর্ম্ম নহে—ধর্ম্ম লোকহিতে।" বহুর হিতার্থে প্রত্যেকের সাধনাই প্রকৃত ধর্ম্ম।

মানুষের বৃত্তিগুলিকে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার অনুশীলন তত্ত্বে চারি ভাগে ভাগ করিয়াছেন। (১) শারীরিকী (২) জ্ঞানার্জ্জনী (৩) কার্য্যকারিণী ও (৪) চিত্তরঞ্জিনী।

শারীরিক বৃত্তি অনুশীলন না করিলে শক্তির সঞ্চার হয় না।

যাহার শক্তি নাই সে আত্মরক্ষায় অক্ষম। দুর্ব্বলের পীড়নকে যে প্রতিহত করিতে না পারে সেই অধার্ম্মিক। রবীন্দ্রনাথের কাব্যে তাহারই প্রতিধ্বনি পাই—অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে
তব ঘৃণা যেন তারে তৃণসম দহে।"

ব্যায়ামের দ্বারা শারীরিক শক্তি অর্জ্জন করিতে হয়—ইহাই অনুশীলন। নিষ্ঠা থাকিলে, আদর্শ থাকিলে শক্তির সাথে প্রীতির মিলন হয়। সুস্থ মন সুস্থ দেহে বিকশিত হয়। ইংরাজী সভ্যতায় নব্য বঙ্গ ডন, কুস্তি ভুলিতে বসিয়াছে। লাঠির যুগ গত হইয়াছে। বঙ্কিম আগেই আক্ষেপ করিয়াছেন 'হায় লাঠি তোমার দিন গিয়াছে'। মল্লযুদ্ধের অনুশীলন ছাত্রসমাজ যুবসমাজ ভুলিতে বসিয়াছে।

বঙ্কিমের মতে সকলের সর্ব্ববিধ অস্ত্রপ্রয়োগে সক্ষম হওয়া উচিত। অশ্বারোহণ, পদব্রজে দূরগমন সন্তরণ ও শারীরিক বৃত্তির বিভিন্ন অনুশীলন।

"যে কর্ম্মকারক আপনার কর্ম্ম জানে সে যেমন আপনার অস্ত্রখানি তীক্ষ্ণধার ও শাণিত করিয়া সকল দ্রব্য ছেদনের উপযোগী করে, দেহকে সেইরূপ একখানি শাণিত অস্ত্র করিতে হইবে যেন তদ্দারা সর্ব্বকর্ম্ম সিদ্ধ হয়।"

কি উপায়ে ইহা হইতে পারে? ব্যায়াম, শিক্ষা, আহার ও ইন্দ্রিয়সংযম।

বঙ্কিম দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলিয়াছেন—"শারীরিক ও মানসিক বৃত্তিগুলি সম্বন্ধ-বিশিষ্ট; একের অনুশীলনের অভাবে অন্যের অনুশীলনের অভাব ঘটে। অতএব যে সকল ধর্ম্মোপদেষ্টা কেবল মানসিক বৃত্তির অনুশীলনের উপদেশ দিয়াই ক্ষান্ত, তাঁহাদের কথিত ধর্ম্ম অসম্পূর্ণ। যে শিক্ষার উদ্দেশ্য কেবল জ্ঞানার্জ্জন, সে শিক্ষা অসম্পূর্ণ, সুতরাং ধর্ম্মবিরুদ্ধ। কলেজে ছেলে পড়াইলেই ছেলে মানুষ হয় না এবং কতকগুলি বই পড়িলেই পণ্ডিত হয় না।"

তাঁহার বক্তব্য আমাদের শিক্ষাপ্রণালীতে জ্ঞানার্জ্জনী বৃত্তিগুলির উপর অধিক মনোযোগ আকৃষ্ট, কার্য্যকারিণী বা চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তিগুলির প্রতি আমরা অমনোযোগী।

সর্ব্বপ্রকার বৃত্তি পরস্পরের সহিত সামঞ্জস্যবিশিষ্ট হইয়া অনুশীলিত হইবে কেহ কাহাকেও ক্ষুণ্ণ করিয়া অসঙ্গত বৃদ্ধি পাইবে না।

অনুশীলন তত্ত্বের উপসংহারে তিনি শুনাইলেন—রাজা যতক্ষণ প্রজাপালক ততক্ষণ তিনি রাজা, যখন তিনি প্রজাপীড়ক হইলেন তখন আর রাজা নহেন, আর ভক্তির পাত্র নহেন।

"সমাজকে ভক্তি করিবে। মনুষ্যের যত গুণ আছে সবই সমাজে আছে। সমাজ আমাদের শিক্ষাদাতা, দণ্ডপ্রণেতা, ভরণ-পোষণ এবং রক্ষাকর্ত্তা। সমাজই রাজা সমাজই শিক্ষক।"

বঙ্কিম উদ্‌ভ্রান্ত সমাজচেতনাকে আবার আপন শক্তির সন্ধান দিলেন, স্বকীয় মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করিলেন।

জ্ঞান ও কর্ম্মের সুসংহত সামঞ্জস্যের উপরই ভক্তি প্রতিষ্ঠিত। আত্মবলিদান হয়ত অনেকেই দিতে পারে—ভক্তি দেওয়া অধিকতর দুরূহ। তাই তামসী রাত্রে অদৃশ্য মনুষ্যকণ্ঠ ভক্তি চাহিয়াছিল। ঈশ্বরাভিমুখী অনুশীলনই ভক্তি—আত্মার হিতে, সমাজের হিতে, বিশ্বের হিতে এই অনুশীলনের একান্ত প্রয়োজন। যে ব্যক্তির মধ্যে ইহার স্ফুরণ তিনিই মানুষ, যে জাতির মধ্যে ইহার পূর্ণ প্রকাশ সেই জাতিই বিশ্ববন্দিত, ইতিহাসের রথের চালক। একদিন ভারতবর্ষ এই মানবতার সাধনা করিয়াছিল বলিয়াই সেইদিন তাই বলিতে পারিয়াছিল জগৎ-জনক-জননীই আমার পিতামাতা—এই ভুবনত্রয়ই আমার স্বদেশভূমি। বিন্দুর মধ্যেই সিন্ধুর বাণী শুনিয়াছিল। অণুতে অনন্তের ইঙ্গিত পাইয়াছিল।

আপন গৃহ-অঙ্গনকে ভালবাসিয়া বিশ্ব-অঙ্গনের ভাবমূর্ত্তি কল্পনা

করিয়াছিল। তাই ভারতবর্ষই ঘরের ছেলের চক্ষে বিশ্বভূপের ছায়ার স্পর্শ পাইয়াছিল।

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার অনুশীলনতত্ত্বে আবার সেই মনুষ্যত্বের আহ্বান করিয়াছেন? বিকাশের তত্ত্ব শুনাইয়াছেন। জ্ঞানযোগী বঙ্কিম কর্ম্মযোগীর প্রত্যাশায় সতৃষ্ণ হইয়াছেন। দেশের প্রতি, জাতির প্রতি ভক্তির অর্ঘ্য চাহিয়াছেন—ইহাই অনুশীলনতত্ত্ব।

অনুশীলনতত্ত্ব মন্থন করিয়া মহামন্ত্র আগেই ভবিষ্যতের জন্য দিয়াছেন—বন্দে মাতরম্।



কবি কল্পনা করেন, সাহিত্যিক সাধনা করেন, দার্শনিক জীবনকে দর্শন করেন, তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করেন। এ সবই জ্ঞানকাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত। যদি কবি, সাহিত্যিক, দার্শনিক বা তাত্ত্বিকের সাথে বা পরে আসিয়া কর্ম্মযোগী মিলিত হ'ন বা অনুসরণ করেন তাঁহাদের স্বপ্ন সাধনা ও জ্ঞান আপন প্রচেষ্টায় কর্ম্মে রূপায়িত করেন তবে জাতির জীবন-চক্রে যে গতি সঞ্চারিত হয় তাহা সমগ্র জাতির অন্তর্নিহিত সত্তাকে প্রাণ-স্পন্দনে উদ্বেল করিয়া তুলে। আচম্বিতে জাতির চরিত্র

পালটাইতে সুরু করে, জড়তা কাটে, আত্মবিশ্বাস ফিরিয়া আসে, জাতি আত্মস্থ হয়। জ্ঞানযোগী ও কর্ম্মযোগীর এই মিলন স্বর্ণযুগের সূচনা করে। পৃথিবীর ইতিহাসে কিম্বা কোন দেশের বা জাতির ইতিহাসে এরূপ ঘটনা তখনই ঘটে যখন ভাগ্যবিধাতা প্রসন্ন হন এইটাই মহাকালের পার্শ্বপরিবর্ত্তনের লগ্ন।

বাঙলা তথা ভারতের ইতিহাসে আর একবার এইরূপ মিলন উনিশ শতকের শেষপাদে আসিয়া সংঘটিত হইল। বঙ্কিমের আনন্দমঠ বিদ্যুৎপ্রবাহে বাঙালীকে বিস্মৃতপ্রায় স্বপ্ন সম্ভাবনায় শিহরিত করিয়া তুলিয়াছে। মুক্তিপিপাসু জাতিকে মুক্তিমন্ত্রের ঝঙ্কার শুনাইল। জননী জন্মভূমিকে রিপুদলবারিণী, কমলা কমলদল বিহারিণী, বাণী-বিদ্যাদায়িনী রূপে মূর্ত করিল। নিবেদিতপ্রাণ একনিষ্ঠ সন্তানদলের সম্ভাব্য মাতৃবন্দনায় মন্ত্রধ্বনি অকম্পিত উচ্চারণে রোমাঞ্চ আনিল। বঙ্কিমের অনুশীলনতত্ত্ব সেই স্পন্দনে ইন্ধন জোগাইল। তিনি জাতির কর্ম্মকৌশলের বিধান দিলেন, চলার পথের নির্দ্দেশ দিলেন।

যুগান্তের গ্লানি হইতে মুক্ত করিয়া ভারতের সংস্কৃতিকে, অধ্যাত্ম ভারতকে যে যৌবন-তরঙ্গ বিশ্বের মানবতার দেউলে পুনঃ প্রতিষ্ঠা দিলেন তিনি তাঁহার সহযোগীদের সঙ্গে যখন সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন তখন আপন আপন সন্ন্যাসাশ্রমের নামকরণে আনন্দমঠের সন্ন্যাসী-কুলের নামের পদাঙ্ক অনুসরণ করিলেন। বঙ্কিমের কল্পনার সত্যানন্দ, জ্ঞানানন্দ জীবানন্দ বাস্তবে বিবেকানন্দ, অভেদানন্দ নিখিলানন্দে রূপায়িত হইলেন। নবীন সন্ন্যাসীদের ঈশ্বরপ্রীতি স্বদেশপ্রীতিতে রূপান্তরিত হইল। কোটি কোটি পদদলিত অবহেলিত জনতার দুঃখ বিমোচনে বিবেকানন্দ স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইলেন। ঘোষণা করিলেন চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই, ভারতবর্ষই আমার যৌবনের উপবন, বার্দ্ধক্যের বারাণসী।

সন্ন্যাসী মানুষ চাহিলেন। মানুষ গড়ার সঙ্কল্প লইয়াই তাঁহাকে ইহলোক ত্যাগ করিতে হইল। ১৯০২ সালে পরিপূর্ণ গৌরবে মাত্র উনচল্লিশ বৎসর বয়সে বিশ্ব-নন্দিত ভারত-আত্মার অন্তর্গূঢ় বিবেক-বাণী রুদ্ধকণ্ঠ হইল। মধ্যাহ্ন গগনের প্রদীপ্ত ভাস্কর অকস্মাৎ অস্তমিত হইল।

তবে কি মানুষ গড়া বন্ধ হইয়া গেল ? 'না' ইতিহাস আর এক কর্ম্মযোগীকে উপস্থাপিত করিল। তিনি কম্বুকণ্ঠ সন্ন্যাসী নন, সাধারণ গৃহস্থ মানুষ।

এই ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দেই সুখে দুঃখে উদ্বেলিত সমাজের সর্ব্বস্তরের জীবনকে মানুষ করিতে বঙ্কিমের ভাবশিষ্য কর্ম্মযোগী ব্যারিস্টার প্রমথ মিত্র কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। অনুশীলন সমিতির প্রতিষ্ঠা হইল। বঙ্কিমের অনুশীলনতত্ত্বের মূলমন্ত্র কর্ম্মপ্রবাহে রূপায়িত করাই হইল মূল লক্ষ্য।

১৩০৮ সালের ১০ই চৈত্র সোমবার ইং ২৪শে মার্চ্চ ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দের দোলপূর্ণিমার পুণ্যলগ্নে অনুশীলন সমিতির জন্ম হইল। সভাপতি—প্রমথনাথ মিত্র স্বয়ং, সহ-সভাপতি—অরবিন্দ ও চিত্তরঞ্জন, সম্পাদক—সতীশচন্দ্র বসু, কোষাধ্যক্ষ—সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর। ভগিনী নিবেদিতাও এই সমিতির সহিত যুক্ত হইয়াছিলেন। যুগসন্ধিক্ষণে যুগান্তকারী ভবিষ্য ঘটনার মঙ্গলঘট স্থাপিত হইল। ভবিষ্যৎ ইতিহাসের দেদীপ্যমান জীবন ও চরিত্রের সমাবেশ ঘটিল। স্বামিজীর মানসকন্যাও স্বামিজীর আরব্ধ কার্য্যের রূপায়ণে নিজেকে উৎসর্গ করিলেন।

প্রথমেই সুরু হইল শারীরিক বৃত্তির অনুশীলন। পল্লীতে পল্লীতে সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইল। ডন, কুস্তি, অসিচালনা, লাঠিখেলা বাঙালী যুবসমাজকে উদ্বুদ্ধ করিল। সুস্থ সবল সুগঠিত দেহ চাই ; সাহস চাই—শক্তি চাই—ভক্তি চাই—শেষ কথা মানুষ চাই।

রবীন্দ্রনাথের বাঁশীতে বিষানের সুর বাজিল।
"অন্ন চাই, প্রাণ চাই, আলো চাই, চাই মুক্ত বায়ু,
চাই বল, চাই স্বাস্থ্য, আনন্দ উজ্জ্বল পরমায়ু।
সাহস বিস্তৃত বক্ষপট"

কর্ম্মযোগী প্রমথনাথ জ্ঞানযোগী বঙ্কিমের অনুশাসন বাস্তবায়িত করিবার সঙ্কল্প লইলেন। পথ-পরিক্রমা সুরু হইল। বাঙলা তথা ভারতের ইতিহাসে অনুশীলন সমিতির অবদান অপরিসীম। ভবিষ্যতের বিপ্লবাদর্শের বৈপ্লবিক চেতনার সূতিকাগৃহ এই অনুশীলন সমিতি।

গোমুখী-নির্গতা জাহ্নবী যেমন বহু ছোট বড় নানা নদনদীর বারি আপন বক্ষে ধারণ করিয়া ছোট বড় নানা নদীতে বিভক্ত হইয়া বহু জনপদ গ্রাম অরণ্য প্রান্তর সজীব ও শ্যামায়িত করিয়া নিরবচ্ছিন্ন ধারায় উত্তরোত্তর পরিবর্দ্ধিত স্রোতগতিতে সাগরাভিমুখে ছুটিয়া চলিয়াছে তেমনি মনুষ্যত্ব বিকাশ-কল্পের এই ভাবতরঙ্গিণী ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে অনুশীলনের গঙ্গোত্রী হইতে উদ্ভূত হইয়া বহু ভাবধারায় সঞ্জীবিত ও সুপুষ্ট হইয়া পথপরিক্রমায় বহুধারায় দল ও উপদলে বিভক্ত হইয়াছে এবং স্বাধীনতা সাগরের প্রয়াসে বহু বাধা অতিক্রম করিয়া নিরন্তর গতিতে প্রবাহিত হইয়াছে।

সাগর-সঙ্গমে স্বাতন্ত্র্যের রক্তসূর্য্য ভারতগগনে উদিত হইয়াছে। এই ভাবধারায় ভগীরথ ব্যারিস্টার প্রমথনাথ মিত্র বঙ্কিমের ভাবশিষ্য, জ্ঞানযোগীর অনুসরণকারী কর্ম্মযোগী। বাঙলা তথা ভারতের ইতিহাসে এক মাহেন্দ্রক্ষণ, স্বর্ণযুগের উদ্বোধন।

আজিকার জনমানসে স্বাধীনতার বেদীমূলে সমর্পিতপ্রাণ বহু নায়ক ও মনীষীর নাম চিরদীপ্ত রহিয়াছে কিন্তু যিনি কল্পনার জগৎ হইতে কর্ম্মধারায় এই স্বাধীনতার সত্তাকে রূপায়িত করিতে মঙ্গলঘট স্থাপনা করিয়া ঋত্বিকরূপে আহ্বানমন্ত্র উচ্চারণ করিয়াছিলেন

তাঁহার নাম আজ জনসাধারণের নিকট তেমন পরিচিত নয়। বোধনের পূজারী কি বিস্মৃতিতেই হারাইয়া থাকিবেন ?

১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে অক্টোবর নৈহাটীতে যেদিন প্রমথ-নাথের জন্ম হয় সেদিন কার্ত্তিক মাসের অমাবস্যা তিথি। মহাশক্তি মহাকালীর পূজা। হেমন্তের হিম ও কুয়াসায় সেদিন অন্ধকার আরও নিবিড়। নামকরণ হইল প্রমথনাথ; মাতা নাম রাখিলেন ভুলী।

পিতা বিপ্রদাস মিত্র সে যুগের সিবিল ইঞ্জিনিয়ার, নব্যবঙ্গের শিক্ষিত যুবক উচ্চপদস্থ সরকারী কর্ম্মচারী। মাতা চপলা দেবী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম এম্. বি. এবং যশস্বী চিকিৎসক রিষড়ার বিপ্রদাস দে'র কন্যা। মাতৃকুল ও পিতৃকুল উভয় কুলেই উনবিংশ শতকের শিক্ষা, সচ্ছলতা, প্রসারতা ও প্রজ্ঞা বিদ্যমান।

বালক প্রমথনাথ অল্পবয়স হইতেই শরীরচর্চ্চায় আকৃষ্ট হইলেন। তাহার পর লাঠি খেলায় মনপ্রাণ সমর্পণ করিলেন। মাতা পুত্রের সুগঠিত দেহ, বিস্তৃত বক্ষ, সাহস ও লাঠির প্রতি অহেতুক আগ্রহ দেখিয়া সখেদে বলিতে সুরু করিলেন, ভুলী দেখছি ডাকাত হবে; অমাবস্যার নিশীথে জন্ম, না হইয়া উপায় নাই। তিনি পুত্রের লাঠি-খেলায় বাদ সাধিলেও পিতার সহায়তায় ও অনুপ্রেরণায় প্রমথ-নাথকে লাঠি পরিত্যাগ করিতে হয় নাই।

এই লাঠিকে তিনি এত ভালবাসিতেন যে সুরেন্দ্রনাথের "বেঙ্গলী" পত্রিকার সঙ্গে যখন তিনি যুক্ত তখন একটি সম্পাদকীয় নিবন্ধে লিখিলেন—

"The lathi is a national weapon of Bengal. A Bengalee lathial, properly trained can with his single lathi keep half a dozen swordsmen at bay."

এইখানেও বঙ্কিমের প্রতিধ্বনি।

"হায় লাঠি! তোমার দিন গিয়াছে! তুমি ছার বাঁশের বংশ বটে, কিন্তু শিক্ষিত হস্তে পড়িলে তুমি না পারিতে এমন কাজ নাই। তুমি কত তরবারি দুই টুক্‌রা করিয়া ভাঙিয়া ফেলিয়াছ, কত ঢাল খাঁড়া খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিয়াছ—হায়! বন্দুক আর সঙ্গীন তোমার প্রহারে যোদ্ধার হাত হইতে খসিয়া পড়িয়াছে। যোদ্ধা ভাঙ্গা হাত লইয়া পলাইয়াছে। লাঠি তুমি বাঙলার আব্রু পর্দ্দা রাখিতে, মান রাখিতে, ধান রাখিতে, ধন রাখিতে, জন রাখিতে, সবার মন রাখিতে।"

কল্পনায় বঙ্কিম লাঠির যে রূপ দেখিয়াছেন প্রমথনাথ সেই লাঠির সহিত মিতালী করিয়া একাত্ম হইয়া সেই লাঠি নিজে খেলিয়া ও অনুশীলন করিয়া তাহার বিশেষত্ব বুঝিয়াছেন। তাই ভবিষ্যতে বাঙলাকে সে খেলা শিখাইবার আয়োজন করিলেন।

সরকার কর্ত্তৃক তখন হুগলী কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কলেজের স্কুল বিভাগে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা সমাপনান্তে প্রমথনাথ কলেজে ভর্ত্তি হইলেন। তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে অধ্যয়নরত প্রমথ-নাথ বিলাত রওনা হইয়া গেলেন। মাতামহ ও পিতা উভয়ই প্রমথনাথকে ভবিষ্যৎ জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত দেখিতে চাহিলেন। তাই ভুলীকে পিতামাতার সান্নিধ্য ছাড়িয়া স্বজন ও পরিবেশ পরিত্যাগ করিয়া সুদূর ইংলাণ্ডে পাড়ি জমাইতে হইল মাত্র পনের বৎসর বয়সে ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে। সেই দিনের বিলাত যাত্রা ও অবস্থান আজিকার মত এত সহজ ও সরল ছিল না। তাহার উপর মাত্র পঞ্চদশ বয়স্ক কিশোর। একশত বৎসরের অধিক সময়ের পূর্ব্বে বাঙালীর তারুণ্যের পানে বিস্ময়ে তাকাইয়া থাকিতে হয়।

প্রমথনাথ আই. সি. এস. পরীক্ষা দিয়া ভারতে উচ্চতম সরকারী চাকরীতে বহাল হউন ইহাই গুরুজনদের অভিপ্রায়।

একদিকে সিবিল সার্ভিস পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি চলিতে লাগিল

অন্যদিকে মিড্‌ল টেম্পল বারে ব্যারিস্টারী শিক্ষানবিশী চলিল। প্রমথনাথের চরিত্রে শুধু লেখাপড়া লইয়াই সন্তুষ্ট থাকিবার অভ্যাস নাই। তাই অশ্বচালনা কৌশল, মুষ্টিযুদ্ধ, অসি খেলা পদ্ধতির অনুশীলন সুরু হইল। এমন কি ক্ষত্রিয়তেজা প্রমথনাথ সৈনিক জীবনের শিক্ষামানসে ফ্রান্সে আসিয়া ফরাসী ঔপনিবেশিক সৈন্যবাহিনীতে নাম লিখাইবার প্রয়াস পাইলেন কিন্তু অনুমতি মিলল না। ক্ষত্রিয় ধর্ম্মের পূজারী কেবলমাত্র জ্ঞানতপস্যায় সমাহিত হইতে পারেন নাই।

সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় সংস্কৃত পরীক্ষার দিন আমাশয় রোগে আক্রান্ত হওয়ায় আর উপস্থিত হইতে পারিলেন না। তাই বিশিষ্ট রাজকর্ম্মচারীর গৌরব তিলক তাঁহার ললাটে অনঙ্কিত রহিয়া গেল। পিতা এবং মাতামহ হয়ত ব্যথিত হইয়াছিলেন কিন্তু বঙ্গজননী নিশ্চয়ই আনন্দাশ্রুবর্ষন করিয়াছিলেন।

ইহার পর অরবিন্দ অতি তুচ্ছ কারণেই সিভিল সার্ভিসের জয়টীকা পান নাই। পাইলে হয়ত আমরা একজন জবরদস্ত সিভিলিয়ান পাইতাম, শ্রীঅরবিন্দকে হারাইতাম।

আরও পরে সুভাষচন্দ্র এই পরীক্ষায় পাশ করিয়াও রাজতিলক ললাটে পরেন নাই, বরণের আগেই বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন। ইতিহাসের এই রসিকতায় বিস্মিত হইতে হয়। যাঁহাদের জন্ম ইংরাজের নাগপাশ হইতে ভারতের মুক্তিসাধনার ঋত্বিকরূপে, যাঁহারা মহাকালের বিশ্বরঙ্গ মঞ্চে চিহ্নিত লবকুশরূপে প্রেরিত হইয়াছেন তাঁহারাই ইংরাজ সাম্রাজ্যের নাগপাশ পরাইবার বিশেষদূতরূপে প্রশিক্ষণ লাভের জন্য ইংল্যাণ্ডের ভূমিতে পাঠ গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু চলমান ইতিহাস তাঁহাদিগকে ফিরাইয়া দিয়াছে। খণ্ডকাল অবাক হয়, কিন্তু মহাকালের কার্য্যকারণের অর্থ কাল গত হইলে উদ্ভাসিত হয়।

১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে উনিশ বৎসর বয়সে ব্যারিস্টার প্রথমনাথ ভারতে প্রত্যাবর্তন করিলেন।

তাঁহার প্রথমাপত্নী ঢাকার মালখা নগরের কাশীনাথ বসুর কন্যা—কিন্তু বিবাহের মাত্র দুবৎসর বাদেই তিনি বিপত্নীক হইলেন। দ্বিতীয় বার পরিণয় হইল আন্দুলের সুরথনাথ বসু মল্লিকের কন্যা সুরেন্দ্র-বালার সহিত।

সেদিনের সমাজে বিলাতফেরত পুত্রকে স্বগৃহে স্থানদান এক গর্হিত সামাজিক অপরাধ ও সমাজদ্রোহিতা। তাই পিতা বিপ্রদাস মিত্র সমাজচ্যুত হইলেন, সমাজচ্যুত হইয়াও তিনি পুত্রকে পৃথক করিলেন না। অভিমানে খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন। খৃষ্টান পিতা ও হিন্দুপুত্র একই গৃহে একান্নবর্ত্তী হইয়া বসবাস করিতে লাগিলেন। তৎকালে এমত অবস্থায় হিন্দুকন্যা পাত্রীরূপে পাওয়া যে কত দুরূহ হয়ত তাহা বর্ত্তমানে হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব নয়। তবু প্রমথনাথ দ্বিতীয়বার দার-পরিগ্রহে হিন্দুকন্যা ব্যতীত বিবাহ করিবেন না পণ করিলেন এবং হিন্দুকন্যাই বিবাহ করিলেন। গীতায় "স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ" এই নির্দ্দেশ তাঁহাকে চালিত করিয়াছিল কিনা তাহা বলা দুষ্কর।

কলিকাতায় আইন ব্যবসায় আরম্ভ করিলেন কিন্তু পসার জমিল না। ক্ষণেকের তরে বৈরাগ্য আসিলেও নব উদ্যমে প্রমথনাথ মেদিনীপুরে ওকালতী সুরু করিলেন। সেখানেও মনস্কাম সিদ্ধ না হওয়ায় বরিশালে চলিয়া যান ও সেইখানে সুনামের সহিত চারি বৎসর ফৌজদারী মামলা পরিচালনা করেন।

রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ রিপন কলেজ প্রতিষ্ঠিত করিয়া প্রমথনাথকে আহ্বান জানাইয়া অধ্যাপকের পদ গ্রহণে অনুরোধ করিলেন প্রমথনাথ আবার কলিকাতায় ফিরিলেন—একযোগে অধ্যাপনা ও কলিকাতা হাইকোর্টে আইন ব্যবসা আরম্ভ করিলেন। এইবার দু বৎসরের মধ্যে পসার জমিয়া উঠিল। এই পরম যোগাযোগে প্রমথনাথের জীবনে ভবিষ্যৎ পথরেখা নির্দ্দেশিত হইল।

১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে মাতৃবিয়োগ ও ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে পিতৃবিয়োগ ঘটিল।

তিনি ইহার পর সুরেন্দ্রনাথের 'বেঙ্গলী' পত্রিকায় যোগ দিলেন। এই পত্রিকায় তিনি বহু নিবন্ধ লিখিয়াছেন এবং এই লেখনীর মধ্য দিয়াই তাঁহার অন্তরের স্বপ্ন ও জীবন সাধনা ধীরে ধীরে মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিতে লাগিল।

সেদিনের ব্যারিস্টারসমাজ পুরাদস্তুর সাহেবিয়ানায় অভ্যস্ত; শুধু আচার ও আচরণে নয়—ভাবে ও ভাবনায়। প্রমথনাথ তাহার ব্যতিক্রম। ইঙ্গভাবাপন্ন বন্ধুদের উদ্দেশে তিনি লিখিলেন৷

"The anglicized Hindu, educated in the Materialistic methods of Europe, dazzled by the glitter of that superficial refinement and of that superficial splendour which clothes as with a cost of garment, the social life of modern Europe cannot perceive lurking underneath the magnificent drapery of the dreadful desire which is slowly but surely eating into the system."

অশান্ত বাস্তব শান্তি চায় কিন্তু শান্তি পায় না। অর্থনামযশ সব আছে কিন্তু কি যেন নাই, কি যেন পাওয়া বাকী। শান্তির আশায় তিনি চট্টগ্রামের স্বামী পূর্ণানন্দের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিলেন।

তখনকার দিনেই তিনি মাতৃভাষাকে শিক্ষার বাহনরূপে চাহিয়াছিলেন। তাই নিজেই বাঙ্গলায় তর্কশাস্ত্র (logic) রচনা করিলেন। একখানি উপন্যাস লিখিলেন—নাম 'যোগী' এবং ইংরাজীতে লিখিলেন Trial of Maharaja Nund Coomar। জানি না এইসব পুস্তকে কি তিনি লিখিয়াছেন, তবে বইয়ের নামগুলি দেখিয়া

বলিতে পারা যায় তাঁহার মনের ভাবনা তাহাতে প্রকাশিত হইয়াছে।

রাজনীতি ক্ষেত্রে প্রমথনাথ ছিলেন প্রগতিশীল, বিপ্লবী এবং আত্মশক্তিতে বিশ্বাসী। কংগ্রেসের আবেদন নিবেদনে তিনি সাড়া পাইতেন না। ভিক্ষানীতি ত্যাগ করিয়া পূর্ণ স্বাধীনতাই ছিল তাঁহার কাম্য—তাঁহার লক্ষ্য। তিনি বুঝিয়াছিলেন স্বাধীনতা দানের বস্তু নয় ছিনাইয়া আনিতে হয়। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন যখন চলিতেছে তখন ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ার দিকে বিপিন পালের সহিত প্রমথনাথ ঢাকায় আসেন ও নানা আলোচনায় যোগ দেন। আলোচনা চলাকালে প্রমথনাথ বলিয়া উঠেন—"এ সমস্ত স্বদেশী-ফদেশী, বিলাতীবর্জ্জনে-ফর্জ্জনে কিছুই হবে না, ক্ষমতা থাকে তো ইংরাজ তাড়াও আর নয়ত মর"।

কয়েকজন উকিল প্রতিবাদ করেন—এ যে অসম্ভব। প্রমথনাথ উত্তেজিত হইয়া পড়িলেন—দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিতে সুরু করিলেন "আমরা আর ফিরিতে পারি না—The sword has been drawn it must be thurst either in the breast of our enemies or in our breast" বলিতে বলিতে উত্তেজিত প্রমথনাথ আপন বক্ষে করাঘাত করিতে লাগিলেন। ইহাই প্রমথনাথের অন্তর্নিহিত চরিত্র।

এইখানেই প্রমথনাথের সহিত পুলিন দাসের প্রথম মিলন। দুজনার দুজনকে ভাল লাগিল। গুরু শিষ্যের মিলন হইল। প্রমথনাথ মানুষ চিনিলেন। পুলিন দাসকে কলিকাতায় আহ্বান করিলেন। সেই বৎসরই শেষের দিকে প্রমথনাথ পুলিন দাসকে দীক্ষা দিলেন। লাঠির যাদুকর পূর্ব্ব বাঙ্গলার ভার লইলেন। আর পশ্চিমবাঙ্গলার ভার পড়িল সতীশচন্দ্র বসুর উপর। দুই সুযোগ্য সহযোগী অনুশীলন সমিতির সংগঠনে প্রমথনাথের দুই সুদৃঢ় স্তম্ভ তাহার দুই উদ্যতবাহু

স্বাধীনতা ভিক্ষালব্ধ বস্তু নয়। ছিনাইয়া আনিতে হয়। ছিনাইয়া আনিতে হইলে চাই আত্মবিশ্বাস ও আত্মশক্তি। সমগ্র জাতি যেদিন জাড্য পরিত্যাগ করিয়া শক্তিমান হইবে কর্ম্মে অণন্য লক্ষ্য হইবে, আদর্শে একনিষ্ঠ হইবে সেইদিন কোন সাম্রাজ্যশক্তির সাধ্য নাই সেই নববিকশিত নবজাগরিত জাতিকে পদানত রাখে।

সেই আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া জাতির মানসিকতায় চরিত্রে ও দেহে আদর্শ, অনুপ্রেরণা ও শক্তি সঞ্চারের সুমহান তপস্যায় অনুশীলন সমিতির প্রতিষ্ঠা করিলেন। সঙ্গে আসিলেন ইতিহাসের মহানায়কগণ।

আনন্দমঠের মন্ত্রদীক্ষিত সন্তানদল সন্ন্যাসী। বিবেকানন্দের মাতৃমন্ত্রে দীক্ষিত সন্ন্যাসীদল সংসারত্যাগী; প্রমথনাথ সংসার ও সমাজের সাধারণ মানুষকে দেশমাতৃকার চরণে আত্মবলিদানের মহোৎসবে শক্তি, সাহস ও স্বদেশপ্রীতির অভীঃমন্ত্রে দীক্ষিত করিবার ঐকান্তিক বাসনায় অনুশীলন সমিতির প্রতিষ্ঠা করিলেন। তাঁহার ব্যক্তিত্ব ও অদম্য উৎসাহে অনুপ্রাণিত করিয়া তুলিলেন। শহরে, নগরে, গ্রামে ঘরে ঘরে সেই বার্ত্তা পৌঁছাইয়া দিতে বদ্ধপরিকর হইলেন।

বিদ্যুৎপ্রবাহে সে বাণী বাঙ্গালীর প্রাণে শিহরণ তুলিল। সে দিনের বালক, কিশোর, যুবক শক্তির অনুশীলনে ব্রতী হইল। কুস্তির আখড়ায় কুচ্‌কাওয়াজের মাঠে, লাঠি খেলার আঙ্গিনায় যে প্রাণ-বন্যা জাগিল তাহাতে বাঙালীর মরা গাঙে আচম্বিতে এক স্বতঃস্ফূর্ত্ত প্লাবন আসিল।

রবীন্দ্রনাথ গাহিয়া উঠিলেন—

তোর মরা গাঙে বান এসেছে
জয় মা বলে ভাসা তরী।

রাখী বন্ধনের মধ্য দিয়া বাঙলায় নব-চেতনার সুচনা। শহরে

শহরে তো বটেই গ্রামে গ্রামে প্রায় প্রত্যহ সভা সমিতি অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল। অনুপ্রাণিত কিশোর যুবকের দল গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে স্বদেশী সঙ্গীত গাহিতে গাহিতে সভায় যোগ দান করিতে চলে। তরুণ ত্রৈলোক্যনাথও তখন উদ্বেলিত, নেতাদের দেখিতে ও তাঁহাদের বাণী শুনিতে দল বাঁধিয়া গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া বেড়ান, কণ্ঠে সমবেত স্বদেশী সঙ্গীত।

নগরে নগরে জ্বাল্‌রে আগুন,
হৃদয়ে হৃদয়ে প্রতিজ্ঞা দারুণ;
বিদেশী বাণিজ্যে কর্‌ পদাঘাত
মায়ের দুর্দ্দশা ঘুচারে ভাই।"

উদ্দীপ্ত কণ্ঠের সুরে সম্মিলিত প্রাণে শিহরণ জাগে। ছন্দোবদ্ধ ঐক্যতানে বাতাস আকুলিত হইয়া উঠে।

'এসেছে সে একদিন,
লক্ষ পরাণে শঙ্কা না জানে, না রাখে কাহারও ঋণ,
জীবনমৃত্যু পায়ের ভৃত্য চিত্ত ভাবনাহীন।'

বিদেশী পণ্য বর্জ্জন করিতে হইবে। কিশোর ও যুবকের দল আগাইয়া আসিল, বিলাতী পণ্যের দোকানে পিকেটিং সুরু হইল, পুলিশ লাঠি চালায়। বিদেশী বস্ত্র সম্ভার পোড়ান হয়, বিলাতী লবণ রাস্তায় ফেলিয়া দেওয়া হয়। ঘরে ঘরে চরকা চলে; গ্রামের তাঁতে মোটা কাপড় বোনা হয়। বিলাতী কাপড় ছাড়িয়া সবাই মোটা কাপড় অঙ্গে ধারণ করে। সকলের সঙ্গে ত্রৈল্যোক্যনাথও কর্ম্মযজ্ঞে মাতিয়া উঠিলেন।

সে সময় তরুণের মনে যে ভাবের সঞ্চার হইয়াছিল ত্রৈলোক্যনাথ পরবর্ত্তী জীবনে অতি সহজ ও সরল ভাবে তাহা প্রকাশ করিয়াছেন।

"স্বদেশী আন্দোলনের সময় যুবকদের মন স্বদেশিকতায় ভরপুর

ছিল, তখন কোন কৃত্রিমতা ছিল না, ছিল আন্তরিকতা। তখন সম্মুখে কোন প্রলোভন ছিল না, ত্যাগের আদর্শ ছিল বড়। আমার দেশকে বড় করিব, আমার দেশকে স্বাধীন করিব, আমি স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহার করিব, অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন করিব, সকলকে ভাইয়ের মত দেখিব, আমি বিলাসিতা বর্জ্জন করিব, চরিত্র পবিত্র রাখিব; এই মনোভাবই সকলের মধ্যে বিরাজমান ছিল।" সে দিনের তারুণ্য এই মানসিকতায় উদ্বুদ্ধ ছিল বলিয়াই পরবর্ত্তীকালে আত্মবলিদানে অকুণ্ঠ ও অমিতবীর্য্য হইতে পারিয়াছিল।

যে অত্যুগ্র উত্তেজনা বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকে উপলক্ষ্য করিয়া বিদেশী বর্জ্জন ও স্বদেশী গ্রহণ প্রভৃতি বিভিন্ন কার্য্যকলাপে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল তাহা নিরবচ্ছিন্ন স্বদেশী সঙ্গীত ও উদ্দীপ্ত কাব্যগাথায় হয়ত স্রোতশীল থাকিত না যদি না অনুশীলন সমিতির কর্ম্মকাণ্ড তাহাতে সংযোজিত হইত।

মুর্ত্তজা-শিষ্য খ্যাতিমান লাঠিয়াল পুলিন দাস ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের বীরাষ্টমী উৎসবের পর কলিকাতায় আসিয়া সর্বাধ্যক্ষ অনুশীলন সমিতির কুলপতি ব্যারিস্টার প্রমথ মিত্রের নিকট হইতে দীক্ষা লইয়া ঢাকায় ফিরিলেন। তাঁহাকে পূর্ববাঙলার সর্বাধিনায়ক মনোনীত করা হইল। ঢাকায় আসিয়া পুলিন দাস পূর্ববাঙলায় অনুশীলন সমিতির প্রতিষ্ঠা, প্রচার ও প্রসারে সর্বতোভাবে আত্মোৎসর্গ করিলেন। এই সময়েই ত্রৈলোক্যনাথ সাটিরপাড়া স্কুলে অধ্যয়ন-কালে অনুশীলন সমিতির সভ্য হইলেন।

অনুশীলন সমিতি তখন প্রকাশ্য সংগঠন। অনুশীলনের আদর্শ এমন একটী আদর্শ সমাজ যে সমাজে প্রত্যেকটী নরনারীর মনুষ্যত্বের পূর্ণ বিকাশ হইবে। অনুশীলনের চিন্তাধারায় মানুষের শারীরিক ও মানসিক বৃত্তিগুলির পরিপূর্ণ বিকাশই মনুষ্যত্ব, অনুশীলন-কল্পিত সমাজে প্রত্যেক মানুষ শুধু স্বাস্থ্যবান, কর্ম্মঠ, বলিষ্ঠ এবং দীর্ঘায়ু





রাসবিহারী বসু



পুলিন দাস



নরেন সেন



প্রতুল গাঙ্গুলী



রবীন্দ্রমোহন সেন



মহারাজ ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্ত্তী

হইবে না, প্রত্যেক নরনারী বিদ্বান, চরিত্রবান, সাহসী ও দয়ালু হইবে।

সাটিরপাড়া গ্রামের অনুশীলন সমিতির সম্পাদক নিযুক্ত হইয়া ত্রৈলোক্যনাথ সমিতির কাজে মনপ্রাণ সমর্পণ করিলেন। দিনে দিনে সভ্যসংখ্যা বাড়িতে লাগিল। প্রথম প্রথম সমিতির বোর্ডিং হইতে লোক আসিয়া ত্রৈলোক্যনাথকে যাহা কিছু শিক্ষণীয়, যাহা কিছু করণীয় তাহা শিখাইয়া ও বুঝাইয়া গেল—পরে ত্রৈলোক্যনাথ নিজেই অপরকে শিখাইতে সুরু করিলেন। সম্পাদকের কর্মসূচী অনুধাবন করিলে আমরা সম্পাদকের দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য সম্বন্ধে সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারি। তাই পুলিন দাসের নির্দ্দেশিত এই কর্ত্তব্যনামা লিপিবদ্ধ করিলাম।

"প্রত্যহ নিজে উপস্থিত থাকিয়া সভ্যগণের উপস্থিতি নির্ণয় করিতে হইবে। উপস্থিতি খাতাতে প্রত্যহ প্রত্যেক সভ্যকে তাহার নিজ নামের ঘর পূরণ করাইতে হইবে।

অনুপস্থিত সভ্যগণের অনুসন্ধান করিতে হইবে।

সভ্যগণের রোগাদি হইলে শুশ্রূষার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

সভ্যগণের অভাব অভিযোগ শ্রবণ করিয়া তাহার প্রতিবিধানের চেষ্টা করিতে হইবে।

সভ্যসংখ্যা বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা করিতে হইবে ও সমিতির বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রাদি অনুসন্ধান ও প্রতিবিধান করিতে হইবে।

নূতন কেহ ভর্ত্তি হইতে আসিলে তাহার সম্যক্ পরিচয় লইয়া এবং পূর্বে কোন সমিতিতে ভর্ত্তি হইয়াছিল কিনা তাহা সম্যক্ জানিয়া লইয়া সমিতির সমস্ত নিয়মে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করাইয়া তাহাকে সমিতির সভ্যশ্রেণীভুক্ত করিয়া তাহার পরিচয় বাসস্থান ইত্যাদি স্পষ্টাক্ষরে তাহার ভর্ত্তির খাতাতে লিখিতে হইবে। পরিচয় অর্থ— নাম, জন্মতারিখ, বয়স; ধর্ম, জাতি, পিতার নাম ও বৃত্তি;

অভিভাবকের নাম ও বৃত্তি; আখড়া, হাল সাকিনের সম্পূর্ণ ঠিকানা, বাড়ীর সম্পূর্ণ ঠিকানা, লেখাপড়া, বিদ্যা, বিদ্যালয়, শ্রেণী, বৃত্তি ইত্যাদি।

কোন সভ্য আখড়া পরিবর্ত্তন করিতে চাহিলে তাহার সম্বন্ধে বিশদ বিবরণ লিখিয়া প্রধান সম্পাদকের নিকট পাঠাইতে হইবে।

প্রত্যেক সভ্য সমিতির সকল নিয়ম প্রতিপালন করিতেছে কিনা তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিয়া সভ্যগণকে নিয়মপালনে সাহায্য ও বাধ্য করিতে হইবে। এই কার্য্য সমাধা করিবার নিমিত্ত অতি-বিশ্বাসী, কর্ম্মকুশল, সাহসী ও উৎসাহী সভ্যকে বাছিয়া লইয়া সম্পাদক সর্ব্বক্ষণের জন্য পার্শ্বচর নিযুক্ত করিবে।

কোন সভ্যকে গুরুতর শাস্তি দিতে হইলে প্রধান সম্পাদককে জানাইতে হইবে। মিষ্ট কথা, উপদেশ, ভৎর্সনা, অভিভাবকের সাহায্য প্রভৃতিতে কাজ না হইলে ভয় প্রদর্শন এবং অবশেষে শারীরিক শাস্তি দ্বারা সংশোধন করিতে হইবে। তাহাতেও না হইলে তবে সম্পাদককে জানাইতে হইবে।

প্রত্যেক রবিবার সমিতির সমস্ত সভ্যগণকে নির্দ্দিষ্ট স্থানে মিলিতে হইবে।

স্বার্থত্যাগে ও স্বদেশপ্রেমে সভ্যগণকে উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করিতে হইবে।

প্রত্যহ প্রত্যেক সভ্যের কার্য্য নিরূপিত করিতে হইবে। লাঠি, নৌকা, গুলাইল, অশ্ব, কুস্তিখানা ও অন্যান্য যন্ত্রাদির সুব্যবস্থা করিতে হইবে। সমিতির লাঠি কিম্বা অন্যান্য জিনিসপত্রাদি রাখিবার জন্য তালাবদ্ধ ঘর অথবা বাক্সের বন্দোবস্ত করিতে হইবে। কোন দ্রব্য যেন অসাবধনতা হেতু নষ্ট না যায় বা চুরি না হয়।

প্রয়োজনে বিভিন্ন খেলার জন্য বিভিন্ন দিন স্থির করিতে হইবে। ড্রিল, দৌড়-ঝাঁপ ও দড়ি বাহিয়া উঠা-নামা, সাঁতার, অশ্ব ও নৌকা

চালনা এবং রৌদ্র বৃষ্টি, শীত-গ্রীষ্ম সহ্য করা এবং উপবাস করা শিক্ষা করিতে হইবে।

প্রত্যেক সভ্যকে ব্যায়াম-কৌশলাদিতে, স্বভাব-চরিত্রে এবং লেখাপড়াতে উন্নতি ও অবনতির বিষয়ে প্রত্যেক সপ্তাহে শিক্ষা-প্রণালীর ধরণ লিখিবার খাতাতে লিখাইয়া রাখিতে হইবে।

প্রত্যেক আখড়ার সভ্যগণকে দশদশটি করিয়া একটি স্বতন্ত্র দলে বিভক্ত কয়িয়া প্রত্যেক দলের শিক্ষাদায়ক ও নেতা নিযুক্ত করিয়া দিতে হইবে এবং বিভিন্ন দলের চালকগণের নিকট এক এক প্রস্থ "সম্পাদকের কর্ত্তব্য" ও উভয় স্তরের প্রতিজ্ঞাপত্রের নকল, অন্যান্য নিয়মাদি বড় বড় অক্ষরে লিখিয়া শক্ত কাগজ-কিম্বা কাঠি লাগাইয়া প্রত্যহ খেলার প্রাঙ্গণে ঝুলাইয়া রাখিতে হইবে ও প্রত্যহ তৎপ্রতি প্রত্যেক সভ্যের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে হইবে।

ছোট ছোট দলের নেতারা তাহাদের নিজ নিজ দলের শিক্ষা ও উপস্থিতির জন্য দায়ী থাকিবে এবং সভ্যগণকে সমিতির অধীন থাকিতে বাধ্য করিবে ও প্রতিজ্ঞাপত্রের একটি নকল সহিত শিক্ষা-প্রণালীর ধরণ লিখিবার একখানা খাতা সর্ব্বদা সঙ্গে রাখিতে প্রত্যেককে বাধ্য করিবে। সভ্যগণ যে দিন যে শিক্ষা পাইবে সেই দিনই ঐ খাতাতে লিখিয়া রাখিবে।

প্রত্যেক প্রধান শিক্ষাদায়কগণ সমস্ত ক্ষুদ্র দলের শিক্ষার তত্ত্বাবধান করিবে এবং ক্ষুদ্র দলের নেতা ও শিক্ষাদায়কগণকে শিক্ষা দিবে। যাহারা শুধু আদ্যস্তরের প্রতিজ্ঞাগুলি করিয়াছে তাহাদের বড় লাঠির রঙ্গের বাড়ি পর্য্যন্ত, ছোট লাঠির শ্যামঘাট পর্য্যন্ত ও ছুরি-খেলার প্রথম পাঠ পর্য্যন্ত শিক্ষা দেওয়া চলিবে, ইহার বেশী কিছু শেখান হইবে না।

"আমি এই সমিতি হইতে কখনও বিচ্ছিন্ন হইব না, আমি আমার চরিত্র সর্ব্বদা নির্ম্মল ও পবিত্র রাখিব ; আমি সকল সময়ই-

সমিতির বিধি-নিষেধ মানিয়া চলিব; আমি সমিতির কর্ত্তৃপক্ষের আদেশ বিনাবাক্যব্যয়ে প্রতিপালন করিব। আমি আমার নেতার নিকট কোন বিষয় গোপন করিব না এবং মিথ্যা বলিব না” ইহাই আদ্য প্রতিজ্ঞা।

যে সব সভ্যদিগকে কর্ম্মঠ, চরিত্রবান্, সাহসী ও দেশপ্রেমিক বলিয়া মনে হইবে তাহাদের আদ্য প্রতিজ্ঞা করান হইবে। অনুধাবনের পর ইহাদের মধ্যে আবার যাহাদের পরিপূর্ণরূপে উপযুক্ত বলিয়া প্রতীতি জন্মিবে তাহাদিগকে দ্বিতীয় প্রতিজ্ঞা করান হইবে। যাহারা উভয় স্তরের প্রতিজ্ঞাগুলি সম্পূর্ণ করিয়াছে তাহাদিগকে সব কিছু শিক্ষা দেওয়া চলিবে।

দ্বিতীয় স্তরের প্রতিজ্ঞাটি এইরূপ—“আমি সমিতির আভ্যন্তরীণ বিষয় সম্পর্কে অযথা আলোচনা বা কাহারও নিকট প্রকাশ করিব না। আমি পরিচালকের নির্দ্দেশ ব্যতীত এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যাইব না। যদি কোন সময়ে সমিতির বিরুদ্ধে কোন প্রকার ষড়যন্ত্রের বিষয় জ্ঞাত হই তাহা হইলে অবিলম্বে পরিচালককে জানাইব এবং তাহার প্রতিকারের চেষ্টা করিব। আমি যে কোন অবস্থায় যে কোন সময়ে পরিচালকের নির্দ্দেশ পালন করিব।”

যাহাদের বয়স বার বৎসরের কম, প্রতিজ্ঞার মানে বুঝিতে অক্ষম তাহাদের সমিতির বহিরঙ্গ বলিয়া অভিহিত করিতে হইবে। তাহাদের প্রতিজ্ঞা শুনাইয়া তাহা পালনে বাধ্য করিতে হইবে। বহিরঙ্গের সভ্যগণকে ডাম্বল, বুকডন্, কুস্তি, বৈঠথিরি বেনিঠি শিক্ষা দেওয়া হইবে এবং দুই হাতে কিম্বা এক হাতে লাঠি লইয়া স্বাধীনভাবে ও নির্ভীক চিত্তে দ্বন্দ্বযুদ্ধ শিক্ষা দিতে হইবে।

প্রত্যেক পাড়াতে মুষ্টি ভিক্ষা তুলিবার সুব্যবস্থা করিতে হইবে এবং সমিতির শুভাকাঙ্ক্ষী ধনী ব্যক্তিগণের নিকট হইতে অর্থ-সাহায্য লাভের চেষ্টা করিতে হইবে। যে সমস্ত সভ্যগণ প্রয়োজনীয়

চাঁদা দিতে পারিবে না তাহাদিগকে অধিক পরিমাণে চাউল আনিয়া দিতে কিম্বা কোনরূপ কার্য্য সমাধা করিয়া দিতে হইবে। সৎস্বভাবসম্পন্ন ও কর্ম্মনিষ্ঠ গরীব সভ্যগণের চাঁদা মাফ হইতে পারে।

সমিতির জমা-খরচের হিসাব প্রত্যেক সপ্তাহে প্রধান সম্পাদক কর্ত্তৃক প্রেরিত পরিদর্শককে দেখাইতে হইবে যে আদায়ীকৃত অর্থ সমিতির ব্যয় ব্যতীত অন্য কোনভাবে প্রধান সম্পাদকের বিনা অনুমতিতে খরচ করা হয় নাই। মাসান্তে গচ্ছিত অর্থের অর্দ্ধেক পরের মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে প্রধানকেন্দ্রে সম্পাদকের কাছে পাঠাইতে হইবে।

উপযুক্ত সভ্যদের সহকারী করিয়া এক এক জনের উপর এক একটি ভার অর্পিত হইবে। সম্পাদকের স্থান পরিবর্ত্তন করিতে হইলে বিশিষ্ট সভ্যকে তাহার ভার দিয়া যাইতে হইবে। কোন সমিতি কোন কারণে কোন সময়ে সম্পাদকবিহীন থাকিবে না।

সমিতির যে কোন পরিবর্ত্তন তৎক্ষণাৎ প্রধান সম্পাদকের গোচরে আনিতে হইবে।"

উল্লিখিত বিবরণী হইতে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে বাঙলার তরুণকে সেদিন সুসংহত সংগঠনের মধ্য দিয়া যে মানসিক প্রসারতা, কায়িক পটুতা ও চারিত্রিক দৃঢ়তা দিবার প্রয়াস সুরু হইয়াছিল তাহাই জাতিকে সৈনিকের শৃঙ্খলা, শক্তি, সাহস ও সংগ্রামী চেতনায় উদ্বুদ্ধ করিবার সুনির্দ্দিষ্ট ও সুপরিকল্পিত প্রয়াস।

বিভিন্ন যুগ বিভিন্ন ভাবের দ্যোতক। বর্ত্তমান যুগ গণকেন্দ্রিক তাই বহুকে সুসংগত করিতে সংগঠনই শক্তি। আমাদের দেশেরই কথা সঙ্ঘশক্তি কলৌযুগে। তাই শক্তিশালী সঙ্ঘশক্তির তিনটি মূলকথা—

সঙ্ঘগুরু, সঙ্ঘ ও সঙ্ঘাদর্শ। বৌদ্ধযুগের প্রণাম ও প্রতিজ্ঞা . .

"বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি
সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি
ধম্মং শরণং গচ্ছামি।"

সেই বুদ্ধ-যুগ হইতে আজ পর্য্যন্ত বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন মতাদর্শে যখনই সংগঠন গড়িয়া উঠিয়াছে তখনই সেই একই কথা বিভিন্ন শব্দে বিভিন্ন প্রকাশভঙ্গীতে উচ্চারিত হইয়াছে যাহার নির্গলিতার্থ—নেতাকে মানিব, দলকে মানিব, মতবাদকে মানিব।

ত্রৈলোক্যনাথ জীবনব্যাপী তাঁহার কর্ম্মপ্রেরণায় এই মন্ত্রেরই সাধনা করিয়া গিয়াছেন।



সাটিরপাড়া সমিতির সম্পাদক ত্রৈলোক্যনাথ উচ্চশ্রেণীর ছাত্র বরদাকান্ত দেবকে সহকারী লইয়া সমিতির প্রচার ও প্রসারে সচেষ্ট হইলেন। উভয়ের অনুপ্রেরণায় সমিতির সভ্যসংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের পটভূমিকায় তখন ক্ষেত্র প্রস্তুত, তাই সমিতির আদর্শ দেশের মানসিক উদ্বেলতার আনুকূল্যে অগ্নির মত গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে বিস্তৃত হইয়া পড়িল। ত্রৈলোক্যনাথ গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া বেড়ান, সমিতির পর সমিতি প্রতিষ্ঠা করিয়া চলেন।

আদি সংগঠন গ্রাম্য সমিতি; তাহার পর পরগণা সমিতি; পরগণা সমিতিগুলির তত্ত্বাবধান করে জিলাসমিতি এবং জিলা-সমিতিগুলি চালিত হয় ঢাকার প্রধান কেন্দ্র দ্বারা। তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্র ত্রৈলোক্যনাথ তখন মহেশ্বরদি পরগণার অধিনায়ক—তাঁহার অধীনে প্রায় পঞ্চাশটি গ্রাম্য সমিতি। সেই সব গ্রাম্য সমিতির সম্পাদক কেহ বা উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের শিক্ষক, মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক, প্রধান পণ্ডিত, কেহ আইন পাশ, কেহ বি. এ. পাশ, কেহ পোস্ট-মাস্টার কেহ তালুকদার। সকলেই প্রায় বিদ্যায় ও বয়সে ত্রৈলোক্যনাথের বড়। তবু সবাই একনিষ্ঠ ভাবে তরুণ কিশোরের নির্দ্দেশ পালন করেন, কারণ দলনেতাকে অকুণ্ঠচিত্তে অনুসরণ করাই নির্দ্দেশ। তাই ত্রৈলোক্যনাথ তাঁহার আত্মজীবনীতে বলিতেছেন—

"স্বদেশী যুগে লোকের মনে আজিকার মত নেতৃত্বস্পৃহা ছিল না—স্পৃহা ছিল দেশের সেবা করিবার আর তখনকার দিনে দলাদলি ছিল না, দলাদলির স্থানে ছিল সহযোগিতা।"

সমিতির সভ্যেরা তাঁহার অধিনায়কত্বে জনসেবায় আত্মনিয়োগ করিল। চৈত্র সংক্রান্তিতে সাটিরপাড়ার নিকটে মেলা বসিয়াছে। তাঁহারা জলসত্র খুলিলেন। সভ্যরা দলে দলে কলসী করিয়া জল আনিতেছে, জল আনিয়া মেলা-প্রাঙ্গণে জালা ভরিতেছেন, ভ্রাম্যমাণ তৃষ্ণার্ত্ত জনসাধারণের মধ্যে জল বিতরণ করিতেছেন। সুনিয়ন্ত্রিত-রূপে কাজ চলিতেছে। তখনও বাঙলার গ্রাম্যজীবনে ছুৎমার্গ প্রবলরূপে বিদ্যমান। রাস্তা দিয়া জল আনিবার সময় তরুণেরা হুঁসিয়ার দিয়া চলিতেছেন পাছে স্পর্শদুষ্ট না হয়। তাহা হইলে গ্রাম্য মানুষ সে জল পান করিবে না, সমস্ত প্রয়াসই ব্যর্থ হইবে। থানার দারোগাও সেই পথে টহল দিয়া ফিরিতেছেন—তাঁহার উদ্ধত চেতনায় আঘাত লাগিল, ভাবিলেন 'তফাৎ যাও তফাৎ যাও বলিয়া

তাঁহাকেই অপমান করিতেছে। রক্ত-চক্ষু দারোগাবাবু সমিতির সভ্য ভুলুকে শাসাইয়া গেলেন। কানে কানে একথা বহু কান হইল। ঘটনা পল্লবায়িত হইয়া চলে। জমিদারের পাইকেরা লাঠি ঘুরাইয়া তরুণদের শাসাইতে সুরু করে। বহুজনে 'ছেলে মানুষ ভয় পাইয়াছে' বলিয়া মন্তব্য পর্য্যন্ত করিলেন।

ত্রৈলোক্যনাথ বিভিন্ন গ্রাম্য সমিতি হইতে পরের দিন তিন শত লাঠিধারী স্বেচ্ছাসেবক আনাইলেন! তাহারা মেলা-প্রাঙ্গণে কুচ্‌কাওয়াজ করিতে লাগিল। অধিনায়ক ত্রৈলোক্যনাথের দ্ব্যর্থহীন নির্দ্দেশ—দারোগা আসিলে পিটাইবে। যদিও বহু চৌকিদার সেখানে জড় হইয়াছিল কিন্তু দারোগাবাবু না আসাতে কোন সংঘর্ষ ঘটিল না। যে কোন কারণে হোক্‌ দারোগাবাবু মেলা-প্রাঙ্গণ হইতে দূরে রহিলেন। চতুস্পার্শ্বের গ্রামের লোক তরুণ ত্রৈলোক্যনাথের মধ্যে চারিত্রিক দৃঢ়তা ও শক্তির সন্ধান পাইল। ছোট এই ঘটনাটি বিধৃত করিল তরুণটি কোন ধাতুতে গড়া।

লাঠি খেলা প্রত্যেক সভ্যের অবশ্য শিক্ষণীয়, তাই লাঠির পারদর্শিতা পরীক্ষার জন্য কৃত্রিম যুদ্ধের অভিনয় হইত। দুই দলের মধ্যে দ্বন্দ্বযুদ্ধ সংঘটিত হইত। পূর্ব্ববাঙলার সর্ব্বাধিনায়ক পুলিন দাসের কথায়—"এক পক্ষের উষ্ণীষ লাল বর্ণের, অপর পক্ষের সবুজ অথবা নীল বর্ণের থাকিত। তাহাদের ব্যবহার্য্য লাঠিগুলিও যথাক্রমে তরল লাল এবং নীল বর্ণে সিক্ত থাকিত। বিভিন্ন উপাদানসমূহ তৈলে গুলিয়া লাঠিতে লাগান হইত এবং অতিরিক্ত ভাবে বড় লাঠির মাথায় ন্যাকড়ার পুঁটুলি বাঁধিয়া উহা রঙের মাঝে ডুবান হইত। বড় লাঠির দ্বারা সড়কির মত বিপক্ষ দলকে খোঁচা মারা হইত। শরীরের বিভিন্ন স্থানে বিপক্ষ দলের রঙ লাগিলেই সেই ব্যক্তি মৃত অথবা আহত বলিয়া গণ্য হইত। একদল বিচারক থাকিত তাহারাই 'কে মৃত বা কে আহত' বলিয়া নির্দ্দেশ করিত।

ত্রৈলোক্যনাথ এই যুদ্ধ যুদ্ধ খেলার বিষয় লিখিতেছেন। "এই কৃত্রিম যুদ্ধের খেলা একটা দেখিবার বিষয় ছিল। সহরের বহুলোক উহা দেখিতে যাইতেন। জেলাশাসক, হাকিম, পুলিশ সাহেবেরাও যাইতেন। তাঁহারা তামাসা দেখিতে যাইতেন কি আন্দোলনের গতি-প্রকৃতি লক্ষ্য করিতে যাইতেন তাহা তাঁহারাই জানেন। কৃত্রিম যুদ্ধে সমিতির পাঁচ সাত হাজার সভ্য সমবেত হইয়া ছোট লাঠি, বড় লাঠি, ছোরা প্রভৃতি লইয়া যুদ্ধ করিত। দুই দিকে দুই প্রকাণ্ড বৃক্ষের উপর বড় বাঁশ বাঁধিয়া তাহাতে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হইত। যে দল যুদ্ধ করিয়া বিপক্ষদলের ঐ জাতীয় পতাকা কাড়িয়া লইতে পারিত ও প্রধান সেনাপতিকে গ্রেপ্তার করিতে পারিত সেই দলই জয়লাভ করিত। বহু লোক এই যুদ্ধে আহত হইত। এইজন্য পূর্ব্ব হইতেই হাসপাতাল ও ডাক্তারের ব্যবস্থা থাকিত।"

সেই কালে ব্রিটিশ সৈন্যের কৃত্রিম যুদ্ধ একটি বাৎসরিক মহড়া ছিল। কিন্তু সাধারণ মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত বাঙালীর সমাজের কিশোর ও যুবকের দল যে নিষ্ঠার সহিত বিপুল ভাবে এই ক্রীড়ার সংগঠন ও পরিচালন করিতেন তাহা স্মরণ করিলে বিস্ময়াভিভূত না হইয়া পারা যায় না। সেদিনের বাঙালী সমাজ তাই সমিতিকে শুধু ভালবাসে নাই, শ্রদ্ধা করিত। সৎ, একাগ্রচিত্ত, সাহসী, পরোপকারী তরুণ দেখিলে ধরিয়া লইত সে নিশ্চয়ই সমিতির সভ্য। কৃত্রিম যুদ্ধের খবর পাইলেই দলে দলে অকুস্থলে উপস্থিত হইত— বিস্ময়ে, গর্ব্বে ও উত্তেজনায়।

ত্রৈলোক্যনাথ এই যুদ্ধ উপলক্ষে একদিনের ঘটনা বিবৃত করিয়াছেন—"যে আহত বলিয়া গণ্য হইত তাহাকে বসিয়া থাকিতে হইত। কেহ তাহাকে প্রহার করিতে পারিত না এবং অ্যাম্বুল্যান্স আসিয়া তাহাকে হাসপাতালে লইয়া যাইত। এই কৃত্রিম যুদ্ধে

আমি আহত হইয়াছি, অর্থাৎ বিপক্ষের লাঠির আঘাতে আমার জামায় রং এবং দাগ লাগিয়াছে। আমার সেদিকে লক্ষ্য ছিল না। আমি মারামারি করিয়া যাইতেছি এমন সময় একজন পরিদর্শক সেই দিক দিয়া যাইতেছিলেন; তিনি আমার ঘাড় ধরিয়া বসাইয়া দিলেন। এদিকে অপর রাস্তা দিয়া বিপক্ষের একটি দল আসিয়া আমাদের দলের উপর সঙ্গীন চালনা করিল। চারিদিকে চাহিয়া যখন দেখিলাম পরিদর্শক চলিয়া গিয়াছে—একখানা বড় লাঠি লইয়া আমি বিপক্ষ দলকে বাধা দিলাম। পরে দূর হইতে তাহারা আমাদের দলের উপর বড় লাঠি নিক্ষেপ করিতে লাগিল, আমরাও পাল্টা জবাব দিতে লাগিলাম। হঠাৎ বিপক্ষের একটি বড় লাঠি আসিয়া আমার কপালে পড়িল। তাহা ফিরাইতে না পারায় কপাল বহিয়া রক্ত পড়িতে লাগিল। এমন সময় অ্যাম্বুল্যান্স আসিয়া আমাকে উঠাইল এবং একখানা গাড়ীতে করিয়া হাসপাতালে লইয়া গেল। সেই রাত্রেই হাসপাতালে থাকিয়া সংবাদ পাইলাম আমাদের অর্থাৎ মফঃস্বলের জয় হইয়াছে।"

ভবিষ্যতের চির-বিপ্লবী ত্রৈলোক্যনাথের ইহাই পূর্ব্বাভাষ।

ইংরাজ সরকার যদিও বাহ্যিকভাবে চুপ করিয়া আছে, সমিতির কার্য্যকলাপে প্রত্যক্ষভাবে হস্তক্ষেপ করিতেছে না তবুও তাহারা স্থিরনিশ্চয় হইয়াছে—জাতি জাগিতেছে, নিজেকে প্রস্তুত করিতেছে। চিরাচরিত সর্ব্বনাশা বুদ্ধিতে তাহারা পূর্ব্ববঙ্গের নিরক্ষর ধর্ম্মপ্রাণ মুসলমান জনসমাজকে হস্তগত করিবার চেষ্টা করিল; হিন্দুরা রাজত্ব লইলে তাহাদের সর্ব্বনাশ হইবে। হিন্দু-বিদ্বেষ পরোক্ষে চতুরতার সহিত জাগাইয়া তুলিল। স্বার্থান্বেষী দুষ্টচক্র অর্থের লোভে নিরীহ সরল মুসলমান গ্রামবাসীকে বিভ্রান্ত করিল, উত্তপ্ত করিতে লাগিল ও ফলে দিন দিন বাঙলার সামাজিক পরিবেশকে বিষাক্ত করিয়া তুলিতে লাগিল।

সমিতির সভ্যেরা আজ সঙ্ঘবদ্ধ, শক্তিমান, তাই বাধাও আসিল। এমনি সময়ের একটি ছোট ঘটনা।

সাটিরপাড়ার নিকটে চিনিশপুর কালীবাড়ী প্রসিদ্ধ পীঠস্থান। বৈশাখ মাসের অমাবস্যা তিথিতে সেখানে মহাধূমধামে পূজা, বলিদানাদি হয়। হাজার হাজার যাত্রী আসে ; চার পাঁচ শ ছাগ ও পাঁচ সাতটা মহিষ বলি হয়। হঠাৎ গুজব রটিল—পরিবেশ ও সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে সবাই বিশ্বাসও করিল মন্দির আক্রান্ত হইবে কিন্তু পূজার দিন কোন অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটিল না।

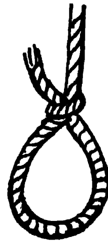
ত্রৈলোক্যনাথ মফঃস্বল সমিতির সম্পাদকদের খবর পাঠাইলেন—নির্দ্দেশ দিলেন সবাইকে লাঠিসহ উপস্থিত হইতে হইবে। প্রায় পাঁচ শত স্বেচ্ছাসেবক উপস্থিত হইল। তাহারা কুচ্‌কাওয়াজ করিল, যাত্রীদের তত্ত্বাবধান করিল, সারাদিন অপেক্ষা করিল - কোন দুর্ঘটনা ঘটিল না। পূজা ও বলিদানাদি নির্ব্বিঘ্নে সমাধা হইলে যাত্রীর দল আপন আপন গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিল।

দুষ্টচক্র বুঝিল প্রতিপক্ষ ভীরু ক্রন্দনপরায়ণ নহে—দুষ্টের দমন করিতে শিখিয়াছে।

তাহারা কবির সাথে একসাথে কণ্ঠ মিলাইয়াছে

"অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে—
তব ঘৃণা তারে যেন তৃণ সম দহে।"

ত্রৈলোক্যনাথ ইস্পাতকঠিন মনোবলে আগাইয়া চলেন।



সাহসী, সৎ, আদর্শনিষ্ঠ ও কর্ম্মপ্রেরণায় একাগ্রচিত্ত, দেখিয়া কেন্দ্রপতি পুলিন দাস ত্রৈলোক্যনাথকে দীক্ষা দানের মনস্থ করিলেন। দীক্ষিত কর্মী সর্ব্বত্যাগী আজীবনের বিপ্লবী। সন্ন্যাসী না হইয়াও তাহাকে সংসারের মায়াপাশ কাটাইতে হইবে। যখন যে নির্দ্দেশ আসিবে বিনা বিচারে বিনা প্রশ্নে অকুণ্ঠিত চিত্তে তাহা পালন করিতে হইবে। যখন যেখানে প্রয়োজন সেইখানে উপস্থিত হইতে হইবে; যে কর্ম্ম ও দায়িত্ব গ্রহণের আদেশ হইবে সেই দায়িত্ব ও কর্ম্ম সৈনিকের মানসিকতায় সম্পন্ন করিতে হইবে। "There is no question why but to do and die."

মাতৃমন্ত্রে দীক্ষিত সভ্য দেশমাতৃকার বেদীতে সমর্পিতপ্রাণ, উৎসর্গীকৃত জীবনাদর্শ।

তাই তাহাকে নূতন করিয়া প্রতিজ্ঞা করিতে হয়—"আমি সমিতির উদ্দেশ্য সিদ্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত ইহার বেষ্টনী পরিত্যাগ করিয়া যাইব না। আমি পিতামাতা, ভ্রাতাভগিনীর স্নেহ, গৃহের মোহ সমস্ত ত্যাগ করিব।

"আমার জীবন ও ঐহিকের সমস্ত সম্পদের বিনিময়ে আমি সমিতির প্রসারের কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিব। সমিতির কোন গোপন বিষয় লইয়া কাহারও সহিত আলোচনা করিব না অথবা আমার বন্ধু বা আত্মীয়ের নিকট প্রকাশ করিব না। ইহা ছাড়া কোন বিষয়ে সমিতির কোন সভ্যের নিকট কোন প্রকার অযথা প্রশ্ন করিব না।"

এই প্রতিজ্ঞা সাধারণতঃ দেবীমূর্ত্তির সম্মুখে করিতে হইত। অনুশীলন-সংগঠনাচার্য্য প্রমথনাথ পুলিন দাসকে যে প্রথায় ও যে পরিবেশে দীক্ষা দান করিয়াছিলেন পুলিনবাবুও সেই প্রথায় ও সেই পরিবেশে ত্রৈলোক্যনাথকে দীক্ষিত করিলেন।

দীক্ষার পূর্ব্বদিন ত্রৈলোক্যনাথ একবেলা হবিষ্যান্ন গ্রহণ করিয়া সংযম পালন করিলেন। পরের দিন প্রাতে স্নানান্তে ঢাকাস্থ রমনার কালীবাড়ীতে উপস্থিত হইলেন।

দেবীর প্রকোষ্ঠ প্রদীপ্ত দীপ-শিখায় উদ্ভাসিত ; ধূপ ও ধূনার গন্ধে আমোদিত। মায়ের গলায় সদ্য প্রস্ফুটিত রক্তজবার মালা। আচার্য পট্টবস্ত্রে ও উত্তরীয়ে সজ্জিত। দীক্ষার্থী-ও পট্টবস্ত্র পরিহিত। ললাটে, বক্ষে ও বাহুযুগলে রক্তচন্দনের ত্রিধারা।

পুলিন দাস আচার্য্যরূপে দেবীর সম্মুখে যজ্ঞাগ্নিতে আহুতি দিতেছেন। ছান্দোগ্যোপনিষদ্ হইতে মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া যজ্ঞ সমাপন করিলেন। গুরুপরম্পরায় প্রাপ্ত মন্ত্রটি সুর-লয়ে যখন পুলিনবাবু উচ্চারণ করিতেছিলেন তখন সেই স্নিগ্ধ ভাবগম্ভীর মন্ত্র-মন্দ্রিত পরিবেশ ত্রৈলোক্যনাথের প্রাণে এক নূতন উদ্দীপনার সঞ্চার করিল।

"লোকদ্বারমপাবার্ণু পশ্যেম ত্বা বয়ং রাজ্যায়ো আ
লোকদ্বারমপাবার্ণু পশ্যেম ত্বা বয়ং স্বরাজ্যায়ো আ
লোকদ্বারমপাবার্ণু পশ্যেম ত্বা বয়ং বৈরাজ্যায়ো আ
লোকদ্বারমপাবার্ণু পশ্যেম ত্বা বয়ং সাম্রাজ্যায়ো আ"

"হে অগ্নিদেব, তুমি লোক অর্থাৎ পৃথিবীর দ্বার উদ্ঘাটিত কর। আমরা রাজ্যলাভের জন্য যেন তোমাকে দেখিতে পাই।

"হে অগ্নিদেব, তুমি লোক অর্থাৎ পৃথিবীর দ্বার উদ্ঘাটিত কর। আমরা যেন বিরাট পুরুষের সর্ব্বাত্মরূপ অধিকারে সমর্থ হই।

"হে অগ্নিদেব, তুমি লোক অর্থাৎ পৃথিবীর দ্বার উদ্ঘাটিত কর। আমরা যেন সর্ব্বরূপে স্বাধীন ও নিরাতঙ্ক হইয়া সর্ব্বরূপে সুখ-শান্তিময় সত্তায় আধিপত্য লাভ করিতে পারি।

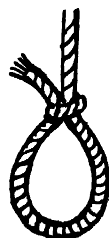
"হে অগ্নিদেব, তুমি লোক অর্থাৎ পৃথিবীর দ্বার উদ্ঘাটিত কর। আমরা যেন সর্ব্ববিষয়ে সার্ব্বিকরূপে পরিপূর্ণ হইয়া অসীম বিশ্বব্যাপী

সত্তায় উপনীত হই। রাজ্য, স্বরাজ্য, বৈরাজ্য ও সাম্রাজ্যের অধিকারী হই।

যজ্ঞ সমাপ্ত হইলে ত্রৈলোক্যনাথ বামহাঁটু গাড়িয়া শিকরাক্রমণোদ্যত সিংহের প্রতীক অলীঢ়াসনে দেবীর সম্মুখে বসিলেন। আচার্য্য তাঁহার শিরোপরি গীতাস্থাপন করিলেন। হস্তধৃত অসি গীতার উপর স্থাপন করিয়া দক্ষিণ পার্শ্বে আচার্য্য দাঁড়াইয়া রহিলেন। আর পূত যজ্ঞাগ্নি সম্মুখে ত্রৈলোক্যনাথ অলীঢ়াসনে মাথায় গীতা ও অসি লইয়া দুই হস্তে প্রতিজ্ঞাপত্র ধারণ করিয়া পাঠ করিতে লাগিলেন—"ভগবান, অগ্নি, মাতৃভূমি, গুরু ও নেতাকে সম্মুখে রাখিয়া আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে যথাসর্ব্বস্ব উপেক্ষা করিয়াও সমিতির উন্নতির জন্য সমস্ত আদেশ প্রতিপালন করিব। কাহারও নিকট কিছু প্রকাশ করিব না এবং সমিতির যাহারা বিরুদ্ধাচরণ করিবে তাহাদের যথোচিত শাস্তির ব্যবস্থা করিব। যদি এই প্রতিজ্ঞা পালনে বিমুখ হই তাহা হইলে ব্রাহ্মণগণের (স্বার্থ বিবর্জ্জিত মনীষীদের), মাতৃভূমির ও সর্ব্বদেশের দেশভক্ত মহাপুরুষদের অভিসম্পাত আমাকে অচিরে ধ্বংস করিবে।"

প্রতিজ্ঞান্তে দীক্ষিত মানব অগ্নি ও আচার্য্যকে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিলেন। আচার্য্য শিষ্যকে দুধ, ঘি ও চিনি মিশ্রিত এক গ্লাস সরবৎ দিলেন। ত্রৈলোক্যনাথ পান করিলেন। ঐ বৎসরই ত্রৈলোক্যনাথের সহিত বিদ্যালয়ের সম্পর্কচ্ছেদ ঘটিল। সেটা ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দ।

কর্ম্ম ও চেতনায় ত্রৈলোক্যনাথ দীক্ষান্ত প্রতিজ্ঞা অনুসরণ করিলেন।



অর্থ! অর্থ!! অর্থ!!! অর্থ চাই। সংগঠনকে বাঁচাইতে, সংগঠনকে চালাইতে অর্থ চাই। কোন সংগঠনের সূতিকা-গৃহে মুষ্টি ভিক্ষায় হয়ত চলিয়া যায়; শৈশবাবস্থায় সহানুভূতিশীল সমমর্ম্মী হৃদয়বান্‌দের সাময়িক অর্থানুকূল্যে হয়ত কোন প্রকারে শিশুও টলিতে টলিতে চলিতে শিখে, কিন্তু সংগঠনের বাল্যাবস্থায় প্রয়োজন নিয়মিত নিরবিচ্ছন্ন অর্থপ্রবাহ আর কৈশোর ও যৌবনের তো কথাই নাই। সংগঠনের যত পুষ্টি ও প্রসার হইতে থাকে অর্থেরও তত প্রয়োজন হয়। তাই অনুশীলন সমিতির জন্মলগ্নে কর্মীর দল নিজেদের প্রাপ্ত অর্থের বহুলাংশ কৃচ্ছ্রসাধন করিয়া বাঁচাইতে লাগিল। ত্রৈলোক্য-নাথের নিজের কথায়—

"নানা ভাবে অর্থসমস্যার সমাধান হইত। আমার খরচের জন্য বাড়ী হইতে যে টাকা পাঠাইত তাহা সব খরচ হইত না। অবশিষ্ট যাহা থাকিত সমিতির কাজে তাহা ব্যয় করিতাম। আমার দুধ ও জল খাবারের টাকা বাঁচিয়া যাইত। সময় সময় বাড়ী হইতে ঘি, কাপড়, জামা, বই প্রভৃতির নাম করিয়াও টাকা আনাইয়া সমিতির কাজে ব্যয় করিয়াছি ·········

"আমরা সাটিরপাড়াতেও মুষ্টি ভিক্ষা প্রচলন করিয়াছিলাম—সপ্তাহে দুই মন চাউল পাইতাম। এই চাউল বিক্রীর টাকা সমিতির তহবিলে জমা হইত।"

এইরূপে অর্থ সংগ্রহ করিয়া যখন আয় ও ব্যয়ের সমতা রাখা সম্ভবপর হইতেছিল না, তখন ত্রৈলোক্যনাথ আর এক নূতন পন্থা আবিষ্কার করিলেন।

"শ্রাদ্ধের বৃষ ও বৎসতরী গোয়ালা ও বৈদিক ব্রাহ্মণে লইয়া যায়। যেখানেই শ্রাদ্ধ হইত সেখানেই আমরা বৃষ ও বৎসতরী লইয়া আসিতাম। উহা বিক্রয় করিয়া প্রাপ্ত টাকা সমিতির তহবিলে জমা দিতাম। শ্রাদ্ধ বাড়ীতে আমরা নিমন্ত্রণও খাইতাম

ও দক্ষিণাও লইতাম। দক্ষিণার পয়সা সমিতির প্রাপ্য ছিল।"

অনুশীলন সমিতি দ্রুত গতিতে আগাইয়া চলে। গ্রামে গ্রামে সমিতির পত্তন হইতে লাগিল। গ্রাম জুড়িয়া পরগণা, পরগণা জুড়িয়া মহকুমা, মহকুমা জুড়িয়া জেলা সমিতির সংগঠন।

অনুশীলনের আদর্শ মানবিকতায় উদ্বুদ্ধ সমাজের প্রত্যেক নরনারী বিদ্বান্, চরিত্রবান্ ও দয়ালু হইবে। ইহা শিক্ষার উপর নির্ভর করে। তাই সমাজে নিরক্ষর লোক থাকিতে পারিবে না। দরিদ্র থাকিবে না। দারিদ্র্য হটাইতে হইবে। অলস লোক থাকিবে না, স্বাস্থ্যহীন লোক থাকিবে না। অনুশীলনের কল্পিত সমাজে চরিত্রহীন ভীরু লোকের স্থান নাই।

এক কথায় শুধু অর্থনৈতিক বৈষম্য নয়, শারীরিক, মানসিক ও আত্মিক বৈষম্য দূরীকরণের প্রচেষ্টা করিতে হইবে। বৈষম্যই মানুষের ইতিহাসে সর্ব্বদুঃখ ও পতনের মূল কারণ। তাই ধনবৈষম্য, সামাজিক বৈষম্য, সাম্প্রদায়িক বৈষম্য, প্রাদেশিক বৈষম্য দূর করিয়া সকল মানুষের মধ্যে সমতা আনিতে হইবে। একমাত্র পরিচয় হইবে মানুষ—কোন ধর্ম্ম যদি সাধনার হয় তো সে হইবে মনুষ্যধর্ম্ম। রাষ্ট্রের সাধ্য হইবে তাহাই। পরাধীন অবস্থায় অনুশীলন সমাজের প্রতিষ্ঠা সম্ভবপর নয়—অনুশীলন সমিতির প্রথম কার্য্যোত্তম পরাধীনতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা। অনুশীলনের লক্ষ্য ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা। এ স্বাধীনতা কোন শ্রেণী বিশেষের নয়, এ স্বাধীনতা দেশের সর্ব্বজনের স্বাধীনতা, এ স্বাধীনতা সাম্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হইবে। তাত্ত্বিক অধিকার নয়—কায়িক অধিকার, মানসিক অধিকার, সার্ব্বিক অধিকার, অধিকার প্রতিষ্ঠার কার্য্যক্রম অনুষ্ঠান করিতে হইবে।

আপামর জনসাধারণের মধ্যে এই স্বপ্ন-সম্ভাবনা বিচ্ছুরিত হইতে লাগিল। ধনী নির্ধন, বিদ্বান, মূর্খ, জমিদার, প্রজা, ব্রাহ্মণ, শূদ্র সবাই এ আদর্শকে কেহ বা সোচ্চারে কেহ বা নীরবে স্বাগত জানাইল।

তাই আমরা সেদিন অনুশীলন সমিতির নেতৃত্বপদে দেখিলাম প্রমথ মিত্র, যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অরবিন্দ ঘোষ, বিপিন পাল, সুবোধচন্দ্র মল্লিক, তারকনাথ দাস, যোগেন্দ্র বিদ্যাভূষণ, সতীশচন্দ্র বসু, সখারাম গণেশ দেউসকর, বারীন্দ্র কুমার ঘোষ, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ হালদার, ভূপতি মজুমদার, নরেন্দ্র ভট্টাচার্য্য (মানবেন্দ্র রায়) হরিকুমার চক্রবর্ত্তী, যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি ব্যক্তিকে কলিকাতায়।

ঢাকায় পাইলাম আনন্দ চন্দ্র পাকড়াশী, ললিতমোহন রায়, পুলিনবিহারী দাস, ভূপেশচন্দ্র নাগ, উপেন্দ্রচন্দ্র নাগ, শ্রীশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাঃ মোহিনীমোহন দাস, বীরেন্দ্র মজুমদার, হরেন্দ্র চক্রবর্ত্তী, আশুতোষ দাশগুপ্ত, নরেন্দ্র মোহন সেন, মাখনলাল সেন, প্রতুল চন্দ্র গাঙ্গুলী, বীরেন্দ্র চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মদন মোহন ভৌমিক, নলিনী কিশোর গুহ, অমৃতলাল হাজরা, শচীন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শান্তিপদ মুখোপাধ্যায়, মতি সেন, জ্যোতির্ম্ময় রায়, রাধিকাভূষণ রায়, রজনীকান্ত বসাক, কেদারেশ্বর সেনগুপ্ত, নলিনীকান্ত ঘোষ প্রভৃতি নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবৃন্দকে।

ময়মনসিংহে দেখিলাম জ্ঞানেন্দ্র চন্দ্র মজুমদার, রবীন্দ্রমোহন সেন, রমেশ চন্দ্র আচার্য্য, ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্ত্তী, চন্দ্রকুমার ঘোষ, অমর ঘোষ, যোগেন্দ্র ভট্টাচার্য্য, পূর্ণ চক্রবর্ত্তী, খগেন্দ্র ভট্টাচার্য্য, রমেশচন্দ্র চৌধুরী, সতীশচন্দ্র রায় প্রমুখ নেতাদের।

বরিশালে প্রথম সারিতে পাইলাম—দেবেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ, যতীন্দ্র

রায় (ফেগু রায়) গোপাল মুখোপাধ্যায়, চণ্ডী বসু, নরেন সেন, নিবারণ কর, প্রবোধ গুহ ঠাকুরতা, রোহিণী গুহ, সুনীল ঘোষ, রমনী মোহন দাস, চণ্ডী কর, প্রবোধ দাশগুপ্ত প্রভৃতি নেতৃবৃন্দকে।

ফরিদপুরে দেখিলাম—আশুতোষ কাহালী, যদুনাথ পাল, সতীশ দাশগুপ্ত. গিরীন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শিশির কুমার গুহ রায়, জীবন ঠাকুরতা প্রভৃতি প্রধানগণকে।

নোয়াখালিতে সারদাচরণ গুহ, খগেন্দ্র কাহালী, নলিনী মিত্র, অনুকূল চক্রবর্ত্তী, দীনেশ চন্দ্র বিশ্বাস প্রভৃতি।

সেদিন কুমিল্লায় নেতৃত্বে ছিলেন রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রফুল্ল চক্রবর্ত্তী, পুলিন গুপ্ত, যোগেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ক্ষেত্র সিং, অতীন্দ্র মোহন রায়।

চট্টগ্রামে চন্দ্রশেখর দে, চারুবিকাশ দত্ত, প্রতাপ রক্ষিত, গিরিজা চৌধুরী, মোহিনী ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি প্রধান।

শ্রীহট্টে নগেন্দ্র দত্ত (গিরিজা), রাজসাহীতে প্রভাসচন্দ্র লাহিড়ী, জিতেশচন্দ্র লাহিড়ী, হরেন্দ্র মিত্র (কালা), নরেন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীশ চক্রবর্ত্তী, জ্ঞান সান্ন্যাল, প্রবোধ ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি প্রধান ছিলেন।

মালদহে হংসগোপাল আগরওয়ালা, মহেন্দ্র দে, দক্ষিণা লাহিড়ী, আর দিনাজপুরে অশ্বিনী ভট্টাচার্য্য, প্রফুল্ল বিশ্বাস, প্রবোধ বিশ্বাস প্রভৃতি প্রধানের তালিকায়।

পাবনায় বঙ্কিমচন্দ্র রায়, সুধীর মজুমদার, অমূল্য লাহিড়ী ও রংপুরে খড়্গ বর্মন, সুশীল দে, যতীন্দ্র দেব প্রভৃতি বিশিষ্ট নাম। সারা বাঙলা জুড়িয়া তখন অনুশীলন সমিতির প্রকাশ ও অনুশীলন সমিতির ভাবাদর্শের বিকাশ। তখনও সমিতির উপর ব্রিটিশ সরকারের খড়্গহস্ত প্রসারিত হয় নাই। সমিতি তখন প্রকাশ্য, গুপ্ত সংস্থায় রূপান্তরিত হয় নাই।

পরাধীনতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের অর্থ বিপ্লব। রাজনৈতিক

পরাধীনতা, অর্থনৈতিক পরাধীনতা, সাংস্কৃতিক পরাধীনতা প্রভৃতি সব কিছুই বিশেষ প্লাবনে ক্লেদমুক্ত করাই বিপ্লব। বিপ্লবের প্রস্তুতি অতি ব্যাপক ও ব্যয়সাপেক্ষ। উপরন্তু সংগঠনের শিক্ষা ও আদর্শ প্রচারে ও প্রসারে উৎসর্গীকৃতজীবন সর্বক্ষণের কর্মীর প্রয়োজন। এই কর্মীকুলের ব্যয়ভার সমিতিরই দায়িত্ব। তাই দিনে দিনে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন হইতে লাগিল। অর্থ কোথায়, কেমন করিয়া পাওয়া যাইবে এই চিন্তাই সকলের মনে আলোড়ন তুলিল।

"দেশের স্বাধীনতার জন্য যাঁহারা জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন যাঁহারা বিবাহ বা সংসারধর্ম পালন করিবেন না, সমিতির জন্য সর্বক্ষণ কাজ করিবেন এই বাড়ীঘর-ছাড়া কর্মীরা সমিতির কেন্দ্রের বাড়ীতে থাকিতেন। ঢাকা সহরের ৫০নং ও জাতীয় বিদ্যালয় ৫১ নং ছাড়া মৈশুণ্ডিতে একটী পুরাণো পরিত্যক্ত বাড়ী ভাড়া করা হয়। ইহা ভূতের বাড়ী বলিয়া আখ্যাত ছিল এবং কখনও ভাড়া হইত না। প্রায় দু'শ গৃহত্যাগী কর্মী সেখানে অবস্থান করিতেন। এখানে একটি বড় গ্রন্থাগার ছিল ও শিক্ষার বন্দোবস্ত ছিল। তাই অর্থ চাই। একমাত্র পথ ডাকাতি। কিন্তু ডাকাতি বিশেষরূপে সামাজিক অপরাধ। আদর্শ ক্ষুণ্ণ হইতে পারে। শক্তির প্রয়োগে পরস্বাপহরণ সাধারণ মানুষ কোন্ দৃষ্টিতে দেখিবে? নেতৃবৃন্দ দোমনা হইলেন।

স্বদেশী আন্দোলনের প্রথম দিকে বিপ্লবী আদর্শে অনুপ্রাণিত অনুশীলন সমিতি জনসাধারণের সাহায্য ছাড়াও ধনীদের নিকট হইতে গোচরে ও অগোচরে অর্থানুকূল্য লাভ করিতেন কিন্তু ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে আলিপুর বোমার মামলায় আসামী রাজসাক্ষী নরেন্দ্র গোঁসাইয়ের স্বীকারোক্তির ফলে ধনী ব্যক্তিরা সাহায্য করিতে আর সাহসী হইলেন না। অর্থকৃচ্ছ্রতা সুরু হইল।

এই মানসিকতার সম্পূর্ণ ছবি আমরা প্রধান কেন্দ্রপতি শ্রীপুলিন দাসের আত্মজীবনীতে সুস্পষ্টরূপে দেখিতে পাই।

'সমিতির অর্থভাণ্ডার পরিপুষ্ট করিতে হইলে ডাকাতি করিতে হইবে···ডাকাতি করিতে প্রস্তুত এই প্রকার একদল সাহসী যুবক সভ্য সংগ্রহেরও চেষ্টা করিতে লাগিলাম। স্বাধীনতা আন্দোলন পরিচালনার প্রয়োজনে ডাকাতি যে অপকর্ম নহে—এই কথা বুঝাইতে লাগিলাম। মহাভারতের আপদ্ধর্ম অধ্যায় হইতে যুক্তি দেখাইলাম। আপৎকালে সত্যও মিথ্যা হয়, মিথ্যাও সত্য হয়। শিবাজী, গুরুগোবিন্দ সিংহ, প্রতাপসিংহ ইতালীর গ্যারিবল্ডি প্রভৃতি প্রত্যেকেই স্বাধীনতা অর্জ্জনের চেষ্টায় প্রথম পর্বে অর্থ-সংগ্রহের প্রয়োজনে ডাকাতি করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।"

পুলিন দাসের আত্মজীবনী হইতে আরও জানিতে পারি—"বিভিন্ন জেলা হইতে আগত প্রতিনিধিমণ্ডলীর সম্মুখে অরবিন্দ ঘোষ বক্তৃতা করিয়া বুঝাইয়া দিলেন যে দেশকে স্বাধীন করিতে হইলে গুপ্ত আন্দোলন চালাইতে হইবে এবং আন্দোলন চালাইতে হইলে অস্ত্রশস্ত্র গোলাবারুদের প্রয়োজন এবং এর জন্য প্রচুর অর্থেরও প্রয়োজন আছে আর সেই অর্থ ধনী লোকেরা দিবে না, সরকারী অর্থই ডাকাতি করিয়া আনিতে হইবে। তিনি আরও বলেন—ডাকাতি করা যে নীতিগতভাবে অপরাধ উহা তিনি স্বীকার করেন কিন্তু স্বদেশের বৃহত্তর স্বার্থে করিলে তাহা অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে না।"

অরবিন্দ ঘোষের বক্তৃতার পর—রংপুরের একজন প্রতিনিধি প্রস্তাব করিলেন ডাকাতি করিয়া যে যে স্থান হইতে টাকা আনা হইবে তাহার একটি সঠিক হিসাব রাখিতে হইবে এবং স্বাধীনতা লাভের পর ঐসব টাকা নির্দ্দিষ্ট মালিকদের ফিরাইয়া দিতে হইবে।

"প্রস্তাবটী অরবিন্দ ঘোষ সমর্থন করিলেন এবং এইরূপে

শেষ পর্য্যন্ত ডাকাতি করার প্রস্তাবটী সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।”

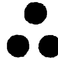
এই সভায় প্রমথ মিত্রও উপস্থিত ছিলেন।

ত্রৈলোক্যনাথের জীবনলিপি হইতে জানিতে পারি—“যে কোন বাড়ীতে ডাকাতি করা যাইত না। ডাকাতি করার সময় বাড়ী নির্ব্বাচন পদ্ধতি ছিল, যাহারা দেশদ্রোহী, সরকারের খয়েরখাঁ, অত্যাচারী, কৃপণ, কোন সৎকাজে অর্থ ব্যয় করে না এরূপ ধনী ব্যক্তির গৃহে ডাকাতি করিতে হইবে। ডাকাতির সময় কেহ স্ত্রীলোকের গায়ে হাত দিতে পারিবে না; কোন স্ত্রীলোকের দেহ হইতে অলঙ্কার ছিনাইয়া নিতে পারিবে না। শিশু ও রুগ্ন ব্যক্তিদের উপরও হাত ওঠানো নিষেধ ছিল।”

নেতা অথচ নীরব কর্ম্মী ত্রৈলোক্যনাথ ভবিষ্যতে অনেক সুসংবদ্ধ ও সুপরিকল্পিত ডাকাতির নেতৃত্ব করিয়াছেন।

দুই চারিটা ছোট ছোট ডাকাতি ইতিমধ্যে হয়ত সংঘটিত হইতেছিল কিন্তু উহারা ঠিক উপযুক্ত চরিত্রের ছিল না। সুসংহত ও সুনিয়ন্ত্রিত প্রথম ডাকাতি হয় ঢাকা সদরের বাত্রায়। পুলিন দাসের সুশৃঙ্খল নেতৃত্বের প্রথম প্রকাশ।

১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের ২রা জুন। অনুশীলন সমিতির সংগ্রামী ইতিহাসের এক চিরদীপ্ত দিবস। সংগঠন, পরিকল্পনা, সাহসিকতা, অনুপ্রেরণার এক বিপুল সফল সমাবেশ। নব-দীক্ষিত ত্রৈলোক্য-নাথের এই ডাকাতিতেই প্রথম হাতে খড়ি।



ইংরাজ রাজশক্তি বাঙলার যুবমানসের উত্তালতা লক্ষ্য করিতেছে। শাসন করিতে সক্রিয়ভাবে তখনও আগাইয়া আসে নাই। আচম্বিতে ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাস হইতে আন্দোলনের

কর্ম্মধারা ও প্রকৃতির পরিবর্ত্তন হইল। ইংরাজ রাজপুরুষদের উপর আক্রমণ সুরু হইল।

১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবরে মেদিনীপুরে ভ্রমণরত লেঃ গভর্ণরের ট্রেন উড়াইরা দিবার বন্দোবস্ত হইয়াছিল কিন্তু ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই ডিসেম্বর সত্য সত্যই ছোটলাটের ট্রেনটীর উপর মেদিনীপুরের নিকট বোমা নিক্ষিপ্ত হইল। বোমার আঘাতে মাটির উপর পাঁচ ফুট চওড়া ও পাঁচ ফুট গভীর গহ্বর সৃষ্ট হইল। লাট সাহেব বাঁচিয়া গেলেন। এই অক্টোবর মাসেই ঢাকা জেলার নিতাইগঞ্জে এক ব্যক্তিকে ছুরিকাঘাত করিয়া অর্থ লুণ্ঠন করা হয়। ইহার কিছুদিন পরেই ডিসেম্বর মাসে ফরিদপুব জেলার গোয়ালন্দ স্টেশনে ঢাকার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট অ্যাল্যান সাহেবের প্রাণনাশের চেষ্টা হয়। ভাগ্যক্রমে তিনি বাঁচিয়া যান।

পব বৎসর ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা এপ্রিল সাত ব্যক্তি ছুরি ও পিস্তল লইয়া কলিকাতার সন্নিকটস্থ শিবপুরের এক বাড়ীতে চড়াও হইয়া অর্থ ও অলঙ্কার লুণ্ঠন করে। ১১ই এপ্রিল চন্দননগরের মেয়রের বাসভবনে বোমা নিক্ষিপ্ত হইল। এই বৎসরই ৩০শে এপ্রিল মজফফরপুরে ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল চাকী কিংসফোর্ডের গাড়ী ভ্রম করিয়া অন্য আর একটী অশ্বযানে বোমা নিক্ষেপ করে। ১৫ই মে কলিকাতায় গ্রে স্ট্রীটে বোমা ফাটিল। ৩০শে অক্টোবর ফরিদপুর জেলার নড়িয়ায় ডাকাতি হইল।

১৫ই আগস্ট ও ১৬ই সেপ্টেম্বর ময়মনসিংহের বাজিতপুর গ্রামে ও হুগলী জেলার বিঘাটী গ্রামে একই প্রকার ডাকাতি হইল। পুলিশ কর্ম্মচারী সাজিয়া বাড়ী তল্লাসীর অছিলায় যুবকের দল ডাকাতি করিল।

ডাকাতির পর ডাকাতি চলিতে থাকে। এই বৎসর নভেম্বর ও ডিসেম্বর মাসে পশ্চিম বাঙলার রাইতা ও মরিহালে আগ্নেয়াস্ত্র

লইয়া ডাকাতি হয়! বাখরগঞ্জ জেলায় দেহেরগতিতেও ডাকাতি হয়। ব্রিটীশ সরকার শঙ্কিত হইয়া উঠে। দমননীতি সুরু হয়।

১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে অশ্বিনীকুমার দত্ত, কৃষ্ণকুমার মিত্র, সুবোধ মল্লিক, মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা, পুলিনবিহারী দাস, ভূপেশচন্দ্র নাগ, শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী, শচীন্দ্রপ্রসাদ বসু, সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এই নয়জন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিকে ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের তিন আইনে গ্রেপ্তার করিয়া বিভিন্ন জেলে আটক রাখা হইল। অনুশীলন সমিতির পূর্ববাঙলার প্রাণশক্তি পুলিন দাসকে সুদূর পাঞ্জাবের মণ্টোগোমারী কারাগারে আটক রাখা হইল।

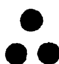
তারপর ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে অন্যান্য স্থানীয় সমিতির সহিত ঢাকা অনুশীলন সমিতিকেও বেআইনী ঘোষণা করা হইল। ইংরাজের দমননীতি বাঙলার গ্রামে গ্রামে ভীষণ ভীতি সঞ্চার করিল—যুবকদের প্রাণ ওষ্ঠাগত করিয়া তুলিল। তাই বলিয়া স্বদেশপ্রীতি কমিল না—স্বাধীনতার আন্দোলন দমিল না। প্রকাশ্য সমিতি গুপ্ত সংস্থায় রূপান্তরিত হইল। সরল পথ ছাড়িয়া বন্ধুর পথের যাত্রী হইল।

১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে অরবিন্দ পূর্ববাঙ্‌লা ভ্রমণ করিয়া যে মন্ত্র দিয়া গিয়াছিলেন তাহা কানে কানে বাজিতে লাগিল—অন্তরে অন্তরে আলোড়ন তুলিল।

"Nationalism is a religion that has come from God. Suffer that she (motherland) may rejoice."

যত অত্যাচার নামিয়া আসে বিশ্বকবির শাশ্বত সঙ্গীত তত অনুপ্রেরণা জাগায়—

"বিধির বিধান কাট্‌বে তুমি এতই শক্তিমান্
আমাদের ভাঙাগড়া তোমার হাতে এত অভিমান?
শাসনে যতই ঘেরো, আছে বল দুর্বলেরও
হও না যতই বড় আছেন ভগবান্।"



"In August three men were arrested in a boat which had been stolen in the Dacca District. Two country-made daggers were concealed in the boat and one of the men found in it was afterwards convicted and sentenced to transportation in what was known as the Barisal Suppliment Conspiracy Case."

ইংল্যাণ্ডের প্রধান বিচারপতি রাউল্যাট সাহেবের সভাপতিত্বে গঠিত সিডিসন কমিটির বিবরণী হইতে উদ্ধৃত। বিশিষ্ট মানুষটি আর কেহই নন স্বয়ং ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্ত্তী। জীবনে প্রথম পুলিশের সহিত মোকাবিলা ও কারাবরণ।

সাটিরপাড়ার নিকটেই মাছিমপুর গ্রাম। ত্রৈলোক্যনাথের নেতৃত্বে সেখানে শাখা সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সম্পাদক ও সহকারী সম্পাদকের পদে দুই ভাই কাজ করিতেছে। তাহাদের উৎসাহ প্রবল, অস্বাভাবিক বিনয়ী ও মাত্রাতিরিক্ত বাধ্য। সন্দেহ করিবার উপায় নাই। তাহারা দুজনেই পুলিশের গুপ্তচর, ব্যপ্তির সুযোগে সংগঠনে প্রবেশ করিয়াছে। ইংরাজ সরকার বাহির হইতে আঘাত হানিবার পূর্বে ভিতর হইতে আক্রমণ সুরু করিয়াছে। ঢাকা সহরে খেলার প্রতিযোগিতা উপলক্ষ্যে ত্রৈলোক্যনাথ সমিতির সভ্যদের লইয়া ঢাকা যাইবার সঙ্কল্প করিলেন। ভ্রাতৃদ্বয় উপযাচক হইয়া একখানি বড় নৌকা দিল। এ নৌকা তাহাদের নিজস্ব,

ভাড়া লাগিবে না। শীতলক্ষ্যার পারে প্রায় ছয় মাইল দূরে নৌকা বাঁধা ছিল। সেইখান হইতে প্রায় আঠার জন তরুণের দল দুইজন গুপ্তচর সমেত মহানন্দে যাত্রা সুরু করিল। অনুপ্রাণিত ও আদর্শবাদী তরুণেরা কল্পনাও করিতে পারে নাই—শত্রুর চর তাহাদের সঙ্গে চলিয়াছে। ত্রৈলোক্যনাথ তখন নৌকা চালনায় অনভিজ্ঞ। নদীপথে ঢাকা কত দূর তাহাও জানা নাই। আহারের কি বন্দোবস্ত হইবে—এসব কথা উত্তেজনা ও অনুপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ ত্রৈলোক্যনাথের একবারও খেয়াল হয় নাই। অনুকূল স্রোত ও বাতাসে নৌকা রাত্রিশেষে ডাঙ্গা বাজারে ভিড়িল। এই সময় গুপ্তচর ভ্রাতৃদ্বয়ের একজন বাড়ীতে কাজ আছে বলিয়া বিদায় লইল, স্টীমারে নারায়ণগঞ্জে মিলিবে একথাও জানাইয়া গেল। ত্রৈলোক্যনাথের নিজের লেখায় জানিতে পারি ঃ

"আমি তখন কোন সন্দেহ করিতে পারি নাই। তাই তাহাকে চলিয়া যাইবার অনুমতি দিলাম। সে চলিয়া গেল, আমরাও নৌকা ভাসাইয়া দিলাম। গুপ্তচরটী ডাঙ্গা বাজারে নামিয়া নরসিংদি থানার দারোগাসহ ষ্টীমারে নারায়ণগঞ্জে রওনা হইল। বৈকালে আমাদের নৌকা নারায়ণগঞ্জে পৌছিল।

"সঙ্গের গুপ্তচরটী নৌকা নিরাপদে রাখিবার ব্যবস্থা করিবার জন্য চলিয়া গেল। সহযাত্রী যতুর খুব জ্বর, আগের রাত্রে বৃষ্টিতে ভিজিয়াছে, উত্থানশক্তি রহিত। জ্ঞানহীন রোগীর সেবা করিতে ত্রৈলোক্যনাথ ও আর এক সঙ্গী বিনোদ চক্রবর্ত্তী নৌকায় থাকিয়া গেলেন। অন্যেরা ট্রেনযোগে ঢাকার পথে পাড়ি দিলেন।

"কিছুক্ষণ পর গুপ্তচরটী একটি হিন্দুস্থানী কনস্টেবলকে ময়লা কাপড় পরাইয়া বাসার চাকর সাজাইয়া আনিয়া আমাকে বলিল, সে তাহার এক আত্মীয়ের বাসার চাকর, সে নৌকা পাহারা দিবে। আমি নৌকার জন্য নিশ্চিন্ত হইলাম। ঘণ্টা খানেকের পর দেখিতে

পাইলাম অনেকগুলি পুলিশ আমাদের দিকে আগাইয়া আসিতেছে। ক্রমে তাহারা নিকটবর্ত্তী হইল এবং দৌড়াইয়া ও লাফাইয়া আমাদের নৌকায় উঠিল। সারা নৌকা তাহারা তন্ন তন্ন করিয়া তল্লাসী করিল কিন্তু কিছুই পাইল না। অবশেষে আমার সহপাঠী যতুনাথ দাস ও বিনোদ চক্রবর্ত্তী সহ আমাকে গ্রেপ্তার করিয়া থানায় লইয়া গেল।"

গ্রেপ্তার করিয়া তাঁহাদের নারায়ণগঞ্জ জেলে আনা হইল। বিচারাধীন কয়েদী বলিয়া 'হাজতী' অবস্থায় কোন কাজকর্ম্ম করিতে হইত না। কর্ম্মহীন অবস্থায় জেলের 'ফাইল, গাইল, ডাইলের' যন্ত্রণা শুধু ভোগ করিতে হইল।

বিপ্লবী ত্রৈলোক্যনাথের অন্তর্নিহিত মানসিকতায় আমরা এক রসিক সত্তার সন্ধান পাই। তাই তিনি 'ফাইল, গাইল, ডাইলের' ভাষ্যে লিখিতেছেন—"জেলখানায় দিনের মধ্যে বহুবার গুণতি হয়, ফাইল করিয়া জোড়া জোড়া বসিতে হয়, জোড়া জোড়া চলিতে হয়, বে-ফাইল যাইবার জো নাই। বে-ফাইলে পা বাড়াইলে বিপদ। পায়খানায় যাওয়া, স্নান করা, খাওয়া সবই ফাইল অনুসারে।

দেরী করিবার উপায় নাই, 'সরকার' বলিবার সঙ্গে সঙ্গেই দাঁড়াইতে হইবে, নতুবা রক্ষা নাই। গাইল (গালি) জেল কর্ম্মচারীদের মুখে লাগিয়াই আছে, সম্বোধন করিবার সঙ্গে সঙ্গে একটা সম্পর্ক পাতানো চাই-ই।

আর জেলখানায় খাবারের মধ্যে ডাইল। কারণ ধান ও পাথরের জন্য ভাত খাওয়া যায় না, তরকারীও খাইতে প্রবৃত্তি হয় না। একমাত্র ডাইলই সম্বল—ডাইল দিয়া টাইল ভর্ত্তি করিতে হয়" —তিনটী কথায়ই সেদিনকার জেলখানার নিখুঁত ছবি ফুটিয়া উঠে।

'নৌকাচুরি করিয়া ডাকাতির প্রচেষ্টা' পুলিশের এই অভিযোগে বিচারালয়ে তাঁহাদের তিনজনকে অভিযুক্ত করা হইল, কিন্তু প্রমাণ-অভাবে ডাকাতির প্রচেষ্টার অভিযোগ টিকিল না, কেবলমাত্র

নৌকাচুরির অপরাধে পাঁচ মাস সশ্রম কারাদণ্ড ও পঞ্চাশ টাকা জরিমানা হইল। জরিমানার টাকা আত্মীয়েরা পরিশোধ করিলেন।

নারায়ণগঞ্জ জেলে একমাস কাটাইবার পর তাঁহাদের ঢাকায় স্থানান্তরিত করা হয়। জীবনের আরম্ভে ত্রৈলোক্যনাথের কারাগারে প্রথম আগমন ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের শেষ পাদে আর শেষ আগমন স্বাধীনতোত্তর পাকভারত উপমহাদেশের স্বাধীন পূর্ব্বপাকিস্থানে আয়ুবশাহীর আমলে ১৯৬৫ সালের পাক্‌ভারত যুদ্ধের অব্যবহিত পরে ১৯৬৬ সালের সুরুতে। প্রথম ও শেষ দর্শনে দীর্ঘ আটান্ন বৎসরের ব্যবধান। মানুষ এক, স্থানও এক, তবে সময় বদলাইয়াছে।

ঢাকা জেলে তিন জনকেই ঘানিতে দেওয়া হইল। অন্তরের শক্তিতে বলীয়ান্, প্রাণপ্রাচুর্য্যে ভরা তরুণ কোন খেদ নাই, অভিমান নাই, দ্বিধা নাই।

"আমাদের গায়ে জোর ছিল, মনে উৎসাহ ছিল, কাজেই বিশেষ কোন কষ্ট হয় নাই অবশ্য প্রথম প্রথম মাথা ঘুরিয়াছে ও জলপিপাসা পাইয়াছে।"

ঘানিঘরে আসিয়া বিদ্যালয়ের শিক্ষক শ্রীমহিমচন্দ্র নন্দীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। বিলাতী লবণ পথে ফেলিয়া দিবার অপরাধে তাঁহার তিনমাস কারাদণ্ড হইয়াছে এবং শাস্তি হিসাবে গরুর বদলে ঘানিতে জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে—তেল পিষিতে হইবে। বয়সের বিচার নাই, শঙ্কিত রাজশক্তি উন্মত্ত হইতে সুরু করিয়াছে। সেই যুগের জেলখানার এক পূর্ণাঙ্গ ছবি আমরা ত্রৈলোক্যনাথের নিকট পাই।

"১৯০৮ সালে জেলের অবস্থা অন্যরূপ ছিল। তখন মারপিট করিয়া ভয় দেখাইয়া কয়েদীদের সংশোধন করিবার ধারণা ছিল। শুধু এই দেশে নহে এই ধারণা তখন ইউরোপেও ছিল। বর্ত্তমানে সভ্যতার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে ও অভিজ্ঞতার ফলে পূর্ব্ব ধারণার

পরিবর্ত্তন হইয়াছে। সেই যুগের কয়েদীরা মানুষের মধ্যে গণ্য হইত না, হিংস্র পশুর মধ্যে তাহারা গণ্য ছিল।

"স্বদেশী আন্দোলনের পূর্ব্বে এই অজ্ঞাত রাজ্যের খবর কেহ রাখিত না। জেল কর্ত্তৃপক্ষগণই ছিলেন এই রাজ্যের সর্ব্বময় কর্ত্তা!"

আত্মস্থ ত্রৈলোক্যনাথ জেলে আসিয়া কারাগারে আসিবার প্রয়োজন বুঝিলেন। জীবনের প্রথম লগ্নে কাবাগারে না আসিলে হয়ত তিনি ময়মনসিংহ আদালতে একজন বিচক্ষণ উকীল হইতেন, স্বাধীনতার জন্য বক্তৃতা করিতেন, ভবিষ্যতে অসহযোগ আন্দোলনে কারাবরণ করিতেন কিন্তু যে বন্ধুর কঙ্করাকীর্ণ পথের তিমির রাত্রির অভিযাত্রী হইয়াছিলেন তাহা হয়ত হইতে পারিতেন না।

"জেলে আসিবার প্রয়োজন আমার ছিল—নিজের দিক্ হইতেও—দেশের দিক্ হইতেও। জেল হওয়ায় দেশকে সেবা কবিবার সুযোগ পাইয়াছি। এতদিন আমি একটা উন্মাদনার বশবর্ত্তী হইয়া চলিয়াছিলাম, গভীরভাবে বিশেষ কিছু চিন্তা করিতাম না, তাই জেলে যেন আমি নূতন জন্ম লাভ করিলাম। জেলের অন্তবালে আমি স্বাধীনভাবে চিন্তা করিতে শিখিলাম। এতদিনের বহির্মুখী মন অন্তর্মুখী হইবার পাঠ লইল।"

এই পাঁচমাস পারিপার্শ্বিকতা হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হইয়া ত্রৈলোক্যনাথ নিজের গড়া মনোজগতে বাস করিলেন। বাহিরে কি ঘটিতেছে জানিবার উপায় নাই। ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দের এক শীতের সকালে যখন মুক্তি পাইলেন তখন দেখিলেন ফটকের বাহিরে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিতে তাঁহার কয়েকজন আত্মীয়ের সহিত তাঁহার সাটিরপাড়া বিদ্যালয়ের শিক্ষক শ্রীশীতল চক্রবর্ত্তীও দাঁড়াইয়া আছেন।



"বন্যা বেশীদিন স্থায়ী হয় না কিন্তু উহারই মধ্যে সে জমি উর্ব্বর করিয়া দিয়া যায়।" স্বদেশী-আন্দোলনের বন্যায় সমগ্র জন-জীবন উদ্বেলিত হইয়া পড়িয়াছিল। অপ্রতিহত ভাবস্রোতে সুদূরতম অন্তরলোকও সেদিন ভাবসিক্ত হইয়া উঠিয়াছিল।

কিন্তু সেই জোয়ারে আজ ভাটা পড়িয়াছে।

"কোন দিকে কোন সাড়াশব্দ নাই, নেতৃবৃন্দের স্বরও গরমের পরিবর্ত্তে নরম হইয়াছে। গভর্ণমেণ্ট ভেদনীতি ও দমননীতি চালাইয়া আন্দোলন বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। সমিতিগুলি বেআইনী ঘোষিত হইয়াছে। নূতন নূতন আইন জারী হইয়াছে, প্রকাশ্যে সভা সমিতির অনুষ্ঠানও বন্ধ হইয়া গিয়াছে। চারিদিকে নৈরাশ্য, ভয় ও অন্ধকার।"

এই অবস্থায় ও পারিপার্শ্বিকতায় ত্রৈলোক্যনাথ কারাগার হইতে বাহির হইলেন। কারাগারে যেদিন গিয়াছিলেন সেদিন চতুর্দ্দিকে ছিল উদ্দামতা উৎসাহ আর উন্মুখতা। ফিরিয়া আসিয়া দেখিতে লাগিলেন উৎকণ্ঠা, শাসককুলের উচ্ছৃঙ্খলতা আর উদ্ধত আচরণ।

চিরদিনের যাহারা পরিচিত, কথা কওয়া দূরের কথা—ভয়ে এড়াইয়া চলে। আত্মীয়েরা স্পষ্ট করিয়াই জানাইয়াছেন তোমার এখানে না আসাই ভাল, পুলিশ বিপদে ফেলিবে। ত্রৈলোক্যনাথ অনুভব করিতে সুরু করিলেন, তাঁহারা সমাজে অপাংক্তেয় ও অবাঞ্ছিত।

সেই আশ্বাসহারা বিষাদ করুণ লগ্নে কবিগুরুর বাণী অন্তরে প্রেরণা জাগাইল—

'তোর ডাক শুনে যদি কেউ না আসে
তবে একলা চল, একলা চল, একলা চল রে।'

১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে সুরাট কংগ্রেস নরম ও গরম দলে বিভক্ত হওয়ায় গরম দল কংগ্রেস হইতে বাহির হইয়া আসিল। "নরমপন্থীদের

দৃষ্টিতে যাহারা স্বাধীনতার কথা বলিত তাহারা পাগলের মধ্যে গণ্য হইত। বাঙলা দেশে তখন একদল যুবক ছিল। যদিও তাহাদের সংখ্যা খুব কম তথাপি তাহারা সত্য সত্যই দেশের স্বাধীনতার কল্পনা করিত। বিত্তাবত্তার ছাপ তাহাদের বেশী ছিল না, অর্থবল তাহাদের মোটেই ছিল না, জনসমাজে তাহারা ছিল অপরিচিত।" তবুও তাহাদের ইস্পাতকঠিন মনোবল, সুদৃঢ় প্রত্যয় ও দুর্জ্জয় সাহস তাহাদের পথ দেখাইল। প্রকাশ্য পথ ছাড়িয়া তাহারা গুপ্ত পথের যাত্রী হইল। মুখে মুখে তাহাদের গানের কলি—

"যদি তোর ভাবনা থাকে ফিরে যা না।
যদি তোব ভয় থাকে ত করি মানা।
যদি তোর ঘুম জড়িয়ে থাকে গায়ে—
ভুলবি যে পথ পায়ে পায়ে;
যদি তোর হাত কাঁপেত নিবিয়ে আলো
সবায় যে তুই করবি কানা।"

এবার তাহারা গুপ্ত পথযাত্রী, তাই গুপ্ত সমিতির উদ্ভব হইল। যা ছিল প্রকাশ এখন থেকে তাহাই হইল সন্ত্রাস। কারাগার হইতে মুক্ত হইয়া ত্রৈলোক্যনাথ বাড়ী ফিরিলেন এবং আদর যত্নও পাইলেন, কিন্তু তাঁহার মন অস্থির হইয়া উঠিল। বাহিরের ডাক যাহার প্রাণে একবার বাজে, ঘরের আবহাওয়া তাহাকে স্বস্তি দিতে পারে না।

সমিতির কোন খবর তিনি বহুদিন পান নাই, সমিতির ঢাকাস্থিত আবাসস্থল ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। সহযাত্রী ও সহকর্ম্মীদের মধ্যে কে কোথায় আছেন তাহাও তাঁহার জানা নাই। যোগাযোগের কোন সুযোগ নাই, কারণ সবাই আত্মগোপন করিয়া আছেন। ইহার মধ্যে ত্রৈলোক্যনাথকে পাকাপাকি ভাবে বাঁধিবার জন্য বিবাহের

প্রস্তাব চলিতেছে। রেঙ্গুনপ্রবাসী বড় দাদা ছোট ভাইয়ের চাকুরি কবিয়া দিবার অভিপ্রায়ে তাহাকে রেঙ্গুন আসিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতেছেন। স্নেহপরায়ণ অগ্রজেরা ভাইকে সংসারী করিয়া বিদেশে স্থানান্তরিত করিবার জন্য উৎসুক হইয়া উঠিয়াছেন, কারণ তাঁহাদের অভিপ্রায় ত্রৈলোক্যনাথ এই স্বদেশী নেশা ছাড়িয়া প্রকৃতিস্থ হউন, সংসারে আকৃষ্ট হউন। বিবাহ ও চাকুরি কোনটাই ত্রৈলোক্যনাথকে লুব্ধ করিতে পারিল না। ইত্যবসরে আচম্বিতে সমিতি হইতে গোপন বার্ত্তা আসিল। উৎফুল্ল বিপ্লবী গৃহত্যাগ করিবার সঙ্কল্প করিলেন। বাড়ী হইতে পলাইতে হইলে অর্থেব প্রয়োজন। তিনি সুযোগ খুঁজিতে লাগিলেন। একদিন মেজদাদা কোন এক আত্মীয়েব গৃহে যাইবার কালে ত্রৈলোক্যনাথকে সিন্দুকের চাবিটি দিয়া গেলেন। বাড়ীতে কেবলমাত্র বিধবা পিসীমা, মেজ বৌদি ও বিধবা ছোট বৌদি।

নারায়ণগঞ্জে যাইবার ষ্টীমার ঘাট মাইল তিনেক দূরে, সকাল আট নয় ঘটিকার সময় ঢাকাগামী ষ্টীমার ছাড়ে। ত্রৈলোক্যনাথ বাড়ীতে বলিলেন—বাজিতপুর যাইতেছেন। অম্বুবাচী চলিতেছে—তাই পিসীমা কিছু আম আনিবার ফরমাস্ করিলেন। যাত্রার প্রাক্কালে মেজ বৌদি গরম ভাত রান্না করিয়া দিতে চাহিলেন কিন্তু গরম ভাত খাইতে বসিলে ষ্টীমার ধরা চলিবে না। সব কথা বলাও চলে না। বিনা তরকারীতে শুধুমাত্র লেবুর পাতা ও কাঁচা লঙ্কা দিয়া পান্তা ভাত খাইয়া ত্রৈলোক্যনাথ রওনা হইলেন। বাজিতপুরের নাম করিয়া ঢাকার উদ্দেশ্যে পাড়ি দিলেন। পূর্ব্ব ব্যবস্থানুযায়ী গ্রামের সতীশ রায়ের নিকট একটী তোয়ালে ও ধুতি রাখা ছিল। গচ্ছিত চাবি দিয়া সিন্দুক খুলিয়া পাঁচ টাকা নিলেন ও জমাখরচের খাতায় লিখিলেন—"আমি পাঁচ টাকা সঙ্গে লইয়া যাইতেছি। বাড়ী ফিরিতে বিলম্ব হইবে ।"

পূর্ব্বনির্দিষ্ট স্থানে সতীশ কাপড় ও তোয়ালে লইয়া আসিল। তাহার হাতে ত্রৈলোক্যনাথ মেজ দাদার চাবির গুচ্ছ প্রত্যর্পণ করিলেন ও সত্য ঘটনা বিবৃত করিতে বলিয়া দিলেন। ঢাকায় সমিতির কাজে যাইতেছেন। বাজিতপুরে তাঁহার কোন কাজ ছিল না, বাজিতপুর হইতে কিছু আম কিনিয়া পিসীমাকে দিবার জন্য অনুরোধ করিয়া গেলেন। চিরবন্ধুর পথের যাত্রী, কণ্টকাকীর্ণ রক্ত পথের যাত্রী হইলেন। গৃহ পরিবেশ পরিত্যাগ করিলেন।

সেই রাত্রে ঢাকা পৌঁছিয়া স্বদেশী যুগের নেতা ললিত রায়ের বাসায় উঠিলেন। স্বদেশী আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে বহু স্বদেশী শিল্প ও ব্যবসা বিদেশীদের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া গড়িয়া উঠিয়াছিল। ললিতবাবু ষ্টীমার কোম্পানী খুলিয়াছেন। বিদেশী ষ্টীমারের সঙ্গে পাল্লা দিয়া পদ্মা মেঘনার বুকে তাঁহার ষ্টীমার যাত্রী বহন করিতেছে। ত্রৈলোক্যনাথ সাময়িক ভাবে ষ্টীমারের টিকিট পরীক্ষার কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। গোপন থাকিয়া গোপন কার্য্যকলাপ করিতে লাগিলেন। কয়েক মাস ষ্টীমারে কাটাইবার পর পুরাপুরি ভাবে সমিতির কাজে আত্মনিয়োগ করিলেন।



স্বাধীনতার অদম্য অভিলাষ যতই দমনে দলনে বিপর্য্যস্ত হইতে লাগিল ততই সে অখণ্ড স্রোতধারা নানা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডধারায় রূপান্তরিত হইয়া চারিদিকে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। যাহা এতদিন অশেষরূপে প্রতীয়মান ছিল তাহাই আজ বিশেষরূপে প্রকট হইল। একনিষ্ঠ যুবশক্তি বিশেষ প্লাবনে মাতিয়া উঠিল।

ত্রৈলোক্যনাথ তাই লিখিতেছেন—"একটা জাতির অন্তরে যখন স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা জাগে তখন অত্যাচার নির্য্যাতন দ্বারা তাহাকে

কখনও দাবাইয়া রাখা যায় না। স্বদেশী আন্দোলন যদিও গভর্ণমেন্ট আইনের বলে দমন করিয়া দিয়াছিলেন, লোকের আশা-আকাঙ্ক্ষা যদিও ক্ষণেকের জন্য নির্ব্বাপিত হইয়াছিল তথাপি স্বাধীনতার সত্যকার আন্দোলন কখনও মরে নাই—ভিতরে ভিতরে ইহার আগুন জ্বলিতেছিল।”

এই ভাব-ব্যঞ্জনার পূর্ণ প্রকাশ স্বয়ং ত্রৈলোক্যনাথ। ষ্টীমারের চাকরী ছাড়িয়া ত্রৈলোক্যনাথ বিদ্যালয়ের শিক্ষকতা গ্রহণ করিলেন। বিপ্লবযজ্ঞে যাহারা জীবন বলিদান দিবে তাহাদের খুঁজিয়া বাহির করিতে হয়। ইস্পাতের সন্ধান মিলিলে তাহাকে দুঃখ ও ক্লেশের আগুনে পোড়াইয়া অধ্যাবসায় ও সাধনার সংযোগে শিক্ষার প্রলেপে তবেই বিভিন্ন ছাঁচে গড়া চলে। এই ইস্পাত-চরিত্রের সাক্ষাৎ বিদ্যালয়গুলিতেই মেলে। তাই বিপ্লব-যুগে বহু অগ্নি-সাধক বিদ্যালয়ে ও পাঠশালায় স্বেচ্ছায় অর্থকৃচ্ছ্রতার মধ্যেও শিক্ষকতা গ্রহণ করিয়াছেন। তপস্বীর নিষ্ঠায় শিক্ষকতা করিয়াছেন, অগ্নিহোত্রীর ঐকান্তিকতায় কিশোরপ্রাণে বিপ্লবাগ্নি প্রধূমিত করিয়াছেন।

মাণিকগঞ্জের নিকট গড়পাড়া গ্রামের অশ্বিনী ঘোষ সমিতির সভ্য। পিতৃবিয়োগ হওয়ায় কাকা জমিদারীর দেখাশুনা করিতেছেন। তাহাদের বাড়ীতেই একটী মাধ্যমিক বিদ্যালয়। ইদানীং বিদ্যালয়ের অবস্থা ভাল নয়; বেতনের অভাবে শিক্ষকেরা চলিয়া গিয়াছেন। অবশিষ্ট আছেন পণ্ডিত মহাশয়। উপরের শ্রেণীর ছাত্রেরাও বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিয়াছে। এমন সময় ত্রৈলোক্যনাথ আসিলেন, অশ্বিনী ঘোষ কাকাকে বলিয়া তাঁহাকে স্কুলের হেড্‌মাষ্টার নিযুক্ত করাইলেন। ত্রৈলোক্যনাথের নিজের জবানীতে আমরা সেদিনের কথা জানিতে পারি। “আমি গড়পাড়া স্কুলের প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত হইলাম, আমার খোরাকের ব্যবস্থা জমিদার বাড়ীতে হইল। নূতন হেডমাষ্টার নিযুক্ত হইয়াছে শুনিতে

পাইয়া আবার ছাত্রেরা বিদ্যালয়ে আসিতে আরম্ভ করিল। প্রথম শ্রেণীতে একটী ছাত্র ছিল, দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়েন বিশটি; মোট ষাট-সত্তর জন ছাত্র ছিল।"

অষ্টম শ্রেণী হইতেই ত্রৈলোক্যনাথের বিদ্যালয়ের সহিত সম্পর্ক ছেদ হইয়াছে—এবং বয়সও অল্প, মাত্র ২০ বৎসর পূর্ণ হইয়াছে—তাই স্বভাবতই তিনি হেডমাষ্টার হওয়ার বিদ্যাবুদ্ধি পরিপূর্ণ আয়ত্ব করিতে পারেন নাই। স্বভাব-রসিক ত্রৈলোক্যনাথ বলিতেছেন—

"প্রথম শ্রেণীর ছাত্রটী একটু নির্ব্বোধ ছিল এবং প্রায়ই বিদ্যালয়ে আসিত না। আমার পক্ষে ইহা ভগবানের আশীর্ব্বাদ বলিয়া বোধ হইল কারণ মাইনর ক্লাসের অঙ্ক কষানো আমার পক্ষে অসম্ভব ছিল। আমি যখন ইংরাজী পড়িতাম তখন ইংরাজী ও ইতিহাসে প্রথম হইতাম কিন্তু অঙ্কে বেশী নম্বর পাইতাম না, কোন রকমে পাশ করিয়া যাইতাম। আমি যখন ইতিহাস পড়াইতাম যাহা ইচ্ছা বলিয়া যাইতাম।"

সেই বৎসরের বর্ষাকালে হঠাৎ খবর আসিল বিদ্যালয়ের পরিদর্শক পরের দিন বিদ্যালয় পরিদর্শনে আসিতেছেন। কে আসিবেন জানিতে না পারিয়া ত্রৈলোক্যনাথ চিন্তাগ্রস্ত হইলেন, কারণ বিদেশী হইলে তিনি তাহার কথা বুঝিবেন না আর সাহেবও ত্রৈলোক্যনাথের ইংরাজী হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন না। পরে খবর পাইলেন শ্রীযুক্ত মহিম বোস আসিতেছেন। দুঃশ্চিন্তার মধ্যেও আশ্বস্ত হইলেন।

সেদিনের পরিদর্শন কাহিনীটি ত্রৈলোক্যনাথ তাঁহার সহজ সরস ভঙ্গীতে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

"আমি বৈকালে জমিদার বাড়ীর নৌকা পাঠাইয়া প্রত্যেক ছাত্রের বাড়ীতে আগামীকল্য বিদ্যালয়ে উপস্থিত হইবার জন্য

সংবাদ পাঠাইলাম। পরদিন আবার নৌকা পাঠাইয়া ছাত্রদিগকে আনাইলাম, প্রায় একশত ছাত্র উপস্থিত হইল। কয়েকদিন হাজিরা বহি ডাকা হয় নাই—কিন্তু আমি প্রায় সকলকেই 'উপস্থিত' চিহ্নিত করিলাম, সকল ছাত্রকে তাহা বলিয়া দিলাম।

আপনার ছাত্রাবস্থায় ইন্‌স্‌পেকটর আসিবার দিনে আপনার স্কুলের পণ্ডিত মহাশয়ের কার্যকলাপ ও ঘটনাদি স্মরণ করিয়া ত্রৈলোক্যনাথ ছাত্রদের একটী বই দিয়া একটী নির্দ্দিষ্ট স্থান হইতে দু'একটী বানান ভুল রাখিয়া কিয়দংশ লিখিতে বলিলেন। কারণ সেদিনের পরিদর্শক কম বানান ভুল দেখিয়া স্কুলের পণ্ডিত মহাশয়ের উপর বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। তাই ত্রৈলোক্যনাথ তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্রদের জন্য একই ব্যবস্থাপত্র দিলেন।

"ইন্‌স্‌পেকটরবাবু যথাসময়ে উপস্থিত হইলেন। তিনি টেবিলের উপর কতকগুলি শ্লেট দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—এগুলি কি? আমি বলিলাম—শ্রুতিলিখন। তিনি শ্লেটগুলি পড়িয়া দেখিলেন, কেহ বেশী ভুল করে নাই। মহিমবাবু ছিলেন একজন পাকা ঘুঘু; তিনি সন্দেহ করিলেন ও ছাত্রদের আবার শ্রুতিলিখন দিলেন। সে যাত্রা প্রত্যেক ছাত্র ১০।১৫টি করিয়া ভুল করিল।"

মহিমবাবু হেড্‌মাষ্টারের মুখের পানে চাহিলেন, ত্রৈলোক্যনাথ লজ্জিত হইয়া পড়িলেন—উত্তর দিতে পারিলেন না।

ইহার পর তিনি প্রথম শ্রেণীর ছাত্রটীকে একটী অঙ্ক কষিতে দিলেন।

"তখন আমার বুক ধড়ফড় করিতে লাগিল, ও পা কাঁপিতে লাগিল। আমার মনে হইল এ অঙ্ক সে কিছুতেই কষিতে পারিবে না। তখন যদি ইন্‌স্‌পেক্‌টারবাবু আমাকে এই অঙ্কটা বুঝাইয়া দিতে বলেন আর আমার সমস্ত বিদ্যাবুদ্ধি ধরা পড়িবে।

মনে মনে তখন আমি কালী, দুর্গা শিব কত নামই যে জপ করিতে লাগিলাম।”

হঠাৎ জমিদার বাড়ীর খাবার ঘণ্টা ত্রৈলোক্যনাথকে পরিত্রাণ আনিয়া দিল। তাঁহার এখনও খাওয়া হয় নাই এবং খাবার ডাক পড়িয়াছে বুঝিতে পারিয়া মহিমবাবু তাঁহাকে খাইতে পাঠাইয়া দিলেন। ত্রৈলোক্যনাথ হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচেন।

অভিজ্ঞ মহিমবাবু বিদ্যালয়ের আনুপূর্বিক অবস্থা বুঝিতে পারিয়াছিলেন, তাই ত্রৈলোক্যনাথ আহার করিয়া ফিরিলে প্রশ্ন করিলেন ‘বেতন কিছু পান কি?’

‘হ্যাঁ কিছু পাই—ত্রৈলোক্যনাথ জবাব দেন।

মহিমবাবু বলিলেন—‘আপনি ব্রাহ্মণের ছেলে, আমার মনে হয় আপনি যদি বাড়ীতে বসিয়া শুধু শ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণ খান তাহা হইলেও ব্রাহ্মণ ভোজনের দক্ষিণা ইহা অপেক্ষা অধিক পাইবেন।’

ত্রৈলোক্যনাথ নিরুত্তর থাকেন।

ইনস্‌পেকটর মন্তব্য লিখিলেন—বিদ্যালয়ের অবস্থা খুব খারাপ। মাত্র দুই জন শিক্ষক আছেন। তিন দিনের হাজিরা এক দিনে ডাকা হইয়াছে এবং তাহাও অনুসন্ধান করিয়া দেখা গেল ভুল। বিদ্যালয়ের অবস্থা যদি পরিবর্ত্তন না হয় তবে সরকারী সাহায্য বন্ধ হইবে। যাহা হউক কিছুদিন পর উপযুক্ত শিক্ষক আসিলেন এবং বিদ্যালয়ের অবস্থা ধীরে ধীরে উন্নতি লাভ করিতে লাগিল। ত্রৈলোক্যনাথ মাস তিনেক এই বিদ্যালয়ে ছিলেন তাহার পর আবার নূতন পথে যাত্রা সুরু হইল।



নীরব নেতা ত্রৈলোক্যনাথ একজন প্রথম সারির সক্রিয় কর্মী। বিপ্লব আন্দোলনের দিনে নেতারা শুধু হুকুম বা ফতোয়া দিয়াই আপনার কর্তব্য সমাধান করিতেন না—আপনি আচরি ধর্ম পরকে অর্থাৎ অনুগামীদের শিখাইতেন। তাই কর্মীর একনিষ্ঠ সাধনায় তিনি আরব্ধ কর্ম সমাধান করিতেন। সেই পথ ধরিয়া অন্যেরা অনুপ্রেরণা পাইত—আগাইয়া চলিত।

বিপ্লবীনেতা ইলেক্‌শনের ফলশ্রুতি নয়—যোগ্যতার সোপান বহিয়া কর্মীর কর্মদক্ষতার গুণে নেতৃত্বের আসনে সংবৃত হইতেন। অনুশীলন দ্বারা নেতৃত্ব অর্জন করিতে হইত—শ্লোগালের সম্মোহনে তাহা নামিয়া আসিত না।

ত্রৈলোক্যনাথের ভাষায়—"বর্ত্তমান যুগে ভাব প্রচার যথেষ্ট হইয়াছে—কিন্তু আন্তরিকতা কমিয়া গিয়াছে। নেতা হওয়া তখন বড় শক্ত ব্যাপার ছিল। নেতৃত্ব তখন মোটেই লোভনীয় ব্যবসা ছিল না। নেতাদের বিপদই ছিল তখন বেশী; ফাঁসি, দ্বীপান্তর গুলির আঘাতে মৃত্যু। অনুশীলনের নেতা প্রত্যেকেই ছোট হইতে বড় হইয়াছে। প্রথমে প্রত্যেককেই বাড়ী ঘর ছাড়িয়া গ্রামে গিয়া বসিতে হইয়াছে। একটী ক্ষুদ্র গ্রাম, হয়ত সেখানে কোন ভদ্রলোকের বাস নাই, সেখানে প্রথম তাহাকে একটি অবৈতনিক প্রাথমিক বিত্যালয় স্থাপন করিয়া থাকিতে হইয়াছে, গ্রামের লোকের মুষ্টি ভিক্ষার উপর তাহাকে নির্ভর করিতে হইয়াছে। সেখানে যে সংগঠন শক্তির পরিচয় দিয়াছে, যে অসম সাহসের পরিচয় দিয়াছে, যে দুঃখ কষ্ট ভোগ ও ত্যাগের পরিচয় দিতে পারিয়াছে সেই ধীরে ধীরে প্রধান কেন্দ্রে আসিয়াছে। দলের লোক তাহাকেই নেতা বলিয়া মানিয়াছে।"

অন্যতম নেতা ও বিশিষ্ট কর্মী ত্রৈলোক্যনাথ আগাইয়া চলেন। প্রথমত শত্রুকে শত্রুর ভাষায় মোকাবিলা করিতে হইলে আগ্নেয়াস্ত্র

চাই। বন্দুক ও পিস্তল জোগাড় করিতে হইবে। বন্দুক ও পিস্তল দু' একটী জোগাড় করাই দুঃসাধ্য, বহু সংখ্যায় পাওয়া স্বপ্ন-সাধ্য। উপায়! বোমা। তখন ইউরোপে বোমা আবিষ্কৃত হইয়াছে। বিপ্লবী সংস্থায় তাহার উৎপাদন সূত্র ও প্রকরণ লইয়া গোপন গবেষণা সুরু হইয়া গিয়াছে। ত্রৈলোক্যনাথের সহকর্মী ও সহযাত্রী অমৃত হাজরা একদিন যে বোমার খোলের উদ্ভাবন করিয়াছিলেন তাহাই কলিকাতা 'হইতে দিল্লী পর্য্যন্ত নিক্ষিপ্ত হইয়াছে ও 'রাজাবাজার বোমা' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।

প্রথম যুগে ফরাসী চন্দননগরে অস্ত্র আইন ছিল না—অস্ত্র সংগ্রহ তাই অসাধ্য ছিল না। কিন্তু পরে বন্ধ হইয়া যায়। ফিরিঙ্গীদের নিকট হইতে অর্থের মাধ্যমে মাঝে মাঝে কিছু সংগৃহীত হইত। বিদেশী জাহাজের মারফৎ বিদেশ হইতেও কিছু আসিত।

পলাতক ত্রৈলোক্যনাথ সহকর্মীদের লইয়া কর্মধারা স্থির করিলেন। তখন অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেটদের বন্দুক পিস্তল ক্রয়ের লাইসেন্স লাগিত না। এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করিলেন।

কাপাসাটিয়া গ্রামের অবৈতনিক হাকিম কৃষ্ণকুমার রায়ের নামে কলিকাতার বন্দুক বিক্রেতা সাহেব কোম্পানীর ঠিকানায় একটী মশার পিস্তল ও দুশো কার্ত্তুজের অর্ডার পাঠান হইল। ঠিকানা ঢাকার একটী বাসা। সমিতির সভ্য আড়াইহাজার জমিদার পুত্র বীরেন্দ্র চৌধুরী কৃষ্ণকুমার রায় হইয়া ভাল একটী ঘোড়ার গাড়ীতে চাপিয়া সদর পোষ্ট আফিসে হাজির হইলেন ও পার্শেল ছাড়াইয়া লইয়া গেলেন। দূর হইতে আর একটী বিপ্লবী প্রতুল গাঙ্গুলী নজর রাখিতে লাগিলেন—কোন গুপ্তচর না অনুসরণ করে। পরে জানাজানি হয় ও তল্লাসী চলে—কিন্তু পিস্তলের সন্ধান পাওয়া যায় না।

দ্বিতীয়তঃ অর্থ। তাই ডাকাতির প্রবর্ত্তন। সৈনিকের নিষ্ঠা ও

শৃঙ্খলায় এই ডাকাতি সম্পাদিত হইত। এই ডাকাতি-পর্ব্বে ত্রৈলোক্যনাথ এক অনন্যশক্তি, সংগঠক ও সম্পাদক।

জিতেশচন্দ্র লাহিড়ী তাঁহার নমামি গ্রন্থে লিখিতেছেন—"পদ্মা ও মেঘনা নদীর গ্রামগুলির ধনী মহাজনদের বাড়ীতে পরপর কয়েকটা ডাকাতি হয়েছে। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই ডাকাত দলের নেতা এক কৃষ্ণকায় পাঞ্জাবী। প্রকাণ্ড বড় তার দাড়ি। নদীতীরের বড় লোকদের মনে সে একটা রীতিমত বিভীষিকা। কত অদ্ভুত কাহিনী রটে গেছে তার সম্বন্ধে। কেউ বলে পুরাণের শব্দভেদী বাণ আয়ত্ব করেছে সে—শব্দ লক্ষ্য করেই সে ছোড়ে অব্যর্থ গুলি। কেউ বলে লাঠি ভর করে এক লাফে ওঠে দোতলায়। অবলীলাক্রমে লাফ দিয়ে পড়ে ভূমিতে। হাত দিয়ে ভাঙে সিন্দুকের তালা হুঙ্কার দেয় দৈত্যের মত। নির্ম্মম পাষাণ সে। অথচ কোন ক্ষেত্রেই করেনি সে নারীর অসম্মান। এক বাড়ীতে একজন দস্যু একটী মহিলার অঙ্গ থেকে গয়না খুলে নিচ্ছিল। কিন্তু সহসা কে যেন তাকে দুকান ধরে তুলে ধরল শূন্যে। সকলে চেয়ে দেখল সেই দুর্দ্ধর্ষ পাঞ্জাবী। এও শোনা যায় ডাকাতি করতে যেয়েও সে রোগীর সেবা করে, বাড়ীর মেয়েদের কাছে জল চেয়ে খায় আর বলে কুচ্ছ্ ভয় নেই মায়ি।"

এ ডাকাত সর্দ্দার শৃঙ্খলায় ও অভীষ্ট কর্ম্মে বজ্রের মত কঠোর কিন্তু আচরণে কুসুম সম পেলব। ডাকাত ত্রৈলোক্যনাথের এই ছিল রূপ। নিজের সম্বন্ধে ত্রৈলোক্যনাথের উক্তি—"সেই যুগে আমি পুলিশের কর্ম্মচারীদের নিকট খুব ভীষণ প্রকৃতির লোক বলিয়া পরিচিত ছিলাম। কিন্তু আমাদের গ্রামের লোক যাহারা শৈশব হইতে আমাকে জানে, তাহারা জানে আমি খুব শান্ত প্রকৃতির লোক। ডাকাতি করার সময় চোরের মত কিছু করি নাই, বীরের মত সাড়ম্বরে করিয়াছি।"

প্রত্যেক ডাকাতি বা বিপ্লবীদেব সংজ্ঞায় Action-এর একজন সর্বাধিনায়ক থাকিতেন—তাঁহার নির্দ্দেশে সকল শাখা সুনির্দ্দিষ্ট শৃঙ্খলায় সহযোগ করিত। সম্পূর্ণ দলটী চারটী উপদলে বিভক্ত থাকিত; (১) রক্ষিদল (২) মশাল দল (৩) সিন্দুকভাঙাদল ও (৪) অর্থ সংগ্রহ দল। প্রতি দলে এক একজন অধিনায়ক।

প্রতিদলেব কার্য্যকলাপ ও কর্ম্ম পদ্ধতি আমবা ত্রৈলোক্যনাথেব জীবন লিপি হইতে জানিতে পারি।

বক্ষীদল—এই দলেব লোকেবা বন্দুক লইয়া সেই বাড়ীব বিভিন্ন বাস্তা পাহাবা দিবে, যেন বাহিব হইতে কেহ আসিযা তাহাদিগকে আক্রমণ করিতে না পাবে। বাড়ীব ভিতর যাহাবা কাজ কবিতেছে তাহাদের নিরাপত্তাব জন্য এই দল দায়ী থাকিতেন।

মশাল দল—যে সব স্থানে আলোব প্রয়োজন তাহারা সেই সব স্থানে মশাল জ্বালাইয়া বাখিবেন।

সিন্দুকভাঙা দল—এই দল ছেনী ও হাতুড়ি দ্বাবা লোহার সিন্দুক ভাঙিয়া দিবেন।

অর্থ সংগ্রহ দল—এই দল অর্থ সংগ্রহ করিবেন।

ডাকাতির সময় ১০।১৫টী মশালের প্রয়োজন ঘটিত ও মশাল দল এই মশাল তৈয়াবী কবিতেন।

ডাকাতির পূর্ব্বে সর্ব্বাধিনায়ক সকল বিষয়ে পূর্ব্ব-নির্দ্দিষ্ট প্ল্যান্ অনুযায়ী সকল আদেশাবলী বিশদভাবে বুঝাইয়া দিতেন। নির্দ্দিষ্ট সময়ে নির্দ্দিষ্ট গৃহের নিকট সর্ব্বাধিনায়কের বিউগিল বাজিয়া উঠিত। বিউগিল ধ্বনির সাথে সাথে চারিদিকে মশাল জ্বলিয়া উঠিল। বন্দুকের কয়েকটা ফাঁকা আওয়াজ ও সম্মিলিত কণ্ঠের হুঙ্কার ধ্বনি নৈশ আকাশকে ভীতিবিহ্বল করিয়া তুলিল।

ঘরের দরজায় ১২ পাউণ্ড হাতুড়ীর ঘা পড়িল—দরজা খুলিয়া

গেল সঙ্গে সঙ্গে উপদলের নির্দ্দিষ্ট কর্মীবা পূর্ব্ব-নির্দ্দিষ্ট কাজে লাগিয়া পড়িল।

সিন্দুকের চাবির জন্য গৃহস্বামীর উপর কখনও উৎপীড়ন হয় নাই ছেনীও হাতুড়ীর দ্বারাই বড় বড় সিন্দুক দশ পনর মিনিটে ভাঙা হইয়া গিয়াছে। সর্ব্বাধিনায়ক চারিদিক ঘুরিতেছেন—বিপদের আশঙ্কায় নির্দ্দেশ দিতেছেন, সমস্যার প্রতিবিধান করিতেছেন, অন্যায় আচরণের প্রতিকার করিতেছেন।

অ্যাকশন্ শেষ হইলে বিউগিল বাজিল, সবাই নেতার সম্মুখে সারিবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইলে নেতা সংখ্যা মিলাইয়া লইলেন। সারিবদ্ধভাবে সবাই মার্চ্চ বা ডবল মার্চ্চ করিয়া নির্দ্দিষ্ট স্থানে আসিলে অস্ত্রশস্ত্র লুণ্ঠিত দ্রব্য একদিকে ও লোকজন অন্যদিকে চলিয়া গেল। বিভিন্ন পথে বিভিন্ন মানুষ, বিভিন্ন বস্তু। যাইবার পূর্ব্বে প্রত্যেকের পকেট অনুসন্ধান করা হইত এবং যাহাকে যাহা দেওয়া হইয়াছিল তাহা হিসাব মিলাইয়া ফেরৎ লওয়া হইত।

ডাকাতি দুই ভাগে বিভক্ত ছিল। জলপথে (River action) ও স্থলপথে (Land action)।

ত্রৈলোক্যনাথের বিবরণ—"জলপথে ডাকাতির জন্য বড় ঘাসী নৌকার প্রয়োজন হইত। মাঝি মাল্লা নিজেরাই হইত। ডাকাতির পর নৌকা বড় নদীতে পড়িয়া অদৃশ্য হইত। সুদক্ষ মাঝির নেতৃত্বে চারিখানা বা ছয়খানা দাঁড় যখন দেশপ্রেমিক নির্ভীক যুবকেরা টানিত তখন ঘাসী নৌকা তীরবেগে ছুটিত, সাধারণ লোকের পক্ষে তাহা অনুসরণ করা কঠিন হইত। নির্দ্দিষ্ট স্থানে ডি. বি. অর্থাৎ ডেলিভারী বোট থাকিত। সেই সব ছোট নৌকায় অস্ত্রশস্ত্র বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন পথে যাইত। বড় নৌকার মাঝি দুতিন জন মাল্লাসহ তাহার গন্তব্য স্থানে যাইত।"

এইরূপ ঘাসী নৌকার সর্দ্দার মাঝি কালীচরণ সেই দিন পদ্মা

মেঘনা ধলেশ্বরীর বুকে এক পরিচিত নাম ও চরিত্র। পুলিশ বহুবার দেখিয়াছে, অনেকেই দেখিয়াছে এমন কি তাহার নৌকায় পারাপার হইয়াছে—কিন্তু একান্ত অন্তরঙ্গ ব্যতীত আর কেউ জানে না এই নিরীহ নমঃশূদ্র মাঝি কালীচরণ আর কেহ নয় স্বয়ং ত্রৈলোক্যনাথ।

জিতেশ চন্দ্র লাহিড়ীর বর্ণনায় কালীচরণের চেহারা, 'ভীষণ কালো, মাথায় চুলের কমতি পুরিয়ে দিয়েছে দাড়ির জঙ্গল, কদাকার, ময়লা ছেঁড়া ধুতি পরনে, গলায় কাঠের মালা আর সর্ব্বাঙ্গ অনাবৃত।"

প্রশ্ন হয় 'তোমার নাম কি ?'

'আইগ্যা ? মোর নাম জিগ্যাস ? মোর নাম কালীচরণ।'

এতদিন ডাকাতি করিত সমাজের শত্রু যারা—ধনলোভী, নৃশংস, কামান্ধ তাই তাহাদের কার্য্যকলাপও ছিল অসংলগ্ন, শিথিল ও বীভৎস।

কিন্তু একি ? এযে ডাকাতির আচরণে বৈপ্লবিক কর্ম কুশলতা, মানবিক সংবেদনশীলতা। ইংরাজ সরকার স্তম্ভিত হইয়া উঠে—তারই অভিব্যক্তি রাউলাট রিপোর্ট।

"But even in the case of mere robbery or murder in the course of robbery there are certain features the persistent recurrence of which at once distinguished their crimes from those committed by ordinary criminal.

The persons committing these outrages were usually young men of the Bhadralog class. They are often reported as speaking English—some times they wear khaki shirts or khaki haversacks or both and wear masks either red or white of similar pattern.



পুলিন দাস সমেত বিশিষ্ট নেতাদের গ্রেপ্তার করিয়া ইংরাজ শক্তি ভাবিল বাঙলার উদ্ধত তারুণ্য নেতৃত্ব হারাইয়া স্তিমিত হইয়া পড়িবে। কিন্তু কার্য্য ক্ষেত্রে বিপরীত হইল। ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বরে পুলিন দাস গ্রেপ্তার হইলে এবং আঠার মাস পরে ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম দিকে ফিরিয়া আসিলে এই ব্যবধানের মধ্যে বাঙলা বিশেষ করিয়া পূর্ব্ব বাঙলার চেহারা অনেক পালটাইয়া গিয়াছে।

যে বীজ তিনি যাইবার পূর্ব্বে বন্ধুরপথযাত্রী তরুণদের অন্তরে ছড়াইয়া দিয়াছিলেন তাহা শুধু নবাঙ্কুরে যুবমানস শ্যামল করিয়া তোলে নাই ফলপ্রসূ হইতে সুরু করিয়াছে। বিদেশী শক্তির বাঁধন যতই শক্ত হইতেছিল আবদ্ধ জাতির বাঁধন কাটার প্রয়াস ততই বিপুল ও আকুল হইতেছিল।

পুলিন দাসের বন্দী-অবস্থার মধ্যেই ত্রৈলোক্যনাথের কর্ম্মক্ষেত্র ঢাকা, ময়মনসিংহ ও আগরতলায় বিস্তৃতি লাভ করিল, ডাকাতি ও অন্যান্য বৈপ্লবিক কর্ম্মোদ্যম সংগঠিত হইতে লাগিল।

বৈপ্লবিক চেতনার মূলোচ্ছেদের উদ্যোগে রাজশক্তি "ঢাকা ষড়যন্ত্র" মামলার সূচনা করিলেন।

রাউলট কমিশনের নথীভুক্ত বিবরণ হইতে আমরা জানিতে পারি—

In July 1910, in consequence of the prevalance of anarchical crime in Dacca District, proceedings were instituted in Dacca city against a number of persons charging with conspiracy to wage war against the King. Forty four accused were acutu-ally brought to trial and fifteen found guilty sentenced to terms of imprisionment varying from 7 to 2 years regourous imprisionment.

The Sessions Judge remarked that, the member of the organisation (The Dacca Anusilan Samity) had commited dacoities oviously for the perpose of collecting funds and had got possession of arms and committed murders to ensure the conspiracy to wage war had long passed the passive stage and had become an active conspiracy in respect of which it was essentially the duty of government to take action.

বিমূঢ় ও বিভ্রান্ত ইংরাজ সরকারের ইংরাজ বিচারপতি ষড়যন্ত্র মামলায় রায়দানের সঙ্গে সঙ্গে পরের দিন জাহাজযোগে বিলাত রওনা হইয়া গেলেন। বাঙলার মাটীতে পা রাখিতে আর ভরসা হইল না। বিদেশী শাসককুল ভাল ভাবেই বুঝিয়া ফেলিয়াছিলেন বিপ্লবীদের বিশ্বাস নাই, অসাধ্য শব্দটী তাহাদের কর্ম্মপঞ্জীতে স্থান পায় নাই।

পুলিন দাস আত্মজীবনীতে লিখিতেছেন "সর্ব্বসাকুল্যে ৫৫ জনের নামে পরোয়ানা বাহির হইয়াছিল, তন্মধ্যে দুইজন পরলোকে, ৪৪ জনকে গ্রেপ্তার করিয়াছিল এবং বাকী সকলেই পলাতক। ত্রৈলোক্য চক্রবর্ত্তী ও অমৃত হাজরার নামেও পরোয়ানা ছিল কিন্তু তাহারা পলাতক ছিলেন।"

ইহার পূর্ব্বে ইংরাজ সরকার এত ব্যাপক ভাবে এত সংখ্যক বিপ্লবীর বিরুদ্ধে সঙ্ঘবদ্ধ পদক্ষেপ করেন নাই। তাই সারা দেশ জুড়িয়া বিশেষ করিয়া ঢাকা সহরে প্রবল উত্তেজনার সঞ্চার হইল।

অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট বেন্টিক সাহেবের এজলাসে মামলার শুনানী সুরু হইল। সশস্ত্র সিপাহী বেষ্টিত করিয়া দুজনের পরপর লাইনে হাতকড়ি লাগাইয়া অভিযুক্তদের জেল হইতে বিচারালয়ে পথ দিয়া পদব্রজে আনা হইত। হয়ত সরকার ভাবিয়াছিলেন এরূপ

অবস্থা দেখিয়া ভবিষ্যতে বিপ্লবীর দল সন্ত্রস্ত হইবে—সন্ত্রাসবৃত্তি পরিত্যাগ করিবে।

যে পথে বিপ্লবীরা সকাল সন্ধ্যায় যাতায়াত করে তাহার দুই পাশে জনতার সাগ্রহ প্রতীক্ষা, সবাই নীরবে শুধু চোখের ভাষায় অভিনন্দন জানায়। নির্ব্বাক মুখে শুধু উজ্জ্বল অভিব্যক্তি। বিচারালয় আইনজীবি ও সাংবাদিকে পরিপূর্ণ, তাঁহাদের নিকট হইতেও স্মিতহাস্য অভিনন্দন আসে।

অন্যতম আসামী ত্রৈলোক্যনাথ যদিও ফেরারী তবু তিনি ঢাকাতেই আছেন এবং জনতার মধ্যে থাকিয়া পথের পাশ হইতে সহকর্ম্মী ও সহযাত্রীদের নীরব অভিনন্দন জানান। কতখানি মানসিক দৃঢ়তা থাকিলে এরূপ আচরণ সম্ভব তাহা কল্পনা করাও দুঃসাধ্য।

সাটির পাড়া স্কুলের সম্পাদক ত্রৈলোক্যনাথের কল্যাণকামী স্নেহবৎসল ললিতমোহন রায়ও এই মামলার আসামী। ত্রৈলোক্যনাথকে একদিন চলার পথে জনতার মধ্যে দেখিতে পাইয়া আপনি আপনি স্বগত-উক্তি করিলেন—"মরতে এসেছ?"

কেহ বুঝিল না, কিন্তু যিনি বুঝিবার তিনি ঠিক বুঝিলেন, আর পথের পাশে দাঁড়ান নাই।

বহুদিন ধরিয়া বিচার চলিতেছে, নিম্ন আদালতে প্রত্যহই উত্তেজনা, নানা সাক্ষ্য, নানা সংলাপ।

আদালতের বাহিরে নানা পসারী নানা দ্রব্য সম্ভার লইয়া বসিয়া আছে; চলিতে ফিরিতে আদালত-আগত জনতার দল টুকিটাকি খাদ্যাদি কিনিতেছে—দলে উপদলে বিভক্ত জনতা নানাকথাই কহিতেছে।

এক গ্রাম্যচাষী ডাব বিক্রয় করিতেছে। কৃষ্ণকায় দীর্ঘদেহী তাঁতের লাল গামছাটা মাথায় বেড় করিয়া বাঁধা। নানাজন

আসিতেছে—নানা কথা কহিতেছে, নির্ব্বাক পসারী গ্রাম্য চোখে দেখিতেছে ও শুনিতেছে ; হাতের কাটারী কচাকচ্ করিয়া ডাব কাটিয়া চলিতেছে—খরিদ্দারের হাতে তুলিয়া দিয়া পয়সা বুঝিয়া লইতেছে। আদালতের অভ্যন্তরে আসামীদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগ পঞ্জীভূত হইতেছে। অন্যতম আসামীকে পুলিশ আজও খুঁজিয়া পায় নাই কিন্তু ত্রৈলোক্যনাথ পরম প্রশান্তিতে হাকিমের এজলাসের চৌহিদ্দীর ভিতরই ডাব বিক্রয় করিয়া চলিয়াছেন। সময় সময় বাস্তব কল্পনাকেও হার মানায়।

সঙ্ঘগুরু ব্যারিষ্টার পি, মিত্র তখনও জীবিত এবং মামলায় অংশ গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক থাকিলেও শারীরিক অপটুতা হেতু প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহণ করিতে সক্ষম হইলেন না। তাঁহার কল্পনালব্ধ যে আদর্শ-বীজ তিনি জনমানসে রোপণ করিয়াছিলেন তাহা আজ বাস্তবে শাখাপ্রশাখায় সমৃদ্ধ হইয়া প্রাণবন্ত ও ফলশালিনী হইয়া উঠিয়াছে। প্রমথনাথ পরিপূর্ণ তৃপ্তিতে কিছুকালের মধ্যেই পরলোক গমন করিলেন।

চিত্তরঞ্জন দাশের প্রদীপ্ত প্রতিভা, কুশাগ্রবুদ্ধি, অসিক্ষুরধার বাগ্মীতা "আলিপুর ষড়যন্ত্র" মামলার পরিপ্রেক্ষিতে সমুদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। তিনি আইনজীবীদের প্রধানরূপে ঢাকায় আসিয়া এই ষড়যন্ত্র মামলায় আসামীদের পক্ষ সমর্থন করিলেন।

নিম্ন আদালত হইতে জজকোর্টে ও জজকোর্ট হইতে হাইকোর্ট, দীর্ঘ দুই বৎসর ধরিয়া এই ষড়যন্ত্র মামলা চলিল। ত্রৈলোক্যনাথ আরও দুর্দ্ধর্ষ ও সক্রিয় হইয়া উঠিলেন। রাজশক্তিকে আঘাতের পর আঘাত হানিয়া ব্যতিব্যস্ত ও সন্ত্রস্ত করিয়া তুলিলেন।

পুলিন দাসের গ্রেপ্তারের পর যখন নেতৃত্ব মাখন সেনের উপর ন্যস্ত হইল তাহার কিছু পরেই সহযোগীদের মধ্যে বিভ্রান্তির প্রকাশ হইতে লাগিল। মাখন সেন পথের উপর বেশী শ্রদ্ধাবান। লক্ষ্যের

উপর নয়। পথ যদি আদর্শ নিষ্ঠ না হয় ত লক্ষ্য-অর্জ্জন ব্যর্থ। ভবিষ্যতে মহাত্মা গান্ধীর রাজনৈতিক জীবনেও এই দৃষ্টিভঙ্গী প্রকট হইয়া উঠিয়াছিল। তাই ডাকাতি ও রাজনৈতিক হত্যা সর্ব্বাধিনায়ক মাখন সেনের ঠিক মনঃপূত হইতে ছিল না। জিতেশচন্দ্র লাহিড়ীর 'নমামি' গ্রন্থে সেই দিনের ছবিটি পরিষ্কার ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

"একদিন সকলের সাম্‌নে মাখনবাবু স্পষ্টভাবে বললেন—আমরা চাই দেশের মুক্তি। আমাদের হতে হবে আদর্শ সন্ন্যাসী। খুন ডাকাতির রাজনীতি যদি আশ্রয় করি—এই নৈতিক অপরাধেই সব আয়োজন ব্যর্থ হয়ে যাবে। দেশের লোকও আমাদের খুনী ডাকাত বলে জানবে। তাদের সমর্থন হারাব আমরা।

মাখনবাবুর কথা শেষ হতে পেল না একটা কৃষ্ণকায় যুবক মাঝপথে প্রতিবাদ জানাল। শান্ত অথচ দৃঢ়কণ্ঠে বলল—আমি একটা কথা জিগাই। পুলিনবাবু যখন নিজের যথাসর্ব্বস্ব এমন কি স্ত্রীর গহনা পর্য্যন্ত বেইচ্যা সমিতির কাজ চালাইলেন তখন সকলেই তেনারে বাহবা দিলেন—আমাদের ভিক্ষার ঝুলিতে বিশেষ কিছু দেন নাই। তাই না শেষে বাধ্য হইয়া পুলিনবাবু ডাকাতির পথ লইছিলেন। আমার মনে হয় ভিক্ষায় চল্‌তে পারে রামকৃষ্ণমিশন, বিপ্লবের আয়োজন চলে না।"

Pindrop Silence!

মাখনবাবু বললেন,—নীতির কথা না হয় বাদ দিলাম। কিন্তু ডাকাতিতে কি আমরা জনসাধারণের সহানুভূতি হারাব না! 'না হারাইতাম্ না'—উত্তর দিল যুবকটী, 'আমরা জানি খুন ডাকাতি আমাগো লক্ষ্য নয়। ইয়ার লাইগা পুলিশ আমাগো পিছনে লাগ্‌ব সেও জানি, কিন্তু করুম কি? কে দিবো আমাগো টাকা? জনসাধারণের সমর্থন হারাইবার ভয় মিছাই করি। কারণ ধনী, জমিদার,

মহাজন—যাগো বাড়ী আমরা ডাকা দিমু--তাগো গরীব জন-সাধারণ ভাল চক্ষে হ্যাখেনা। তাগো লুট্‌লে সাধারণ খুসীই হইব। আর খুনের কথা কন। আমাগো পথে যারা বাধা স্বষ্টি কোরব—তাগো সরাইতে হইবে। আরো যে সব কর্মচারী অত্যাচারে অত্যাচারে জনসাধারণে তাতাইয়া তুলেছে—তাগো সরাইলে সকলের সমর্থনও পামু প্রচার ও হইব।

চাপা গুঞ্জন ধ্বনি দ্বারা বেশীর ভাগ কর্ম্মীর হৃষ্ট সমর্থন লাভ করিল নরেন সেনের উক্তি। সকলে নীরবে চেয়ে দেখল এই যুবকটীকে যার কণ্ঠে নেতার আচরণের প্রতিবাদ মুখর হয়ে উঠেছে। এইবার ফিস্‌ফাস করে প্রচারিত হল যুবকটীর পরিচয়—সরকারী কর্ম্মচারী জবরদস্ত ডেপুটী ইন্‌সপেক্টর অব স্কুলস প্রভাত সেনের পুত্র, ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ কে. জি. গুপ্তের ভাগ্‌নে ঢাকার নরেন সেন।”

মাখন বাবু নেতৃত্ব পদ হইতে সরিয়া গেলেন, সাথে লইলেন শ্রীসতীশ দাসগুপ্ত, শ্রীপ্রিয় দাসগুপ্ত, শ্রীদীনেশ মুস্তফী ও শ্রীনগেন সরকার।

নরেন্দ্রমোহন সেন তাহার সহকর্ম্মী ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্ত্তী, প্রতুল গাঙ্গুলী, বীরেন চৌধুরী, রমেশ আচার্য্য, জ্ঞান মজুমদার, রবি সেন, মদন ভৌমিক, নগেন দত্ত, যতীন রায় (ফেগু রায়) যোগেন চক্রবর্ত্তী, অমৃত সরকার প্রভৃতিকে লইয়া দলটীকে সুসংহত ও সুসংবদ্ধ করিতে লাগিলেন। নরেন্দ্রমোহন সহযাত্রী ও সহযোগীদের সঙ্গে একমত হইয়া স্থির করিলেন ডাকাতি শুধু চালাইতে হইবে নয় বাড়াইতে হইবে এবং যাহারা পথের বাধা হইয়া দাঁড়াইবে—তাহাদের সরাইয়া ফেলিতে হইবে। কোন বিচার বিবেচনা দয়া মায়ার প্রশ্ন অবাস্তব। পুলিশের দেশীয় কর্ম্মচারী বিদেশী শাসক কিম্বা সমাজের কলঙ্ক কাহাকেও নিস্তার দেওয়া চলিবে না। অগ্নিগর্ভ ত্রৈলোক্যনাথ অগ্নুদগার সুরু করিলেন।

১৯১০ খ্রীষ্টাব্দের ২১শে জুলাই ময়মনসিংহ জেলার গোলকপুরে জমিদারের বন্দুক লুণ্ঠিত হইল।

৩০শে সেপ্টেম্বর ঢাকা জেলার লৌহজঙ্গ থানাব হলদিয়াহাটে ডাকাতি হইয়া গেল। ৭ই নভেম্বর ফরিদপুব জেলার ভেদরগঞ্জ থানার অন্তর্গত কলারগাঁওতে ডাকাতি হইল। ৩০শে নভেম্বর—বাখবগঞ্জ জেলার মেহেন্দিগঞ্জ থানাব দাদপুবে ডাকাতি অনুষ্ঠিত হইল।

১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের ২১শে জানুযায়ী ঢাকা জেলার সোনারঙে পোষ্ট অফিসের পিয়নের উপব আক্রমণ হইল। তারপর ৫ই ফেব্রুয়ারী ফরিদপুর জেলার পণ্ডিতসারে ও ২০শে ফেব্রুয়ারী ঢাকা জেলার লৌহজঙ্গ থানাব গাঁওদিযা গ্রামে ডাকাতি অনুষ্ঠিত হইল। ৩১শে মার্চ্চ ময়মনসিংহ জেলাব মাদাবগঞ্জ থানার সুয়াকৈরাতে ডাকাতি হইল। ২২শে এপ্রিল বাখবগঞ্জেব লক্ষণকাটিতে ও ৩০শে এপ্রিল ময়মনসিংহেব চরশসায় এবং এই মাসেই ত্রিপুরা জেলার বারকান্তায় পরপর ডাকাতি হইতে থাকে। ১৭ই জুলাই ময়মনসিংহ জেলায় বাজিতপুর থানার সারাচরে ডাকাতি ও ৫ই সেপ্টেম্বর ঢাকার মাণিকগঞ্জ থানাব সিঙ্গইব বাজাব লুণ্ঠিত হয। ৩রা অক্টোবর ময়মনসিংহের বাজিতপুর থানার কুলিয়াচব বাজাবে ডাকাতি হয়। ৬ই নভেম্বর রংপুরে বালিয়া গ্রামে ও ৩০শে ডিসেম্বব নোয়াখালীর চৌপল্লীতে ডাকাতি হইয়া গেল।

১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের অধিকাংশ ঘটনাই পূর্ববঙ্গে ঘটে। ঢাকা ষড়যন্ত্র মামলাকে উপহাস করিতেই যেন বিপ্লবীদের মৃত্যুপণ অভিলাব।

সাথে সাথে রাজনৈতিক হত্যাও চলিতে থাকে। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে ১০ই এপ্রিল ঢাকা রাউৎভোগে মনোমোহন দে নিহত হয়। মনোমোহন ঢাকা ষড়যন্ত্র মামলা ও মুন্সীগঞ্জ বোমা মামলায় একজন অন্যতম সাক্ষী।

১৯শে জুন ময়মনসিংহ সহরে পুলিশ সাব ইনস্‌পেক্টর রাজকুমার নিহত হয়।

১১ই জুলাই ঢাকা সোনাবঙে তিনজনকে হত্যা করা হয়। ১১ই ডিসেম্বর ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দ—বাজকীয় ঘোষণা প্রচাবিত হইল। বঙ্গ ভঙ্গ রদ হইয়াছে। পূর্ব বাঙলা ও পশ্চিম বাঙলা মিলিতভাবে আবার একটী প্রদেশ হইল।

১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবব মাসে যাহার সূচনা ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে তাহার আকাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন হইল। ইতিহাসেব নির্মম পরিহাসে স্থির নিশ্চিত ব্যাপাব ভণ্ডুল হইয়া গেল। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের দৃপ্ত জয় যাত্রাব এই বোধ হয় প্রথম পদস্খলন হইল। ঘড়ির কাঁটা পিছনে ঘুবিল সৌভাগ্য-সূর্য্য বক্র-পথ গ্রহণ করিল। —'হাকিম নড়ে তো হুকুম নড়ে না' ইংরাজের এই স্পর্দ্ধিত উক্তির এইবার ব্যত্যয় ঘটিল। হাকিম অনেক নড়িয়াছে হুকুম এইবাব প্রথম নড়িল।

এতদিনে গঙ্গা-পদ্মার সম্মিলিত জল-ধাবা বহু বিবর্ত্তনে বহু দূর চলিয়া গিয়াছে। হীনম্মন্য স্থাণু গণমানস নব প্রেরণায় আত্মচেতনা ও প্রত্যয় ফিরিয়া পাইয়াছে।

এই দিনই বিপ্লবীরা বিজয়োৎসব পালন করিলেন—বরিশালে পুলিশ ইন্‌সপেক্টব মনোমোহন ঘোষকে হত্যা করিয়া; মনোমোহন ঘোষ ঢাকা ষড়যন্ত্র মামলার একজন বিশিষ্ট সরকারী সাক্ষী। বিপ্লবীদের রুদ্র রোষ তখন দুর্নিবার, অপ্রতিরোধ্য ও নির্মম।

পরের বৎসর ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে জানুয়ারী ঢাকায় বাইগুণ টেওয়ারীতে, ২১শে ফেব্রুয়ারী ঢাকা জেলায় ঘিয়র থানার আইন-পুরে, ১৭ই এপ্রিল বাখরগঞ্জের কুসঙ্গলে, ১৯শে এপ্রিল এই জেলার মেহেন্দীগঞ্জ থানার কাকুরিয়াতে ও ২৩শে মে বিরঙ্গলে পরপর

ডাকাতি হইতে থাকে। পথের যাহারা বাধা তাহাদের উপরও নির্ম্মম মৃত্যুদণ্ড দানের ব্যবস্থা হয়।

১৯১২ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে ফেণীতে সাবদা চক্রবর্ত্তীকে হত্যা করা হয়। ১১ই জুলাই ঢাকা জেলার নাবায়ণগঞ্জ থানার পানামে ও ১৫ই জুলাই বাখরগঞ্জ জেলাব প্রতাপপুবে ডাকাতি হইল। ২৪শে সেপ্টেম্বর ঢাকায় গোযালনগরে হেড্ কন্‌স্টেবল রতিলাল রায়কে হত্যা করা হয়। এই হত্যাকে কেন্দ্র করিয়া যে অনুসন্ধান চলে তাহাতে ত্রৈলোক্যনাথ ধৃত হন। এতদিন আত্মগোপনকারী ত্রৈলোক্যনাথ নানা নামে নানা বেশে তাঁহাব বিপ্লবী কর্ম্ম প্রচেষ্টা নির্ভীক ভাবে চালাইতেছিলেন। এইবার কিছু দিনের জন্য ছেদ পড়িল। ঢাকা ষড়যন্ত্র মামলাব অভীষ্ট ফল যে ইংবেজ শাসকের মিলে নাই তাহা বাউলাট কমিটির প্রতিবেদনেই নথীভুক্ত হইয়া আছে।

Unfortunately the prosecution had no effect in reducing the political crime in this District probably because the conspirators and associated organisations were too numerous and the net of the prosecution had not been cast far enough.



খাল বিল ছোট বড় নদ নদী বিধৌত পূর্ব বাঙলা নদীমাতৃক। নদী পথই দেশের সকল অঞ্চলে, দূরতম গ্রাম গ্রামান্তরে যাইবার পক্ষে প্রশস্ত। স্থলপথ সীমিত ও পদে পদে বিঘ্নিত। জলপথই চলাচলের, ব্যবসা বাণিজ্যের অন্যতম পথ বলিয়া ছোট বড় সহর, গঞ্জ ও বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম বেশীব ভাগ নদীর তীরে তীরেই অবস্থিত; তাই জমিদার, মহাজন ছোট বড় ব্যবসায়ী এবং ধনিক সম্প্রদায়ের গৃহ ও গদি কোন না কোন নদীর ধারেই বিদ্যমান।

পূর্ব্ব বাঙলায় স্থলপথ হইতে নদীপথেই ডাকাতি সহজ সাধ্য। জল পথের সম্যক জ্ঞান থাকিলে পুলিশেব সহিত লুকোচুরি সহজেই চলে, বড় নদী হইতে ছোট নদী ও ছোট নদী হইতে জানা অজানা অসংখ্য খাল বিলেব মধ্য দিয়া নিমেষে অদৃশ্য হইবার সম্ভাবনাও প্রচুর।

নদী পথে ডাকাতির বাস্তবতা ও সুবিধা স্বীকৃত হইল—ত্রৈলোক্য নাথ মাঝির ভূমিকা লইলেন। মাঝির বেশে আত্মগোপন করিয়া থাকার বিশেষ সুবিধা। মাঝি হইয়া নৌকা লইয়া ঘাটে ঘাটে ঘোরা চলে; হাটে হাটে জনতার সঙ্গ মিলে, নানা খবর নানা লোকের মুখে মুখে কানাকানি হয়। আত্মগোপন করিয়া সুদূরতম প্রান্তে লুকাইলেও ধরা পড়িবার সম্ভাবনা থাকিয়া যায়। গ্রামের অভ্যন্তরে অচেনা ভিন্ন দেশের লোক সাধারণতঃ জনসাধারণের মনে সন্দেহ জাগায়। নৌকায় ইহার বালাই নাই। সবাই জানে মাঝি—ঘাটে ঘাটে ঘোরাই তাহার পেশা; লোকজন মালপত্র বহন করাই নিত্য কর্ম্ম; গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে, এক জেলা হইতে অন্য জেলায় নদীর গতি ধরিয়া তাহার যাতায়াত। কেহ মাঝিকে প্রশ্ন করে না, কোথায় তাহার ঘর। প্রশ্ন হয়—কোথায় যাইবে।

প্রয়োজনে এই নৌকাই রাতের অন্ধকারে বিপ্লবী যাত্রীতে ভরিয়া উঠে, আগ্নেয়াস্ত্র বাহিত হয়। লুণ্ঠিত দ্রব্য বিনা দ্বিধায় রাখা

চলে। আর মাঝি যখন নিজেই বিপ্লবী নায়ক তখন মাঝির অভিনয় ছাড়িয়া Action-এর নায়ক নিমেষেই হওয়া চলে। তাই পদ্মা মেঘনা ধলেশ্বরীর বুকে আমরা এক নূতন মাঝিকে পাইলাম—নাম কালীচরণ।

পুলিশের চোখের সম্মুখে তাহার যাতায়াত; পুলিশের ষ্টীম লঞ্চের সঙ্গে তাহার নিত্য সাক্ষাৎ। বহুবার মাঝিকে জল পুলিশের বহু প্রশ্নের সম্মুখীন হইতে হইয়াছে তবুও পুলিশের দল ঘুণাক্ষরেও সন্দেহ করিতে পারে নাই, তাহাদের নিত্য-সন্ধানী দৃষ্টি কোন ক্রমে অনুমান করিতে পারে নাই—এই নিরীহ নমঃশূদ্র মাঝি তাহাদের দীর্ঘ দিনের আকাঙ্ক্ষিত পলাতক ত্রৈলোক্যনাথ।

নয়ন সম্মুখে সর্ব্বদা থাকেন বলিয়াই তিনি নয়নের বাহিরে চলিয়া যান। কালীচবণ মাঝি পূর্ব্ব বাঙলায় নদী পরিক্রমায় এক উপকথা।

ঘটনা স্রোত ও তাহার বিবরণ যখন লিপিবদ্ধ হইয়া বিদগ্ধ সমাজে পঠিত হয় তখন তাহা ইতিহাস। কিন্তু ঘটনার চমৎকারিত্ব ও তাহার বিববণ যখন সাধাবণ মানুষের মুখে মুখে ফিরিয়া জন সমাজের মনে আপনা আপনি গাঁথিয়া যায় তখনই তাহা উপকথা। তাই কালীচরণ মাঝির কাহিনী পদ্মা যমুনা ধলেশ্বরী বুড়ীগঙ্গা মেঘনা প্রবাহিত পূর্ব্ব বাঙলার বুকে এক রোমাঞ্চকর উপকথা।

ঘাসী নৌকার মাঝি নাম জিজ্ঞাসা করিলে অন্ত্যজ জাতির আড়ষ্ট টানে বলে—খালীচরণ। জাতি জিজ্ঞাসা কবিলে বলিবে—নমামি। সেটা আবার কোন জাত? প্রথম উত্তরে সবাই বুঝিতে পারে না। পরে বুঝিতে পারে নমঃ আমি; কালীচরণের দ্রুত উচ্চারণে ও গ্রাম্য টানে 'নমামি' হইয়া গিয়াছে। অর্থাৎ জাতিতে নমঃশূদ্র; সমাজের দৃষ্টিতে অন্ত্যজ অস্পৃশ্য কিন্তু ত্রৈলোক্যনাথ পরোক্ষে জানাইয়া দেন আমি সেই জাতি যে জাতিকে আমি প্রণাম করি।

কালীচরণ তাহার নিজের ভাষায় বুঝাইয়া দেয়—"আইগ্যা খরতা! মোরা ছোট জাত। হইলাম গিয়া নমঃ।"

মাঝির আর একটা সাথী আছে; দুজনে মিলিয়া নৌকায় থাকে, নৌকায় চলে, মাঝির কাজ করে, ঘাটে ঘাটে ফেরে।

ত্রৈলোক্যনাথের সাথী বিপ্লবী বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। গৌরবর্ণ রাজপুত্রের মত চেহারা জলে রাত্রি দিন কাটাইয়া, বৃষ্টিতে ভিজিয়া ও রৌদ্রে পুড়িয়া তাঁহার চেহারাও মাঝির মতন হইয়া গিয়াছিল। দুজনকে দেখিলে সন্দেহ হইবার উপায় নাই যে ইহারা জাতমাঝি নহেন। মাঝিরা যেভাবে বসবাস করে ইহারাও ঠিক একই ভাবে জীবন যাপনে অভ্যস্ত। মাটির শানকিতে ভাত খাওয়া হইতে দাকাটা কড়া তামাক খাওয়া পর্য্যন্ত অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে। মাঝি পূর্ববঙ্গের সমস্ত বড় বড় নদীতে নৌকা বাহিয়াছেন, বর্ষাকালে ঝড়-বৃষ্টির দিনে পদ্মা পাড়ি দিয়াছেন, মেঘাবৃত আকাশের তলে প্রমত্তা মেঘনার উত্তাল তরঙ্গের মাথায় দুর্দ্দম সাহসে হালের বৈঠা ধরিয়াছেন। ঢাকা হইতে বরিশাল নোয়াখালি পাড়ি দিয়াছেন, জাহাজের সঙ্গে পাল্লা দিয়া নৌকা বাহিয়াছেন।

নদী পরিক্রমায় পুলিশের হাতে বহুবার পড়িতে হইয়াছে—কিন্তু পুলিশের দল সাধারণ গ্রাম্য মাঝি ভাবিয়া ছাড়িয়া দিয়াছেন। একবার মাণিকগঞ্জে নৌকা-যোগে ডাকাতির পর ত্রৈলোক্যনাথ তাঁহার ঘাসী নৌকায় বিপ্লবীদের ও লুণ্ঠিত দ্রব্যাদি লইয়া ঢাকায় ফিরিতেছেন। যদিও নির্দ্দিষ্টদল নির্দ্দেশমত টেলিগ্রাফের তার কাটিয়া দিয়াছিল, তবুও ফিরিবার সময় মনে হইল কোথায় যেন গণ্ডগোল হইয়া গিয়াছে। ঢাকা সহরের চারিদিকে পুলিশের সতর্ক দৃষ্টি। ডাকাতির সংবাদ ঢাকায় পৌছিয়া গিয়াছে। নদীর পাড়ে পাড়ে সশস্ত্র পুলিশের কড়া পাহারা। নির্ব্বিকার চিত্তে শেষরাত্রে কালীচরণ তাঁহার ঘাসী নৌকা লইয়া ঢাকা সহরের সদরঘাটে

আসিয়া ভিড়িল। নৌকার ভিতর যাত্রীর বেশে বিপ্লবীর দল, সঙ্গে আগ্নেয়াস্ত্র ও লুণ্ঠিত অর্থ।

পুলিশ হুকুম দিল নৌকা হইতে কেহই ডাঙায় উঠিতে পারিবে না, প্রাতে নৌকা তল্লাসী হইবে। পুলিশের প্রশ্ন—নৌকা কোথা হইতে আসিয়াছে? নির্ব্বিকার ও নির্ভীক মাঝি উত্তর দেয়—আইগ্যা গয়নাব নৌকা।

এক নিরীহ যাত্রী সাশ্রু নেত্রে পুলিশকে জানাইল তাহার মা মৃত্যুশয্যায় এখনই ডাক্তাবেব বাড়ী যাইয়া প্রাতঃকালেই ডাক্তার লইয়া না গেলে মাতার মৃত্যু অবধারিত। ১৫ টাকা দক্ষিণাব বিনিময়ে যাত্রীটির ও তাহাব সঙ্গীদের যাইবাব আদেশ মিলিল, পডিয়া বহিল কালীচরণ মাঝি ও তাহার দুই জন অনুচর। সকালবেলা পুলিশেব দল নৌকায় তল্লাসী চালাইল—কোন ডাকাতেবই সন্ধান মিলিল না, লুণ্ঠিত অর্থ অথবা আগ্নেয়াস্ত্র কিছুরই সন্ধান মিলিল না। কালীচরণ পরম পরিতৃপ্তিব সহিত হুকা টানিয়া চলে।

নদীপথে ডাকাতির সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাওয়ায় স্বদেশী ডাকাত ধরিবার জন্য জল-পুলিশের প্রচুর ব্যবস্থা হইল। ঘাটে ঘাটে জলপুলিশেব আড্ডা বসিল, পুলিশ প্রত্যেক নৌকা থামাইয়া তল্লাসী সুরু করিল। পুলিশ লঞ্চ সর্ব্বদাই টহল দিয়া চলে, নৌকা থামায়, জিজ্ঞাসাবাদ করে, প্রয়োজন হইলে তল্লাসী চালায়। মাঝ দরিয়ায়ও স্বস্তি নাই। ত্রৈলোক্যনাথকে প্রায়শঃই জল-পুলিশের আড্ডার নিকট দিয়া যাইতে হইত; পদে পদে পুলিশের সান্নিধ্য ঘটে। ঘাসী নৌকার উপর পুলিশের বড় নজর—তাই কালীচরণ নিজের ঘাসী নৌকায় সদাজাগ্রত থাকে। এক দিনের একটি কাহিনী ত্রৈলোক্যনাথ বর্ণনা করিয়াছেন। "এক যাত্রায় আমাদের নৌকা এক বাজারে লাগাইয়াছি, ঘাসী নৌকা দেখিয়া কিছু লোকের সন্দেহ

হইয়াছে, আমাকে থানায় ডাকিয়া লইয়া গেল। আমি দারোগা-বাবুর সকল প্রশ্নের জবাব দিলাম; আমার কথাবার্ত্তা চালচলনে কাহারও কোন সন্দেহ হইল না। দারোগাবাবুর মফস্বলে এক তদন্তে যাওয়ার কথা ছিল। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি যাইতে রাজী আছি কিনা। আমি বলি—কেরায়া বাই, রাজী হমু না কেন? আমার নৌকা খালি ছিল। আমি রাজি হইলাম, রাজি না হইয়া উপায় নাই। তৎক্ষণাৎ সন্দেহ করিবে। আমাকে সন্দেহক্রমে আটক করিয়া যদি আমার বাড়ী-ঘরের অনুসন্ধান করে তবে সেই গ্রামে সেই নামের কোন লোক পাইবে না, আমার স্বরূপ প্রকাশ হইয়া পড়িবে।"

ত্রৈলোক্যনাথ তখন ঢাকা ষড়যন্ত্র মামলার পলাতক আসামী। ধরিবার জন্য পুরস্কার ঘোষিত হইয়াছে। আর একটা সোনালী আশা ত্রৈলোক্যনাথের হৃদয়ে উঁকি দেয়—দারোগা যাবেন সঙ্গে কনষ্টেবল যাবে, সঙ্গে তাহাদের বন্দুক থাকিবে। হাতের মুঠায় আগ্নেয়াস্ত্রের মালিকানা লাভের সম্ভাবনা ত্রৈলোক্যনাথকে উৎসাহিত করিয়া তোলে। ঘটনাক্রমে দারোগাবাবুর যাওয়া হইল না। কালীচরণ মাঝি আপনমনে হাট করিয়া নৌকা লইয়া পাড়ি জমাইল।

কালীচরণ মাঝি যে ত্রৈলোক্যনাথ এ-কথাটা সেদিন অন্যতম বিপ্লবী নেতারাও অনেকে জানিতেন না। একবার বিশিষ্ট বিপ্লবী আশুতোষ কাহালী ঢাকা অনুশীলনের সর্ব্বাধিনায়ক মাখন সেন মহাশয়ের কাছে অনুযোগ করিলেন, নৌকায় এক নমঃশূদ্র মাঝি জুটান হইয়াছে এবং তাহাকে নরেন সেন প্রভৃতি অনেকেই অত্যন্ত বিশ্বাস করে। মাখনবাবুও রাগান্বিত হন, কারণ বিপ্লবীদের অভিযানে একজন সাধারণ মাঝিকে সঙ্গে রাখা মন্ত্রগুপ্তির পরিপন্থী। পরে অবশ্য তাঁহারা কালীচরণের আসল পরিচয় জানিতে পারেন।

শ্রীনলিনীকিশোর গুহ তাঁহার 'বাংলায় বিপ্লববাদ' গ্রন্থে নৌকা যোগে ডাকাতির যে চিত্র তুলিয়া ধরিয়াছেন তাহা হইতে জানা যায় "নির্দ্দিষ্ট দিনে ও সময়ে পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট নদীর তীরে, নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক লোক আসিয়া নীরবে নৌকায় উঠিল। মাঝি মাল্লা সবাই ঠিক। স্থানে স্থানে পুর্ব্ব-নির্ধারিত স্থানে দুচারজন আসিয়া নৌকায় উঠিতে লাগিল। এমনই করিয়া কখনও সোজা কখনও বক্র গতিতে অবিশ্রান্ত ভাবে মাঝি নৌকা বাহিয়া চলিল। বলাবাহুল্য মাঝি মাল্লারা সকলেই বিপ্লববাদী। ইহাদের আকৃতি প্রকৃতি কথার ভঙ্গী মাঝি মাল্লাদেরই মত। জীবনে যে তামাক খায় না, সেও নৌকায় মাঝি সাজিয়া সাধারণ মাঝিদের মতই তামাক খাওয়ার নিপুণ অভিনয় করিতেছে। স্থানে স্থানে বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর মাঝি-মাল্লারাই দিতেছে। উত্তরদাতা ও প্রশ্নকর্ত্তা আগের থেকেই নির্দ্দিষ্ট হইয়া আছে। বিপ্লবকারীদের মধ্যেই জনকয়েক যাত্রী হইয়া বসিয়াছে। নদীতে জল পুলিশ রহিয়াছে, মোড়ে মোড়ে নৌকায় তাহাদের ঘাঁটি। সেখানে পুলিশের লঞ্চ নিয়ত ঘুরিয়া ঘুরিয়া পরিদর্শন করিতেছে। মোড়ে মোড়ে নৌকায় তল্লাসী হইতেছে। নৌকায় স্ত্রীলোক থাকিলেও রেহাই নাই। তারপর কোন নৌকা মোড়ে না আসিয়া অপর দিক দিয়া যাইতেছে দেখিলে তাহা থামান হইত, তল্লাস করা হইত, নামধাম লেখা হইত। এই সমস্ত বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া অস্ত্রশস্ত্র সমেত আটদশ দিনে (কখনও তাহা হইতেও বেশী) এই নৌকা পথেই বিপ্লবীরা গন্তব্যস্থলে গিয়া পৌঁছিত।

ডাকাতি করিতে যাওয়ার মুখে বরং কষ্ট ছিল কম, কিন্তু ফিরিবার মুখে কষ্ট সহিতে হইত অধিক। কারণ তখন একদিকে যাইত অর্থ; একদিকে যাইত অস্ত্র আর নদীপথে যাইত বিপ্লবীরা। কিন্তু ডাকাতি করার পর চারিদিকে সতর্ক জলপুলিশ ও স্থল পুলিশের

সম্মুখে পড়ার আশঙ্কা থাকিত। তাহাদের দৃষ্টি এড়াইয়া অর্থ ও অস্ত্রশস্ত্র ও মানুষ নির্ব্বিঘ্নে নির্দ্দিষ্ট স্থানে আনিতে অনেক কৌশল অনেক শৃঙ্খলার প্রয়োজন হইত। ঘড়ির কাঁটা ধরিয়া কাজ করার মত কাজ না করিলে, প্রত্যেকের নির্দ্দিষ্ট কাজ প্রত্যেকে না করিলে ধরা পড়িবার সম্ভাবনা খুবই ছিল।"

কালীচরণ মাঝি এই প্রক্রিয়ায় ছিলেন সিদ্ধহস্ত। মাঝি হইয়া নৌকা বাহিয়াছেন, পুলিশকে বোকা বানাইয়াছেন, বিপ্লবীদের নির্দ্দেশ দিয়াছেন, নৌকা আনিয়া নির্দ্দিষ্ট স্থানে ভিড়াইয়াছেন। নজরুলের লেখনীতে সেই অনুভূতির স্বাদ।

"দুলিতেছে তরী ফুলিতেছে জল ভুলিতেছে মাঝি পথ
ছিঁড়িয়াছে পাল কে ধরিবে হাল আছে কার হিম্মৎ।
কে আছ জোয়ান হও আগুয়ান হাঁকিছে ভবিষ্যৎ
এ তুফান ভারী দিতে হবে পাড়ি, নিতে হবে তরী পার।"

জিতেশচন্দ্রের 'নমামি' গ্রন্থে আমরা কালীচরণ মাঝির এক অনবদ্য ছবি দেখিতে পাই।

"দুর্য্যোগের রাত্রি। ঝড় আর বৃষ্টি সমানেই চলেছে। আঁধারে পথ তো দূরের কথা, সামনের মানুষ এমন কি নিজের হাত পর্য্যন্ত দেখা যায় না।

এই আঁধার ভরা বাদল-রাতে তিনজন যুবক চলেছে হাত ধরা-ধরি করে—অতি সন্তর্পণে। ...মাঝের যুবকটির দলীয় নাম বিমান। ঘর ছেড়ে এই প্রথম বেরিয়েছে সে ভীষণ দুর্য্যোগে, ভীষণতর অভিযানে। মন তার মেতে উঠেছে এক সর্ব্বনাশা নেশায়।... নির্দ্দিষ্ট সময়ের দশ মিনিট আগেই তারা পৌঁছে গেল ঘাটে। সারি-সারি কয়েকখানা নৌকা বাঁধা।

হেঁই মা-ঝি ঝি-ই-ই-কে আছ? হাঁক দিলেন সেজদা। 'আহেন-আহেন-কর্তা।—অন্ধকারে জবাব ভেসে আসে।

পা টিপে টিপে অতি সাবধানে তিনজন অগ্রসর হল নৌকার দিকে। নৌকায় আরও লোক ছিল।

আঁধারে জড়সড় হয়ে বস্‌ল আগন্তুক তিন জন। ঝড় বৃষ্টি কমে এলেও তখনও কিছুটা রয়েছে। তখনও নদী বিক্ষুব্ধ, আলোড়িত হচ্ছে ঢেউয়ে ঢেউয়ে। একটা আস্ফালন একটানা গর্জ্জন করে চলেছে যেন এক বিশালকায় দৈত্য। এরই মাঝে নৌকা দিল ছেড়ে। ঢেউয়েরই তালে নাচ্‌তে নাচ্‌তে এগিয়ে চলে নৌকা। দাঁড়ে বসেছে তিনজন। একই তালে দাঁড় পড়ে ক্যাও ঝপ্‌ ক্যা—ও—ঝপ্‌।

বিমান হঠাৎ আবিষ্কার করল যে হাইলের মাঝিটি তার দিকে এক দৃষ্টে চেয়ে আছে। চোখে চোখ মিলতেই মাঝিটা চোখ ফিরিয়ে নিল।

বেলা বেড়েই চল্‌ল। নৌকার উপরেই টিনের তোলা উনুনে পাক চড়েছে। দুই কড়াই খিচুড়ি—মানে চাল আর ডালে এক-সাথে সেদ্ধ করে তাতে নুন দেওয়া হয়েছে। একটী নির্জ্জন স্থানে নৌকা ভিড়িয়ে স্নান সেরে সকলে খেয়ে নিল। আবার চল্‌ল নৌকা। সন্ধ্যার পর তারা পৌঁছুল মানিকতলার ঘাটে। ঘাটের উপরই প্রকাণ্ড বটগাছ। সেখানে নাকি ষাট হাজার ভূত প্রেত বাস করে। ফলে দিনের বেলাতেই পারত পক্ষে একাকী কেউ এধারে আসে না। গা তার ছম ছম করে।

রাত্রি প্রায় এগারোটা। দলের সাথে বিমানও হাফ্‌-প্যাণ্ট ও সার্ট পরে নৌকা ছেড়ে এগিয়ে চলে নিস্তব্ধ গ্রাম্য পথে। জান্‌ত সে, যে তারা সবাই চলেছে য্যাক্‌শানে। উত্তেজনায়, আশঙ্কায় তার বুকটা ঢিপ ঢিপ করে। বাঁশীর সঙ্কেতধ্বনির সাথে সাথেই যে যার নির্দ্দিষ্ট কাজে লেগে গেল। সে লক্ষ্য কর্‌ল, এই য়্যাক্‌শানের সর্ব্বাধিনায়ক এক কৃষ্ণকায় পাঞ্জাবী। মাথায় পাগ্‌ড়ী, প্রকাণ্ড

দাড়ি, চোখে চশমা, খাকির ট্রাউজার আর মিলিটারী সার্ট পরে সব কিছুরই তত্ত্বাবধান করছেন তিনি। সহসা একটী বাঁশীর আওয়াজ, সঙ্গে সঙ্গে গুড়ুম্, গুড়ুম্। উত্তেজনায় বিমান হারিয়ে ফেলে কর্ত্তব্যের নির্দ্দেশ, ছুটে যেতে চায় গেটের দিকে। হঠাৎ কে যেন তার হাত চেপে ধরে—কঠোর স্বরে আদেশ দেয়—ফিরে যাও অন্দরের ফটকে। অভিভূত বিমান চেয়ে দেখে সেই পাঞ্জাবী। কিন্তু এমন পরিষ্কার বাঙলা বলে সে। আশ্চর্য্য !

পর পর দুটী বাঁশীর শব্দ। একযোগে সকলে বেরিয়ে এল বাড়ী থেকে। বিমানের ব্যাচ্ যখন নদী তীরে পৌঁছল তখন গ্রামে ভীষণ সোরগোল। নৌকার ওপর থেকে কে যেন আদেশ দিল— "হেই চট্ পট্"।

ভোরের আলোর সাথে সাথেই সে চেয়ে দেখে মাঝির চোখ দুটী যেন তাকে গিল্‌ছে। কী কদাকার এই মাঝিটা। স্পাই না ত ?

একটী নির্জ্জন স্থানে স্নানাহারের জন্যে সকলে নেমে গেছে। বিমানের শরীরটা ভাল নেই; মাথাটা খুব ধরেছে। তাই সে নৌকাতেই রয়ে গেছে। আর রয়েছে 'কালীচরণ'।

মাঝি এবার বিমানের সাথে গল্প জুড়ে দিল। কৈ গেছিলেন আপনারা ? —জিজ্ঞাসা করে সে।

কি উত্তর দেবে বিমান। সে চুপ করে থাকে।

মাঝি নিজেই উত্তর দেয়—'ও—ও বিয়া বাড়ী বুঝি। বাজী পুড়াইন্যার আওয়াজ পাইলাম—আর হারা গাঁ জুইড়া কি হৈ চৈ খুব বড় ঘরের বিয়া বুঝি ?

বিমান লক্ষ্য করে যে মাঝি কথা বলে আর তার দিকে চেয়ে মুচকি মুচকি হাসে। আবার প্রশ্নের ধরণও এই প্রকার। কিছুক্ষণ পূর্ব্বে—এই মাঝিটার চাওয়ার ধরণ দেখে স্পাই বলে যে সন্দেহ

তার মনের কোণে জেগেছিল এবার সেটা আরও দৃঢ়তর হ'ল আর প্রশ্নের সুযোগ দেওয়া উচিত নয় বিবেচনায় বিমান হাই তুলে গা মোড়ামুড়ি করে শুয়ে পড়ল। সত্যিই তার গা গরম হয়েছিল—মাথাটাও বেশ ধরেছে। চোখ বুজে পড়ে রইল সে। হঠাৎ সে অনুভব করল মাঝিটা এসে তার কপালে হাত দিয়েছে। মাঝি ধীরে ধীরে তার কপাল টিপে আর চুলের মধ্যে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। তার মনে হ'ল কত যত্ন কত স্নেহ মাখানো রয়েছে মাঝির হাত দুটীতে, যেন স্নেহময়ী জননী হৃদয় ঢেলে পীড়িত সন্তানের সেবা করছেন শিয়রে বসে।"

জলপুলিশের সঙ্গে কালীচরণের লুকোচুরি খেলার ছবি এঁকেছেন জিতেশচন্দ্র।

"এই সব ডাকাতির ফলে পুলিশেব তৎপরতা বেড়ে গেছে অসম্ভব। পদ্মা, মেঘনা, ধলেশ্বরী, বুড়ীগঙ্গা নদীর স্থানে স্থানে লঞ্চে ও বোটে জল পুলিশের ঘাঁটি বসেছে। এদের প্রধান লক্ষ্য ছিল বড় বড় ঘাসী নৌকা—দেখেছে কি থামাবেই। একদিন কালীচরণ দু'জন সঙ্গীসহ জোর চালিয়েছে নৌকা। দূর থেকে সে দেখতে পেল জলপুলিশের ঘাঁটি। সেই সময় পাশ দিয়ে একখানা ষ্টীমারও যাচ্ছিল। ঢেউয়ের দোলায় দোল খাচ্ছিল নৌকাখানি। হাইলের মুঠি শক্ত করে ধরে কালীচরণ চেঁচিয়ে ওঠে—এই বীরা! এই সোৎস্যা!! তোরা দেখস কি? লাগা পাল্লা জাহাজের লগে' বলেই সে সবল হাতে হাইলের মুঠি ধরে ক্যাওড়া মারে আর মুখ বুঁজে শব্দ করে—উ—উ—হুঁ—উ—উ। নৌকার গলুই একবার ওঠে পাঁচ সাত হাত উঁচুতে, আবার পড়ে গহ্বরে—যেন ঢেউয়ের দোলায় নৌকাখানি জুড়ে দিয়েছে প্রলয় নাচন। তারি সাথে সাথে নেচে উঠছে কালীচরণের মন। শঙ্কা নেই, সংশয় নেই—যেন প্রলয়ের বুক চিরে ভ্রূক্ষেপহীন বেপরোয়া নিঃশঙ্ক চিত্তে ছোট্ট

নৌকাখানি নিয়ে স্থির লক্ষ্যে এগিয়ে চলেছে মাঝি কালীচরণ। বৃটিশের যান্ত্রিক জলযান নদীর বুকে তুলেছে উত্তাল তরঙ্গ—ঢেউয়ের পর ঢেউ, আঘাতের পর আঘাতে চুরমার করে দিতে চায় নৌকাখানি। কিন্তু কালীচরণের সবল হাতের কৌশলী চালনা এড়িয়ে চলেছে এই বিপর্য্যয়। নৌকা ডুবে ডুবে ডুবে না। আবার ওঠে ভেসে। আর মাঝি মাল্লা দাঁতে দাঁত চেপে ভ্রূকুঞ্চিত করে—আবার ওঠে হেসে।

একজন সিপাই চিৎকার করে উঠল্—এ-এ নাইয়া রোখো নাও।

বেপরোয়া কালীচরণ চাপা গলায় বলে—হুঁ, ইসে চালা জোরে।

এইবার পুলিশ লঞ্চ দিল ছেড়ে। দু'তিন জন পুলিশ হেঁকে বলে—রোখো রোখো। কালীচরণ এইবার নৌকা দিল থামিয়ে। পুলিশের আদেশ মত ধীরে ধীরে এগিয়ে চল্ল তীরের দিকে। ইতিমধ্যে লঞ্চখানি নৌকার কাছে চলে এসেছে। একজন সেপাই এগিয়ে এসে বল্ল—এ কারোয়া! কান্‌মে বাত্ নেহি যাতা? লঞ্চের সাথে নৌকাখানিও তীরে ভিড়ল্। একজন অফিসার হুকুম জানালেন—উত্‌রো উত্‌রো। সঙ্গীদ্বয় সহ কালীচরণ নেমে পড়ল নৌকা থেকে। তল্লাসী সুরু হ'ল। আপত্তিজনক কিছু পাওয়া গেল না নৌকায়। অফিসারটী জিজ্ঞাসা কর্‌লেন—মাঝি কে? কালীচরণ এগিয়ে মাথা নীচু করে সেলাম ঠুকে বল্‌লে—আমি খর্‌তা।

'কেন অত জোরে নৌকা চালিয়ে ছিলে?' প্রশ্ন করেন অফিসার।

একগাল হেসে কালীচরণ জবাব দেয়—'হে খরতা ইসে জাহাজের লগে বাইজ ধরছিলাম।'

'থামাও নি কেন ডাক শুনেও ?'

ধমকের চোটে চমকে ওঠে কালীচরণ। মুখ কাঁচুমাচু করে বলে—'শুনিনি হুজুর'।

'শুননি ? এইবার শুনিয়ে দিচ্ছি'—রহস্য করে বলেন অফিসার। সঙ্গে সঙ্গে চোখ মুখ খিঁচিয়ে বলেন--'শালা ডাকাত, দেখাচ্ছি মজাটা এই লে চল থানামে।'

'মাফ কর হুজুর, এই আমি কানমলা খাই। আর করুম্ না এমন কাজ। হুজুর, মা বাপ। আমার পোলাপান না খ্যাইয়া মর্‌বো। তাগো দ্যাখনের কেউ নাই। হামি হাপনার দুখানি ছরণ ধোবত্যাছি, আমাগো ছাইড়্যা দেন,' ভেউ ভেউ করে কেঁদে উঠল কালীচরণ। সাথে সাথে বীরা আর সোৎসুকা চোখে আঁচল দিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে। এই দেখে একটী বুড়ো সিপাহীর মনে দয়া হ'ল। বোধহয় বেচারার বালবাচ্চা ছিল। সে এগিয়ে এসে জমাদারবাবুকে বল্‌ল—এ বাবু সাহেব, ছোড়িয়ে ছোড়িয়ে ই লোক একদম গাঁওয়ার, বেয়াকুফ হ্যায়।

সাথীসহ কালীচরণ ছাড়া পেল। ভক্তিভরে মাটিতে পেন্নাম ঠুকে ফিরে গেল তার নৌকায়।"

বীরা ওরফে বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ত্রৈলোক্যনাথের সব কাজে নানা বিপদের সাথী। অপূর্ব্ব চেহারা, অদ্ভুত চরিত্র।

একবার বিক্রমপুর রাজবাড়ী হইতে ঢাকায় বীরেন্দ্রনাথ ও কয়েকজন বিপ্লবী বড় নৌকায় আসিতেছেন। পথে জলপুলিশের আড্ডা। নৌকায় অস্ত্রশস্ত্র। পুলিশকে এড়ান ছাড়া গত্তি নাই। মুহূর্ত্তে বীরেন্দ্রনাথ কার্য্য ধারা স্থির করিয়া ফেলিলেন। রাজবাড়ী হইতে একটা বড় কচ্ছপ (কাউটা) কিনিলেন। নৌকা চলিতেছে —অদূরে পুলিশের গ্রীন বোট। অমিতসাহস বীরেন্দ্রনাথ পলাইলেন না—গ্রীন বোট লক্ষ্য করিয়া নৌকা চালাইলেন।

সরাসরি জল-পুলিশের নৌকায় নিজের নৌকা ভিড়াইয়া ডাক ছাড়িলেন—বড়কর্ত্তা কই? বড় দারোগা ডাক শুনিয়া আগাইয়া আসেন। হয়ত বা চল্‌তি নৌকার কোন মাঝি কোন বা খবর জানাইয়া যায়। বীরেন প্রসন্ন মুখে প্রণাম সারিয়া জোড়হাতে নিবেদন করেন—"কর্তা এই কাউটাটা পাইলাম চরে। আমরা তখনই না ভাবলাম দারোগাবাবুরে দিয়া যাই। তাই আপনাগো বোট দেইখ্যা আইলাম।"

দারোগাবাবু মাঝির দক্ষিণাসমেত শ্রদ্ধায় আভিভূত; মহাখুসী হইয়া ওঠেন। দানগ্রহণে মাঝিকে কৃতার্থ করিয়া স্মিত হাস্য করিলেন। নৌকা তল্লাসী করা ও জিজ্ঞাসাবাদ করা যে প্রয়োজন সে কথা বিস্মবণ হইল। বেপরোয়া বীরেন্দ্রনাথ আবার প্রণাম করিয়া নৌকা ছাড়িয়া দিলেন।

নমামিতে বীরেন্দ্রনাথেব এই হাস্য মুখর ও বেপরোয়া চরিত্রটী অতি সুন্দর রূপে চিত্রিত হইয়াছে।

"ফরিদপুর জেলায় ঘরিসারে য়্যাকসানের প্ল্যান করা হয়েছে। এই সময় খবর পাওয়া গেল নদী থেকে বেরিয়ে যেখান দিয়ে নৌকা যাবে সেখানে জলপুলিশ মস্ত ঘাঁটি বসিয়েছে। এতদূর অগ্রসর হয়ে প্রশ্ন উঠল এই য়্যাক্‌শানে হাত দেওয়া হবে কিনা। বীরেন চাটার্জ্জী বল্‌ল, ফুঃ তোর জলপুলিশ! জলপুলিশরে জলসই করুম্। বাহ্বার লড়াই আবার হইব ভাবতেই আনন্দে মনডা আমার নাইচ্চা ওঠে। সামনেইত হোলি। জলের মধ্যে পুলিশের লগে হোলি খেলা খুব মজাদার লাগব। গান জুড়ে দেয় বীরেন—রঙমে কেইসে খেঁলু হুলিয়া পুলিশোয়াকে সঙ্। সকলে হেসে উঠল। গম্ভীর হলেন নরেন সেন। তিনি রবি সেনকে ডেকে বল্‌লেন—যে যে যাইব তাগো মত লও।"

হেসে বীরেন বলল—ইসে তাজ্জব বানাইলেন দেখ্‌ত্যাছি।



সামনে—ত্রৈলোক্যনাথ, পুলিনদাশ, নলিনীকিশোর গুহ
পেছনে—আশুতোষ কাহিলী, রবীন্দ্রমোহন সেন, বীরেন চট্টোপাধ্যায় (বীরা), যতীন রায় (ফেগু)



ডাকাতিতে গণতন্ত্র ভোটাভুটি! হে প্রভু যীশু টুমি হামাডের রক্ষা কব।' আবার সমবেত হাসি। নরেনবাবু কিন্তু অচল অটল। তিনি বল্‌লেন—সব কিছু কর্ম্ম যদি একমাত্র আমার মতেই হয় তা হইলে ত এগ্যাশে বাজতন্ত্র কায়েম হইব--আমি বাজা হমু গিয়া।

বীবেন এবার নাটকীয় ভঙ্গীতে বল্‌ল

হে আর্য্য! বিধিমতে জনমত কব নিরূপণ

নাহি তাহে বাধা

কিন্তু এই দীন সেবকেব আছে শুধু একটী বিধান

'দাদা আব গদা'।

"হে হে কবে সকলে হেসে উঠল। নরেনবাবু বিরক্ত হয়ে বল্‌লেন—থাম্ বীবা। পরক্ষণেই তিনি হেসে বল্‌লেন—পাজিডার উপব বাগ কবণও মুস্কিল, মুখ ভ্যাঙ্গায।"

এই বীরু, ত্রৈলোক্যনাথেব সবকর্ম্মেব সহায়। কালীচরণ মাঝিব বীরু মাল্লা।

'নমামি'ব ছবিতে আব এক দিনেব ঘটনা।

"বড় ঘাসী নৌকাখানা সাভাব বন্দরেব ঘাটে ভিড়িয়ে কালীচরণ বান্না চাপিয়েছে। বীরা ও সোৎস্যা গেছে বন্দবে তেল নুন কিন্‌তে। কিন্তু কয়েকদিন আগেই কাছে ভিতে একটা ডাকাতি হয়েছে। অচেনা মাঝি দেখলেই পুলিশ ধবে নিযে যাচ্ছে থানায়। ভাত চাপিয়ে কালীচরণ একমনে সূতো পাক দিচ্ছে—উরুব কাপড় তুলে। এমন সময় দুজন সেপাই এসে তাকে ধরে থানায় নিয়ে গেল।

কালীচরণ থানায় গিয়ে দাবোগার সাম্‌নে মাটিতে ভক্তিভরে প্রণাম করল। দারোগাবাবু বারবাব তাকে বক্রদৃষ্টিতে চেয়ে চেয়ে দেখ্‌লেন।

জিজ্ঞাসা করলেন তোমার নাম?

'আইগ্যা কালীচরণ' মাঝি জবাব দিল।

'বাপের নাম?'

'আইগ্যা শম্ভু।'

তোমার বয়স কত? দারোগাবাবু প্রশ্ন করেন।

কালীচরণ একটু ভেবে নিয়ে চিন্তিতভাবে বল্‌লে—ইসে বয়সের কথা কন্? বয়স ঢের হইছে। এই বার-চোদ্দ হইতে পারে।'

থানা সমেত সকলে একযোগে হেসে উঠল। অপ্রতিভ হয়ে কালীচরণ কি যেন বিড় বিড় করে বল্‌তে লাগ্‌ল। হঠাৎ সে বলে উঠ্‌ল—'হ্যাঁ হুজুর, বার চোদ্দই হইব। হেবার গাঁয়ে যখন খুব বাঘের ভয় হইছিল— হেই যে আমাদের লাপ্‌সী গাপ্‌সী ছাগলডা লইয়া গ্যাল গিয়া হেই বারেইত আমি তামাক খাওন শিখ্‌ছিলাম।'

আবার একচোট হাসির ধুম পড়ে গেল থানায়। কালীচরণ বেকুবের মত খানিকটা এধার ওধার চেয়ে নিল। তারপর দাঁত ছুপাটি বার করে মিনতির সুরে বল্‌লে—'হুজুর য়াড্ডা খতা খই। ক্যোল্‌কা নাই এখানে? গলাটা শুখাইয়া কাড্ হইয়া গ্যাছে গিয়া; 'প্যাট্টা যেন ফুল্লা উঠ্‌ছে।'

"দারোগাবাবু এবার নিঃসন্দেহে বুঝিলেন কালীচরণ নিতান্তই বোকা মাঝি। সুতরাং ছেড়ে দিলেন তাকে।"

আর একদিনের ঘটনা—"নদীর আশে পাশে গ্রামে আরও কয়েকটা ডাকাতি হওয়ায় কোলকাতা থেকে একদল গোয়েন্দা এসেছে তদন্তে। একদিন তিনজন সি. আই. ডি অফিসার নারায়ণগঞ্জ ঘাটে যে নৌকাখানি ভাড়া করল তার মাঝি হচ্ছে কালীচরণ। তাদের একজন জিজ্ঞাসা করল—'এই মাঝি সাত আট দিন আগে একদল লোক গেছে এই ঘাট থেকে?'

কালীচরণ কি যেন মনে মনে ভাবে। তারপর জবাব দেয়—'হ-হ—খরতা! গেছিল একদল লুক্। বিয়ার দল্। তাগো

লগে কি সুন্দর বৌ আছিল। সঙ্গে সঙ্গেই গুন্ গুন্ করে গান জুড়ে ছিল—'খুছবরণ কন্যারে হে, ম্যাঘ বরণ ছু-উ-ল।

বাবুরা সব হেসে উঠলেন। ইন্সপেক্টারবাবু বল্লেন—'কন্যার কথাতেই মাঝির মন তেতে উঠেছে। ওহে মাঝি কি নাম তোমার ?"

'আইগ্যা খালীছরণ।'

'খালীছরণ, তাই সই। বাবা খালিচরণ তোমার বে হয়েছে বাবা ?

'বিয়ার কথা খন্ ? কে দেবে আমাগো মাইয়া ? গরীব লুক, পরের লাউত খাইট্যা খাই—বিয়া করণের টাহা পামু কৈ ? ছয় সাত কুড়ি ত লাগ্‌বই'—দীর্ঘশ্বাস ফেলে বিষণ্ণ মনে উত্তর দিল কালীচরণ।

আচ্ছা কালীচরণ ! এক বেটা পাঞ্জাবীকে ঘোরাফেরা করতে দেখেছ এধারে ?' সেটা ডাকাতদলের সর্দ্দার—যদি তাকে ধরে দিতে পার—এত টাকা পুরস্কার পাবে সরকার থেকে যে শুধু বিয়ে নয়, বৌ নিয়ে চিরকাল সুখে স্বচ্ছন্দে কাটিয়েও দিতে পার্‌বে।'

'হাচা কন্ বাবু'—আহ্লাদে বিকশিত দন্ত কালীচরণ জিজ্ঞাসা করে।

'নিশ্চয়ই পাবে' জোরের সাথে জবাব দেন ইন্সপেক্টারবাবু।

সোৎসুকে কালীচরণ জিজ্ঞাসা করে - 'কইতে পারেন হে হালার চেহারাডা কি রকম ?'

'ইয়া লম্বা, ভীষণ কালো, মাথায় পাগ্‌ড়ী লম্বা দাড়ি—বেটা বাংলা-ইংরাজী-হিন্দী সবই চলনসই বল্‌তে পারে'—বাবু জবাব দেন।

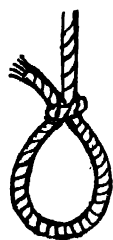
রথের মেলায় শোলার মোল্লার মত মাথাটা বারকতক আলোড়ন করে, দাঁতে দাঁত চেপে মাঝি বলে—'হাচা কই বাবু, হালার পোরে পাইলে ছাইখ্যা দিমু কেমন নমামি।

ইন্সপেক্টারবাবু উৎসাহে বলেন—যদি পার তবে দেশের জনে জনে বল্‌বে—'ধন্য তুমি নমামি।"

ইন্সপেক্টার বাবু জানিতে পারিলেন না খালীছরণের মধ্যেই ডাকাত সর্দ্দার পাঞ্জাবী লুকাইয়া আছে।

নিরীহ অজ্ঞ গ্রাম্য মাঝি দিনের পর দিন তার নৌকা লইয়া পূর্ব্ববঙ্গের নদীতে নদীতে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে, পুলিশ বার বার দেখিয়াছে, থানায় লইয়া গিয়াছে, তল্লাসী করিয়াছে, তবু বিন্দুমাত্র সন্দেহ করিতে পারে নাই, যাহাকে তাহারা চায় এই সেই। অকুতোভয় নির্লিপ্ত ত্রৈলোক্যনাথ বিপদকে পাশ কাটাইয়া চলেন নাই, যেখানে ভয় সেখানে হাজির হইয়া নির্ভয়ে ঘটনার মোকাবিলা করিয়াছেন, তাই ব্রিটিশের ধুরন্ধর পুলিশ ও গুপ্তচরের দল বার বার পরাজিত হইয়াছে।

এমনি করিয়া কালীচরণ তার দুই সঙ্গী—বীরা আর সোৎস্যাকে লইয়া দিনের পর দিন জলে জলে ভাসিয়াছে—ঘাটে ঘাটে ভিড়িয়াছে, পুলিশকে হাসাইয়াছে, বোকা বানাইয়াছে এবং গোপনে গোপনে বৈপ্লবিক কার্য্যক্রম অব্যাহত রাখিয়াছে। 'সত্য যাহা সে স্বপ্নের মত দৃপ্ত ইন্দ্রজালে!'



পূর্ব্ব-পরিকল্পিত ব্যবস্থানুযায়ী ময়মনসিংহের শ্যামগঞ্জে ডাকাতি সারিয়া ত্রৈলোক্যনাথের নেতৃত্বে বিপ্লবীদল প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছে। ত্রৈলোক্যনাথ বুঝিতে পারিলেন পুলিশ সংবাদ পাইয়া গিয়াছে। ডাকাত ধরিবার জন্য সদলবলে সশস্ত্র হইয়া তাহারা শ্যামগঞ্জের দিকে আগাইয়া আসিতেছে। বিপ্লবীরা বিচ্ছিন্নভাবে বিভিন্ন দিকে পাড়ি জমাইল। ত্রৈলোক্যনাথ উল্টোদিকে মাঠের পথ ধরিলেন। অজানা গ্রাম প্রান্তর—অজানা পরিবেশ। পথে নামিবার সাহস নাই—মাঠের পথই ধরিতে হইল। প্রথমতঃ পলাতক আসামী মাথার উপর পুরস্কার ঘোষিত হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, ডাকাতি করিয়া ফিরিতেছেন। ধরা পড়িলে জেলবাস অনিবার্য্য। তাই রেল স্টীমারের রাস্তাও পরিত্যাগ করিতে হইয়াছে। অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া—পদব্রজে চলা সুরু হইল। মাঠে মাঠে রাখালের দল গরু চরাইতেছে, তাহাদের জিজ্ঞাসা করিয়া মাঝে মাঝে পথের নিশানা ঠিক করিয়া লইতেছেন। বহু মেঠোপথ ও গ্রাম পার হইয়া একটি বড় রাস্তায় আসিয়া উঠিলেন। সঙ্গে একটি টাকা ও পাঁচটি পয়সা।

টাকাটি বিপদের পাথেয় হিসাবে রাখিয়া দিতে হইবে—পাঁচ পয়সার উপর ভরসা। পথের কড়ি হিসাবে পাঁচ পয়সা সম্বল করিয়া ত্রৈলোক্যনাথ চলিয়াছেন। প্রথম দিন গত হইল, উদয়াস্ত চলিতে চলিতে এক পয়সার ছোলা ভাজা খাইলেন আর পথিপার্শ্বের পুষ্করিণীর জল পান করিলেন। আজানা গ্রামের অজ্ঞাত গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করিবারও সাহস নাই।

দ্বিতীয় দিনেও ক্রমান্বয়ে চলিয়াছেন। সেদিন ক্ষুধার তাড়নায় দুটি পয়সা খরচ করিতে হইল। ছোলাভাজা চিবাইতে চিবাইতে পথ চলেন। পথে নদী পড়িল, খেয়ায় দুটি পয়সা পারানি লাগিল। পাঁচ পয়সা খরচ হইয়া গিয়াছে, ত্রৈলোক্যনাথ নিঃসম্বল।

তৃতীয় দিন বৈকালে যখন ঢাকা জেলার মাণিকগঞ্জ মহকুমার তিল্লীগ্রামে পোঁছিলেন তখন দেহ অবশ, পা চলিতেছে না, ক্ষুধায় সমস্ত শরীর অবসন্ন, মাথা ঘুরিতেছে। মুখ শুক্‌নো, চুল রুক্ষ, কতকটা পাগলের মত চেহারা। বিপ্লবী বলিয়া কেহই সন্দেহ করিবে না—দরিদ্র ভবঘুরের চেহারা।

সারা গ্রাম জুড়িয়া অপরাহ্নের নিস্তব্ধতা। গ্রামের মাইনর স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীযোগীন্দ্রনাথ রায়ের গৃহ। বিপ্লবীদের সমর্থক ও সুহৃদ যোগীন্দ্রবাবুর বাড়ীতে বহু বিপ্লবীর সময়ে অসময়ে যাতায়াত। ত্রৈলোক্যনাথ পূর্ব্ব-অভিজ্ঞতানুযায়ী জানেন যোগীন-বাবু এই সময়ে বিদ্যালয়ে; বৃদ্ধা মাতা গৃহাভ্যন্তরে। ক্লান্ত ত্রৈলোক্যনাথ ডাকাডাকি না করিয়া বাহিরের ঘরে শুইয়া পড়িলেন। গৃহভৃত্য অপরাহ্নের নিদ্রা সুখ উপভোগ করিতেছিল। ত্রৈলোক্যনাথ বিনা দ্বিধায় তাহার পাশেই ভূমিতে শয়ন করিলেন। জাগিয়া উঠিয়া এক অপরিচিত ছিন্নবেশ রুক্ষকেশ আগন্তুককে তাহার পাশে ঘুমাইয়া থাকিতে দেখিয়া ভৃত্য চেঁচামেচি সুরু করিয়া দিল। যোগীন্দ্রনাথের বৃদ্ধা মাতা গোলমাল শুনিয়া কক্ষে প্রবেশ করেন ও বিস্ময়ে প্রশ্ন করেন—‘একি কালীচরণ যে’। সদ্যজাগ্রত ত্রৈলোক্যনাথ লজ্জার হাসি হাসিয়া উঠিয়া বসেন। ইতিমধ্যে যোগীন্দ্রনাথ স্কুল হইতে ফিরিয়াছেন, অভাবনীয় সাক্ষাতের আনন্দে ত্রৈলোক্যনাথকে জড়াইয়া ধরেন। তাড়াতাড়ি তিনি ত্রৈলোক্যনাথকে ছাড়িয়া দিতে রাজী নহেন—দুদিন ধরিয়া রাখিলেন। নিজের একখানি কাপড় ত্রৈলোক্যনাথকে পরিতে দিলেন। যাইবার সময় ছেঁড়াকাপড়টি ত্রৈলোক্যনাথের লওয়া হয় নাই। আমৃত্যু যোগীন্দ্রনাথ এই ছিন্নবস্ত্রখানি ত্রৈলোক্যনাথের স্মৃতিস্বরূপ নিজের নিকট সযত্নে রাখিয়াছিলেন।

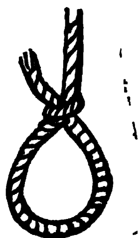
বন্ধুর আন্তরিক আতিথেয়তা ও মাতার সেবাপরায়ণতা

ত্রৈলোক্যনাথকে দুদিনেই সুস্থ ও সবল করিয়া তুলিল। ত্রৈলোক্য-নাথের পরমপ্রিয় তিল্লীর 'চন্দনচূড়' দই খাওয়াইতে যোগীন্দ্রনাথের ভুল হয় নাই এবং সেকথা ত্রৈলোক্যনাথ পরিণত বয়সেও বিস্মৃত হন নাই।

যোগীন্দ্রনাথ বন্ধুব নিকট হইতে তাঁহার পথ পরিক্রমার গল্প শুনিয়া হিসাব করিয়া দেখেন ময়মনসিংহের যেখান হইতে ত্রৈলোক্যনাথ হাঁটিতে সুরু করিয়াছিলেন সেই স্থান হইতে এই তিল্লীগ্রাম প্রায় ৮০।৮৫ মাইলেব ব্যবধান। স্থানটির নাম সরিষা-বাড়ী। বিস্ময়ে বিপ্লবীর মুখের পানে তাকাইয়া থাকেন আর ভাবেন কেমন করিয়া কোন অন্তর্নিহিত শক্তিতে কেবলমাত্র তিন পয়সাব ছোলাভাজা খাইয়া তিন দিনে তিনি এই দীর্ঘপথ পাড়ি দিলেন।

অন্তবের অগ্নি একবার প্রজ্জলিত হইলে সবই সম্ভব।

"মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘায়তেগিরিম্।"



বিদেশী শক্তির রক্তচক্ষু সেদিন বাঙলার যুবমানসকে সর্ব্বদা সন্ত্রস্ত রাখিবার প্রয়াসে মাত্রা হারাইয়াছে। জিঘাংসার প্রমত্ততা যুবশক্তিকে অহেতুক আঘাত হানিয়া চলিয়াছে—তাই যুবকের দল

সাধারণভাবেই গতিতে মন্থর, স্বভাবসিদ্ধ প্রাণোচ্ছলতায় সতত বিস্মিত ; আর বিপ্লবীদের তো কথাই নাই—আত্মগোপন করাই তাহাদের ধর্ম্ম হইয়া উঠিয়াছে। আত্মগোপন করিয়া নিশ্চেষ্ট থাকিলে চলিবে না—স্রোতস্বিনী জল সম্ভার বিযুক্ত হইলে গতিহীন পঙ্কিল পল্বলে রূপান্তরিত হয়। প্রাণস্ফুর্ত্ত সংস্থায় নূতন নূতন মানুষ চাই ; প্রকাশ্যে আহ্বান করিবার উপায় নাই—আবরণের মধ্যে অতি গোপনে তাহাদের সন্ধান করিতে হইবে, দলে আনিতে হইবে ; দলকে বিস্তৃত ও প্রাণবন্ত করিতে হইবে, গতিশীল রাখিতে হইবে।

"বিপ্লব যুগে দেশের যে অবস্থা ছিল তাহাতে কেহ স্বাধীনতার দাবীর কথা মুখে উচ্চারণ করিতেও সাহসী হইতেন না। আমরাও প্রকাশ্যভাবে দেশের স্বাধীনতার কথা বলিতাম না।

জন সাধারণের ভিতর প্রবেশ করিবার সুযোগ আমরা পাই নাই, তবে গ্রামে গ্রাম পাঠশালা গঠন করিয়া শিল্প বিস্তার ও স্বদেশী প্রচারের যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি। স্থানে স্থানে পাঠাগার ও 'আশ্রম' স্থাপন করিয়াছি। এই আশ্রম আর স্কুল ছিল আমাদের এক একটি কেন্দ্র"—ত্রৈলোক্যনাথ লিখিয়াছেন।

সুকুমারমতি বালকগণ যে উদ্‌গ্রীবতা ও মননিষ্ঠা লইয়া বিদ্যালয়ে আসে—তাহাই বীজ বপনের উপযুক্ত ক্ষেত্র। শিক্ষকদের মানসিকতা ও পাঠ্যক্রমের বিষয়বস্তু তাহাদের মনে ধীরে ধীরে যে ভাবধারার উন্মেষ ঘটায় তাহাই তাহাদের জীবনের গতিপথ নির্ণয় করিতে বহুল পরিমাণে সাহায্য করে। তাই বিদ্যালয়ের মধ্য দিয়াই জাতির ভবিষ্যৎ সত্তার কাঠামো প্রস্তুত হইয়া উঠে। পর-শাসনে যখন জাতি থাকে তখনও বিদ্যালয়ের মধ্য দিয়াই শাসকের প্রতি অনুরাগ বর্দ্ধনের প্রয়াস চলে ; আত্মশক্তিতে বিশ্বাস হারানোর প্রক্রিয়া অনুসৃত হয়, হীনম্মন্যতা উদ্রেক করিবার সকল পন্থাই

প্রযুক্ত হয়। আবার পর-শাসনের নাগপাশ হইতে মুক্ত করিতে, জাতিকে আত্মবিশ্বাসে উদ্বুদ্ধ করিতে, নিজের অতীতের গৌরবদীপ্ত আলোকে উজ্জীবিত হইতে ও বাঁধন ভাঙার মন্ত্র শিখাইতেও বিদ্যালয়েরই আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। তাই বিপ্লবীদের জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় ও প্রযোজনায় এত আগ্রহ, এতনিষ্ঠা ও এত অধ্যাবসায়।

এইরূপ জাতীয় বিদ্যালয়ে ছাত্রদের প্রেরণাদায়ক পুস্তকাদি পড়ান হইত, ভারতের শৌর্যবীর্য্যবিমণ্ডিত গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়ের সহিত পরিচিত করান হইত, দেশপ্রেমের আলোক জ্বালাইবার প্রয়াস চলিত।

ত্রৈলোক্যনাথ বলিতেছেন "তাহার গতিবিধি লক্ষ্য করিয়া দেখিতাম ছেলেটির স্বভাব চরিত্র ভাল কিনা, তাহার পর তাহার সহিত ভাব করিয়া তাহাকে ধর্ম্ম পুস্তক পড়িতে দিতাম, পরে পৃথিবীর অন্যান্য পরাধীন জাতির স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস, রাজপুত কাহিনী, সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস প্রভৃতি পড়িতে দিতাম। সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষের বর্ত্তমান অবস্থার কথাও আলোচনা করিতাম। এইরূপভাবে তাহার মন গড়িয়া তুলিয়া পরে তাহাকে দেশের স্বাধীনতার কথা বলা হইত।"

সেদিন বিপ্লবীরা উচ্ছ্বাসে নিজেদের নিঃশেষ করেন নাই। অনুপ্রেরণা অন্তরে আবদ্ধ রাখিয়া উচ্ছ্বাসকে অন্তর্মুখী করিয়া শতগুণে তাহাকে কর্ম্ম চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছেন। মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পাতনের আপ্তবাক্য—একাগ্রতায় অনুসরণ করিয়াছেন। প্রকাশ্য সভা সমিতিতে ভিড় জমাইয়া বাক্ বিন্যাসে সোচ্চার হ'ন নাই। ভাবোল্লাসে বহির্মুখী হইয়া নিজের ভাব চেতনাকে লঘু ও চটুল হইতে দেন নাই। আত্মস্থ হইয়া সম্বিতকে জাগাইবার সাধনা করিয়াছেন।

এমনি এক বিদ্যালয় সোনারং জাতীয় বিদ্যালয়। ত্রৈলোক্য-নাথের নিজের বর্ণনা। "ঢাকা জেলার বিক্রমপুরের অন্তর্গত সোনারং গ্রামে শ্রীযুক্ত মাখন সেনের বাড়ী। তিনি অনুশীলন সমিতির নেতৃস্থানীয় ছিলেন। মাখনবাবু নিজ গ্রামে একটি জাতীয় বিদ্যালয় (উচ্চ ইংরাজী) স্থাপন করিয়াছিলেন। সমিতি-গুলি বেআইনী ঘোষণা ও ঢাকার সমিতির বোর্ডিং ভাঙ্গিয়া দেওয়ার পর অনুশীলন সমিতিব বাড়ীছাড়া পলাতক সভ্যদের এবার দুর্দ্দিন উপস্থিত হইল। মাখনবাবু সেই সময় তাঁহার জাতীয় বিদ্যালয়টি সমিতির হাতে ছাড়িয়া দেন। পলাতক সভ্যবা নাম পরিবর্ত্তন করিয়া সোনারং জাতীয় বিদ্যালয়ের শিক্ষক নিযুক্ত হইলেন। ঢাকাব কেন্দ্র সোনারংয়ে স্থানান্তরিত হইল। স্কুলেব সঙ্গে বোর্ডিং ছিল, সেখানে শিক্ষকগণ এবং পলাতক বিপ্লবীরা থাকিতেন। উচ্চ শ্রেণীর ছাত্রদের বাড়ীতে অস্ত্রশস্ত্র ও লুণ্ঠিত দ্রব্য থাকিত। মাখনবাবুব প্রভাবে ও শিক্ষকদের ব্যবহারে সোনারং গ্রামের প্রায় সকলেই অনুশীলন সমিতির প্রতি আকৃষ্ট হইলেন। পলাতক বিপ্লবীরা রাত্রে তাহাদের বাড়ীতে শয়ন করিতেন। পুলিশের দৃষ্টিও এই স্কুলের উপর পড়িয়াছিল। সময় সময় পুলিশের দল সদল-বলে সেখানে উপস্থিত হইত, কিন্তু আপত্তিকর কিছুই পাওয়া যাইত না।

এই স্কুলে রমেশচন্দ্র আচার্য্য, রবীন্দ্রমোহন সেন, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, যোগেন্দ্র চক্রবর্ত্তী, দিনিন্দ্র মুখোটী প্রভৃতি স্থায়ী শিক্ষক ছিলেন। বীরেন্দ্র চ্যাটার্জ্জী ও ত্রৈলোক্যনাথ সময় সময় নৌকার মাঝির বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া এই বিদ্যালয়ের শিক্ষকতার কাজ করিতেন। পুলিশ অবশেষে একটি মিথ্যা মামলা সাজাইয়া শিক্ষকদিগকে গ্রেপ্তার করে, ফলে সোনারং জাতীয় বিদ্যালয় উঠিয়া যায়।"

সোনারং জাতীয় বিদ্যালয় বাঙলার বিপ্লব-আন্দোলনে এক অবিস্মরণীয় নাম। এই বিদ্যালয় পূর্ব্ব বাঙলায় কতখানি সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়াছিল তাহা রাউলাট্ কমিটির বিস্তৃত প্রতিবেদন হইতে বুঝিতে পারা যায়। যেখানে এই প্রতিবেদন সারা ভারত সাম্রাজ্যের বিপ্লব ধারার পরিপ্রেক্ষিতে রচিত সেখানে ঢাকা জেলার একটি গ্রামের বিদ্যালয়ের উপর এতখানি বিবরণ ইহার গুরুত্ব ও বিশেষত্বই প্রকাশ করিতেছে।

"The first of the above outrages was an assult by the students and teachers of the Sonarang National School who seized the bag of a postal peon with its contents including registered orders for money and cash. Fourteen teachers and students were arrested and seven were ultimately punished by fine and imprisionment.

The Sonarang murder of the 11th July appeared to have been an off shoot of this case, for upon that day Rasul Dewan was shot dead, and his brother and another man were mortally wounded at their home at Sonarang. They had been assisting the police with information and Rasul Dewan had assisted the police in the fatal postal peon case.

There is reason to believe that the students and inmates of the Sonarang School participated in the Gaodia Dacoity.

This notorious school was founded in 1908 and at the time of Dacca conspiracy case attended by 60 or 70 students. The curriculam was the same as in the goverment school upto entrance or Matiriculation

some times with the addition that physical exercise and lathi play were taught and a black smiths and a carpenters shops utilized for the teaching of practical carpentry and iron works".

আজ যে কারিগরী শিক্ষা ব্যবস্থার জন্য আমরা এত সোচ্চার বিপ্লবী বাঙালা সেই শিক্ষাকে ৬০।৬৫ বৎসর পূর্ব্বে স্বপ্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ে শিখাইবার ব্যবস্থা করিয়াছিল। কারিগরী বিদ্যালয়ের শুধু কল্পনা করে নাই, বাস্তবায়িত করিয়াছিল।

"No syllabus of subjects taught or text books used at this school had ever been issued and it has not been ascertained what books were actually in use there but on the occasion of a search made in August 1910 in connection with Dacca conspiracy case, the following books were found in the School Library.

(1) History of Tilok's Case and Sketch of his life.

(2) Chatrapati Shivaji by S. C. Shastri.

(3) History of Sepoy Mutiny.

ত্রৈলোক্যনাথ এই সোনারং স্কুলের সহিত শুধু ঘনিষ্ঠ ভাবে যুক্তই ছিলেন না। এই বিদ্যালয় ছিল তাঁহার বিপ্লবী জীবনের অন্যতম প্রধান কর্ম্ম কেন্দ্র। তাই কালীচরণ মাঝে মাঝে মাঝির বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া নদী ছাড়িয়া ডাঙায় উঠিতেন ও শশী মাষ্টার হইয়া—এই বিদ্যালয়ে প্রায়ই শিক্ষকতা করিতেন।



রাউলাট কমিটির প্রতিবেদন—The members of the Anusilan samity had two farms Belonia and udaipur at hill Tephrah. The farms were ostensibly agricultural ventures but really places for the furtherance of the revolutionary organisation. The members of the samity used to practice shooting in the farms.

কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবার আগে উপযুক্ত শিক্ষার প্রয়োজন। অনুশীলন ব্যতীত দক্ষতা আসে না, বিনা দক্ষতায় সাফল্য অর্জন সম্ভব নয়। তাই বিপ্লবীর শারীরিক ও মানসিক দৃঢ়তার অনুশীলন কল্পে পার্ব্বত্য ত্রিপুরার বিলোনিয়া ও উদয়পুরে খামারবাড়ীর স্থাপনা হইল। রাজধানী আগরতলা হইতে প্রায় ২২ মাইল ও কুমিল্লা হইতে ৪৫ মাইল দূবে পাহাড়ের অভ্যন্তরে জনবিরল উপত্যকায় এই খামারবাড়ী, লোক বসতি নাই বলিলেই চলে—আব যাহারা বা আছে তাহারা নিরীহ অজ্ঞ পাহাড়ীয়দের দল।

বিপ্লবীর দল কুমিল্লা হইতে পদব্রজে এই খামারে যাতায়াত করে। সেখানে থাকাকালে চাষীর মতন জীবন যাপন করে। সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে নগ্নগাত্রে নগ্নপদে অর্দ্ধ বস্ত্রাবৃত হইয়া লাঙল কাঁধে মাঠের দিকে চলে; ক্ষেতিবাড়ির কাজ সাঙ্গ করিয়া সন্ধ্যায় মাঠ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করে। সারাদিনের পরিশ্রমের পব অতি সাধারণ আহার—আলুভাতে ভাত নয়ত বড়জোব ডাল, আর মাটিতে চাটাই পাতিয়া শয়ন। কৃচ্ছ সাধনায় ঐকান্তিক নিষ্ঠা; অগণিত মূক জনতার জীবনের শরিক হইয়া আন্তরিকতার সহিত তাহাদের দুঃখ বেদনা পরিশ্রম ও প্রত্যাশার উপলব্ধি করা। শরীর মজবুত হয়, শ্রমের মর্য্যাদা স্বীকৃত হয়, মানসিকতার প্রসার ঘটে। কাজের ফাঁকে গভীর অরণ্যে চাঁদমারির শিক্ষা গোপনে ও নিষ্ঠায় অনুষ্ঠিত হয়। মনে ও শরীরে বিপ্লবীরা আগামী দিনের জন্য প্রস্তুত হয়।

শ্রীনলিনীকিশোর গুহ তাঁহার "বাঙলায় বিপ্লববাদ" গ্রন্থে লিখিয়াছেন—"এখানে বিপ্লবীরা শুধু অস্ত্র চালনাই শিক্ষা করিত না ; কঠোর পরিশ্রম সামরিক নিয়মানুবর্ত্তিতায় জীবন গঠন করিত। প্রত্যেককেই সর্ব্বপ্রথম ৪৫ মাইল পায়ে হাঁটিয়া গিয়া ফার্ম্মে থাকিবার যোগ্যতার পরীক্ষা দিতে হইত। দিনমানে কর্ম্মীগণ কুলিমজুর রূপেই থাকিত, লাঙ্গল ও কাস্তে স্বহস্তে চালাইত। ইক্ষু ও ধান চাষ করিত। রাত্রিতে দূরবর্ত্তী পাহাড়ে গিয়া অস্ত্র চালনা শিক্ষা করিতে হইত।"

ত্রৈলোক্যনাথ এই খামারবাড়ীর একজন অন্যতম সংগঠক প্রায়ই তাঁহাকে এখানে আসিতে হইত।

"কুমিল্লাসহরে রমেশ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বাসা অনুশীলন সমিতির পলাতক বিপ্লবীদের একটি আড্ডা ছিল। উদয়পুর পাহাড়ের শিল্পকেন্দ্রে যাতায়াতের সময় বিপ্লবীরা এখানে আশ্রয় গ্রহণ করিতেন।"

একবার উদয়পুরে অবস্থানকালে ত্রৈলোক্যনাথ অসুস্থ হইয়া পড়েন। দু'সপ্তাহ জ্বরে ভুগিতেছেন, শরীর খুবই দুর্ব্বল—কুমিল্লায় না ফিরিতে পারিলে এই পাহাড়ী জায়গায় বিনা চিকিৎসায় মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। অথচ শরীরে শক্তি নাই, পদব্রজে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করার সামর্থ্যও নাই। তথাপি কেবল মাত্র মনের জোরে বিপ্লবী যাত্রা করিলেন। সাথী হিসাবে রহিল বি. এস্-সি পাশ-করা একটী যুবক, নাম সতীশ। তখনও সাগুই ত্রৈলাক্যনাথের পথ্য এবং জ্বরও ছাড়ে নাই। শক্তির আশায় আলুসিদ্ধ ভাত খাইয়া সতীশের সহিত ত্রৈলোক্যনাথ রওনা হইলেন। পথে চলচ্ছক্তিহীন হইয়া ত্রৈলোক্যনাথ লুটাইয়া পড়েন। পদব্রজে একক সাথী সতীশ পাত্রাভাবে—দূরের পুষ্করিণী হইতে গামছা ভিজাইয়া আনে, চোখে মুখে জল সিঞ্চন করে। ত্রৈলোক্যনাথ

কিঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া আবার ওঠেন যাত্রা সুরু করেন। কিছুক্ষণ চলিয়া আবার পথের উপর শুইয়া পড়েন। সতীশ আবার গামছা ভিজাইয়া জল আনে। কতকটা সুস্থ হ'ন, খানিকটা চলেন আবার পথে বসিয়া পড়েন। সতীশ বার বার জল আনে, চোখে মুখে দেয়। এমনি করিয়াই পথ পরিক্রমা চলে। ওদিকে বাঘের ভয়। পার্ব্বত্য পথ বন জঙ্গলে আবৃত—অধিক রাত্রি হইলে হিংস্র পশু হইতে বিপদের সম্ভাবনা। মন চলিতে চায়, দেহ তাল রাখিতে পারে না। যাহা হউক অতিকষ্টে অনেক উত্থান পতনের মধ্য দিয়া রাত্রি নয় ঘটিকা নাগাদ ত্রৈলোক্যনাথ কুমিল্লার রমেশ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দুধ ও পাউরুটী পথ্য করিয়া ও ঔষধাদি সেবনান্তে পরের দিনই ঢাকা রওনা হইয়া গেলেন। অপেক্ষার সময় নাই, অনেক কাজ পড়িয়া আছে।

বিপ্লবীর নিকট কোন বাধাই বাধা নয়, প্রাণশক্তি তাহাকে গতিহীন হইতে দেয় না। 'চরৈ বেতি—আগে বাড়' বিপ্লবী-জীবনের মুল কথা। এই সঙ্কল্পই তাহাকে সম্মুখে লইয়া চলে। ত্রৈলোক্যনাথের জীবন তাহারই প্রদীপ্ত উদাহরণ।

অন্তরে তাঁহার আগামী দিনের নবারুণের দীপ্তি—পিছনে তাঁহার বাদল আকাশের ঘন অন্ধকার; পিচ্ছিল চলার পথ। চরণ বার বার থামিয়া যায়—তবুও সে চলে থামিতে সে জানে না।

"পিছনে ঝরিছে ঝর ঝর জল
গুরু গুরু দেওয়া ডাকে
মুখে এসে পড়ে অরুণ কিরণ
ছিন্ন মেঘের ফাঁকে।"



চলার পথে কেহ যদি বাধা দেয়—তাহাকে ক্ষমা করার প্রশ্ন উঠে না। পথ হইতে তাহাকে সরাইতে হইবেই। কাঁটা যদি চলার পথে বাঁধা জন্মায় তবে সে কাঁটা উপড়াইয়া ফেলাই ধর্ম্ম। তাই বিপ্লবীরা পথের কাঁটা স্বরূপ বিপ্লবের শত্রুদের অমার্জনীয় মানসিকতার দরুণ গুপ্তহত্যার আশ্রয় নেওয়া হইয়াছিল।

স্বদেশবাসী হইয়া স্বদেশের মুক্তি আন্দোলনে যাহারা পদ ও অর্থের অত্যুগ্র লালসায় প্রতিপদে প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করিয়াছে কিম্বা যাহারা মন্ত্রগুপ্তির শপথ গ্রহণ করিয়াও দুর্ব্বলতা প্রযুক্ত হইয়া কিম্বা রাজানুগ্রহ লাভের আশায় বা শাস্তি এড়াইবার জন্য রাজকীয় অনুকম্পা লাভ করিবার মানসে সমিতির গোপন তথ্য, বিপ্লবী কার্যধারা বিদেশী সরকারের গোচরীভূত করিয়াছে বা করিবার মানস করিয়াছে তাহাদের উপর বিপ্লবী সংস্থার চরমদণ্ড মৃত্যু নামিয়া আসিয়াছে বিপ্লবীদের অস্ত্রের মুখে। সেখানে মায়া নাই, অনুকম্পা নাই, অনুশোচনা নাই। লক্ষ্য একবার স্থির হইলে কালাকাল নাই, সময়ের তামাদি নাই—চিত্রগুপ্তের খাতায় ঠিক পড়িয়া গিয়াছে।

এ প্রতিশোধ স্বার্থের বশে নয়, কোন প্রলোভনে নয়, কোন হিংসায় নয়। এই প্রতিশোধ সার্ব্বিক হিতে সার্ব্বিক মুক্তির অনুপ্রেরনায়। ত্রৈলোক্যনাথ আন্দোলনের নির্ভীক হোতা হিসাবে রাজনৈতিক হত্যা সাধন করিয়াছেন। কিন্তু মন কখনও কলুষযুক্ত হয় নাই। যে মানসিকতায় যুদ্ধক্ষেত্রে সৈনিক বিপক্ষের বিনাশ করে সেই মৃতো বা প্রাপ্সসে স্বর্গম জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীম শাশ্বত বাণীর উদাত্ত আহ্বানে উদ্বুদ্ধ হইয়া তিনি এই হত্যাকর্ম্ম সম্পাদন করিয়াছেন। ত্রৈলোক্যনাথ লিখিতেছেন—"বিপ্লবীরা অপরাধীর শাস্তি বিধান করিয়াছে। যাহারা বিপ্লব প্রচেষ্টায় পথের কণ্টক তাহাদের অপসারণের ব্যবস্থা করিয়াছে। এই স্বাধীনতা আন্দোলনে

ইংরাজ শাসকের সহায়ক যাহারা তাহারা দেশের শত্রু। যাহাদিগকে হত্যা করা হইয়াছে তাহাদের প্রত্যেকেরই বিপ্লবী কর্ম্মীদের উপর অত্যাচার বা বিপ্লবীদলের ক্ষতিসাধন করার একটা ইতিহাস আছে। বিপ্লবীরা ব্যক্তিগত বিদ্বেষবশতঃ কাহাকেও হত্যা করে নাই। দণ্ডদিবার ব্যবস্থা যেমন দেশীয় পুলিশ ও গুপ্তচরদের প্রতি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল তেমন ইংরাজ রাজ কর্ম্মচারীর বিরুদ্ধেও প্রযুক্ত হইয়াছে। এ ছাড়া সাধারণের মধ্যে ভয় ভাঙ্গার প্রেরণার জন্যও এইরূপ দণ্ডদানের প্রয়োজন উপলব্ধ হইয়াছে।

বহু রাজনৈতিক হত্যা সংঘটিত হইয়া চলিল। তবে ত্রৈলোক্যনাথ প্রত্যক্ষভাবে বিশেষরূপে সংস্পর্শে আসেন যে কয়েকটী হত্যায় তাহারই বিবরণ লিপিবদ্ধ হইল।

১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে ১০ই এপ্রিল ঢাকা রাউৎ ভোগে মনোমোহন দে নিহত হয়। আততায়ীর কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

মনোমোহন ঢাকা ষড়যন্ত্র মামলা ও মুন্সিগঞ্জ বোমা মামলার একজন অন্যতম সাক্ষী। তাহাকে সরাইতে না পারিলে সমিতির কার্য্যকলাপ বিঘ্নিত হইবার আশঙ্কা দেখা দেয়। ত্রৈলোক্যনাথ আগাইয়া আসিলেন ও আপন হস্তে শাস্তি দানের ব্যবস্থা করিলেন।

পরের বৎসর ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে ১৯শে জুন ময়মনসিংহ সহরে সাব-ইন্‌স্‌পেক্টর রাজকুমারকে হত্যা করা হয়। বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে তাহার অত্যুৎসাহই তাহার মৃত্যুর কারণ।

১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে ১১ই ডিসেম্বর। সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জের অভিষেক উৎসব। সারা ভারত জুড়িয়া সে দিন ইংরেজ সরকার উৎসব-প্রমত্ত। এই দিনই বঙ্গভঙ্গ রদ ঘোষণা করা হইয়াছে। ক্ষুদ্র বরিশাল সহরেও তাহার ছোঁওয়া লাগিয়াছে। সারাদিন নানা সরকারী ও বেসরকারী উৎসবের মধ্য দিয়া বরিশাল সহরের মানুষ ইংরাজের

জয়গান গাহিয়াছে। সন্ধ্যায় জাহাজ ঘাটায় আলোক ম্যলা—জাহাজে জাহাজে রঙীন আলোক সজ্জা, শীতের আকাশ গড্ সেভ্ দি কিং ইংরাজের জাতীয় সঙ্গীতে মুখরিত। থাকিয়া থাকিয়া বিদেশী জাহাজ কোম্পানীর নোঙর করা জাহাজ তীব্র বাঁশীর ধ্বনিতে ইংরাজ সাম্রাজ্যের জয়ধ্বনি করিতেছে। বড় ছোট জমিদার বাড়ী, ধনী ও বণিকের গৃহে গৃহে দীপাবলীর উৎসব সজ্জা। আকাশে হাউই ছুটিতেছে, রঙ বেরঙের ফানুষ উড়িতেছে, নানা ধরণের শব্দে আকাশ ভারী হইয়া উঠিয়াছে, ফুল ঝরানো তুবড়ি শীতের ঘন অন্ধকারে আলোর ঝলক তুলিতেছে। মানুষ আনন্দে মুখর ও মত্ত। পথে অন্য দিনের তুলনায় জনসমাগম প্রচুর। সবাই স্রোতে গা ভাসাইয়াছে।

কালীচরণ ও বীরা এই সময় বরিশালে হাজির রহিয়াছে। আজ তাঁহারা ত্রৈলোক্যনাথ ও বীরেন্দ্রনাথ হইয়া জন স্রোতের সহিত গা এলাইয়া দিলেও অন্তরে বিদেশী শাসকের এই উদ্ধত উল্লাসে বৃশ্চিক জ্বালা অনুভব করিতেছিলেন। তাঁহারা ব্রিটীশ সাম্রাজ্যের এই প্রগলভ উৎসব-সন্ধ্যায় বিপ্লবী সুলভ উত্তর দিবার সুযোগ খুঁজিতেছিলেন। দৈবক্রমে সুযোগ মিলিয়া গেল। বিপ্লবীদ্বয় দেখিলেন পুলিস ইন্‌স্‌পেক্টর মনোমোহন ঘোষ পথে চলিয়াছেন। একজন নামকরা পুলিশ কর্ম্মচারী ও সরকারের স্নেহ ধন্য রাজপুরুষ। ঢাকা ষড়যন্ত্র মামলার একজন প্রধান সংগঠক ও সংচালক। বিপ্লবীদের দুর্ব্বিসহ যন্ত্রণা, চরম চক্ষুশূল। উপরন্তু ত্রৈলোক্যনাথের মনে অচিরে ভাসিয়া উঠিল আপনার শ্রদ্ধেয় মাষ্টার মহাশয় শীতল চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের লাঞ্ছিত মুখমণ্ডল, অপমানহত সজল চক্ষু। পলাতক ত্রৈলোক্যনাথের সঙ্গে যেদিন সাটির পাড়া স্কুলের এই শিক্ষকের সাক্ষাৎ হয় সেদিন তিনি বলিয়াছিলেন, ঢাকা ষড়যন্ত্র মামলায় তোমার ও সম্পাদক ললিতমোহন

রায়ের বিরুদ্ধে—মনোমোহনের নির্দ্দেশ ও ইচ্ছামত মিথ্যা সাক্ষী দিতে অস্বীকার করায় মনোমোহন এইরূপ রূঢ়ভাবে চপেটাঘাত করিয়াছিল যে তাহাতে আমার কাপড় পর্য্যন্ত নষ্ট হইয়া যায়। শীতলবাবুর চোখে তখন অপমানের জ্বালা অক্ষমের বেদনাশ্রু। ত্রৈলোক্যনাথের কাপড়ে লুকান পিস্তল যেন কথা কহিয়া উঠিল। এই ত সময়—এই ত সুযোগ।

যাহাকে হত্যা করা হইবে সে চলিয়াছে তখন আনন্দ স্রোতে; রঙীন কল্পনায় তাহার মন ভবিষ্যতের ছবি আঁকিতেছে। হঠাৎ বিপ্লবীর পিস্তল গর্জ্জন করিয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে জনত্রাস ইন্সপেক্টর ধরাশায়ী হইলেন। সঙ্গের দেহরক্ষী প্রাণভয়ে পলায়মান। প্রভুকে রক্ষা করিতে আপন পিস্তল বাহির করার কথা ভুলিয়া গেল।

কয়েক সেকেণ্ডের ঘটনা, নিহত ব্যক্তি বুঝিল না কে মারিল, কেন মারিল। নিমেষে কী যেন ঘটিয়া গেল!

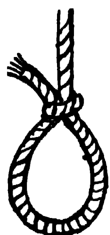
উল্লাসের মাঝে আচম্বিত ঘটনায় জনতার আর্ত্ত কোলাহলে চারিদিক মুখরিত,—বিভ্রান্ত জনতা যে যেখানে পারিল সেইদিকে ছুটিতে সুরু করিয়া দিল। ত্রৈলোক্যনাথ ও বীরেন্দ্রনাথও এই হতচকিত জনতার সহিত মিশিয়া গেলেন। কেহ জানিল না, কেহ দেখিল না, কে বা কাহারা আততায়ী। বিপ্লবীরা ভাল মানুষের মত সহরের বিভিন্ন মহল্লায় বিভিন্ন মানুষের সঙ্গে গল্প গুজব করিতে লাগিলেন—প্রতিক্রিয়া দেখিতে লাগিলেন।

"সেই রাত্রেই দশটার সময় একটী ষ্টীমার বরিশাল হইতে নোয়াখালী যাইতেছিল, আমি ও বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় সেই ষ্টীমারে নোয়াখালী গেলাম। হত্যাকারীকে ও পিস্তল ধরার জন্য প্রত্যেক রেল ও ষ্টীমার ষ্টেশনে পুলিশ নিযুক্ত হইয়াছে, বিভিন্ন স্থানে খানাতল্লাসী চলিতেছে।"

ত্রৈলোক্যনাথ আগেই পিস্তল অন্য স্থানে রাখিয়া আসিয়াছেন

এবং নিরীহ সাধারণ যাত্রী হিসাবে ষ্টীমারের গ্রাম্য যাত্রীদের সহিত নির্ব্বিঘ্নে নোয়াখালী পৌঁছিলেন।

পুলিশ সন্দেহ করিতে পারিল না এই সহজ সরল গ্রাম্য যুবকটী এই দুঃসাহসিক হত্যার নায়ক। তিনি না জানাইয়া গেলে আজও হয়ত অজ্ঞাতই থাকিত।



ধর্ম্মের নামে তীর্থক্ষেত্রে মঠেমন্দিরে নানারূপ ব্যভিচার চলিতেছে। পুণ্যপিপাসু জনগণ তীর্থে যায় মানসিক জ্বালার প্রশমন-প্রয়াসে। কষ্টার্জ্জিত অর্থ অন্তর ভরিয়া দেবতার পাদপদ্মে অর্পণ করে। অনেক তীর্থের মোহান্ত নরনারীর এই সারল্যের সুযোগে যাত্রীদের নিকট হইতে যত পারেন দোহন করিয়াই চলেন, আবার কোন কোন ক্ষেত্রে সরলমতি নারীদেরও সর্ব্বস্বহরণ করিয়া থাকেন। বিপ্লবীরা স্থির করিলেন তীর্থক্ষেত্র কলুষমুক্ত করিতে হইবে।

চট্টগ্রামে সীতাকুণ্ড রেল ষ্টেশনের নিকট চন্দ্রনাথ পাহাড়ে অবস্থিত চন্দ্রনাথ পূর্ব্ব ভারতের একটী প্রসিদ্ধ তীর্থক্ষেত্র। সারা বৎসর ধরিয়াই সেখানে ধর্ম্মপ্রাণ তীর্থ-যাত্রীর আগমন হয়। কিন্তু মোহান্তের বিরুদ্ধে বহু অপবাদ, বহু অভিযোগ।

ত্রৈলোক্যনাথ সেই মোহান্তকে শিক্ষা দিতে নিজে সানুচর

চন্দ্রনাথে উপস্থিত হইলেন। একদিন লাঠিয়াল প্রহরী-পরিবৃত মোহান্ত সান্ধ্য ভ্রমণে বাহির হইয়াছেন। ত্রৈলোক্যনাথ প্রণাম করিয়া উঠিবার সময় অব্যর্থ লক্ষ্যে পিস্তল দিয়া মোহন্তকে নিহত করিলেন। হত্যার পর নির্ব্বিকার ত্রৈলোক্যনাথ পথ দিয়া অতি সাধারণভাবে হাঁটিতেছেন। চারিদিকে উত্তেজনা, জনসাধারণ আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া ইতস্ততঃ ধাবমান। ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেব খবর পাইয়া সাইকেলে ঘটনা স্থলে যাইবার সময় জনস্রোতে পথ করিতে না পারিয়া ত্রৈলোক্যনাথের উপর আসিয়া পড়িলেন। হাকিম বুঝিলেননা যাহার অনুসন্ধানে তিনি যাইতেছেন তাহাকেই ধাক্কা মারিলেন। আততায়ীর সহিত পথেই দেখা হইল। সন্দেহ হইবার উপায় নাই। কারণ, বিকার ভাব ত্রৈলোক্যনাথের মুখে কোন দিনই ছায়া ফেলে না। ষ্টেশনে আসিয়া গমনোদ্যত একটি ট্রেনের তৃতীয় শ্রেণীর কামরায় চুপচাপ বসিয়া পড়িলেন। গামছা মোড়া একটী কাপড়, সাধারণ যাত্রী, সাধারণ বেশভূষা। প্রতি কামরায় অনুসন্ধান চলিতেছে। প্রতি যাত্রীকে পরীক্ষা করা হইতেছে। জনতা জানাইয়াছে এক দাড়িওয়ালা লোক এই হত্যাকারী। সেদিনের বহু ঘটনার সহিত দাড়ির অতি নিকট সম্বন্ধ ছিল। জনতা জানাইত আততায়ী দাড়িওয়ালা। দাড়ি লইয়া ত্রৈলোক্যনাথ কামরায় বসিয়া থাকিলেও কেহ সন্দেহ করিল না। কারণ হাকিম সাহেবের খাস্ আরদালী কামরায় উঠিয়া জানাইল—এ কামরায় আততায়ী নাই। জানিয়াও মিথ্যা বলিল, না, জানিতে পারিল না তাহা জানিবার উপায় নাই।

ট্রেন ছাড়িয়া দেয়। ত্রৈলোক্যনাথ নিশ্চিন্ত হইলেন।



মহারাজ ত্রৈলোক্যনাথ

রতিলাল রায়। ঢাকা পুলিশের হেড্‌কনষ্টেবল। বিপ্লবীদের প্রতিপদের প্রতিবন্ধক। অত্যুৎসাহে দিনরাত্রি বিপ্লবীদের পিছনে পিছনে ছায়ার মত ফিরিতেছে—তাহাদের স্বচ্ছন্দ গতিবিধিতে যথেষ্ট বিঘ্ন সৃষ্টি করিতেছে। স্থির হইল এই পুলিশ কর্ম্মচারিটাঁকে সরাইতে হইবে। অলঙ্ঘনীয় বিধান, ত্রৈলোক্যনাথ নিজের হাতে ভার লইলেন।

ইদানীং রতিলাল রায় প্রত্যহ সদর ঘাটের বাকলাণ্ড বাঁধের ধারে প্রহরারত থাকে, নদীপথে বিপ্লবীদের যাতায়াত লক্ষ্য করে। কালীচরণ মাঝি বিশেষরূপে ব্যতিব্যস্ত হয়। মাঝে মাঝে করোনেশান পার্কে বিপ্লবী সহযাত্রীদের সহিত সলাপরামর্শ ব্যাহত হয়।

১৯১২ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে সেপ্টেম্বর। আরক্ত গোধূলি। কর্ম্মচঞ্চল ঢাকার সদরঘাট নদীপথে আগমন নির্গমনের পথ। জনস্রোত চলিয়াছে—হঠাৎ গুড়ুম্ গুড়ুম্ গুড়ুম্। বিভ্রান্ত জনতা বুঝিতে পারে না—কী ঘটিল, কেই বা মারিল, কে মরিল। পুলিশ অচিরেই অকুস্থলে উপস্থিত। সন্ত্রস্ত জনতার পলাইবার প্রচেষ্টায় বাধা পড়িল। পুলিশের দল চতুর্দ্দিক ঘিরিয়া ফেলিয়াছে। প্রশ্নের পর প্রশ্ন ; জনে জনে জিজ্ঞাসা, কে মারিয়াছে? তাহাকে দেখিতে কেমন? কোন দিকে গিয়াছে? রক্তাপ্লুত হেড্‌কনষ্টেবলের দেহ মাটিতে পড়িয়া আছে। যাহারা নজর করিতে পারিয়াছিল এবং পুলিশের হাত হইতে পরিত্রাণ চাহিল তাহারা সকলেই বলিল—একটা লম্বা দাড়িওয়ালা লোক হত্যা করিয়াছে। আশেপাশের সকল রাস্তাই অনুসন্ধান করা হইল কিন্তু কোন লম্বা দাড়িওয়ালা মানুষের হদিস্ মিলিল না। ইহার পূর্ব্বে আরও কয়েকটী রাজনৈতিক হত্যা অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণানুযায়ী প্রত্যেক ক্ষেত্রেই আততায়ীর লম্বা দাড়ি ছিল। পুলিশ দিশাহারা হইয়া

পড়ে—পাইকারীহারে দাড়ি পরীক্ষা চলিয়াছে। যেখানে দাড়ি সেখানেই পুলিশ। দাড়ি থাকিলেই থানায় ডাক। দাড়িতে দাড়িতে থানা ভরিয়া গেল। কালীচরণ মাঝি পরিচ্ছদ পাল্টাইয়াছে —কিন্তু দাড়ির জঙ্গল তেমনই রহিয়া গিয়াছে।

পরের দিন প্রত্যুষে ত্রৈলোক্যনাথ পূর্ব্বসন্ধ্যার ঘটনাস্থলের দিকে চলিয়াছেন। পুলিশের প্রতিক্রিয়া ও ঘটনাপ্রবাহের গতি-প্রকৃতি লক্ষ্য করাই উদ্দেশ্য। কিন্তু পুলিশের দলের তখনও সজাগ সতর্ক দৃষ্টি। ত্রৈলোক্যনাথকে পুলিশ থামিতে হুকুম করে। ত্রৈলোক্যনাথ ভালমানুষের মত থামিয়া পড়েন। পুলিশের সন্দেহ হইয়াছে ; প্রথম সন্দেহ দাড়ি ও দাড়ির গঠন, দ্বিতীয় সন্দেহ কোন কোন সন্দেহ ভাজন রাজনৈতিক ব্যক্তিদের সহিত তাহাকে নদীর ধারের পার্কে মাঝে মাঝে শলা পরামর্শ করিতে দেখা গিয়াছে। তাহারা ত্রৈলোক্যনাথকে চিনিল না। সন্দেহ করিল সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের সহিত পরিচয়ের পরিপ্রেক্ষিতে ও লোকের বলা দাড়ির ভিত্তিতে।

দারোগাবাবুর নির্দ্দেশমত ত্রৈলোক্যনাথকে থানায় যাইতে হইল। ত্রৈলোক্যনাথের পকেটে একটী হুইশিল।

প্রশ্ন হইল—হুইশিল কেন ?

তৎক্ষণাৎ জবাব হইল—গ্রামের ফুটবল খেলা পরিচালনা করিবার জন্য কিনিয়াছি।

"কোন্ জায়গা থেকে কেনা ?"

"নারায়ণগঞ্জ থেকে।"

উৎসাহী পুলিশ ছাড়িল না—নারায়ণগঞ্জে লইয়া আসিল। দোকান দেখিতে চায়। বাঁশীটী বহু পূর্ব্বের কেনা। ডাকাতির কালে ডাকাত সর্দ্দার পাঞ্জাবীর হাতে ইহাই বাজে ; কাজ শেষ হইলে 'সবশেষের' নিশানা দেয়।

অনেক দিন আগে কোন্ দোকান হইতে কেনা হইয়াছিল ত্রৈলোক্যনাথের স্মরণ নাই। তাই বহু চেষ্টা করিয়াও দোকান দেখাইতে পারিলেন না। প্রথমেই পুলিশের সন্দেহ হইয়াছিল, এবার সে সন্দেহ আরও বাড়ে। চতুর্দ্দিকে খবর যায়, অনুসন্ধান চলে।

প্রকাশ হইয়া পড়ে ধৃত ব্যক্তি স্বয়ং ত্রৈলোক্যনাথ—ঢাকা ষড়যন্ত্র মামলার পলাতক আসামী। তদন্তসাপেক্ষে তাঁহাকে ঢাকা জেলে রাখা হইল। চারিবৎসর পর ত্রৈলোক্যনাথ আবার কারাগারে আসিলেন, জীবনে দ্বিতীয়বার কারাদর্শন হইল।

তাঁহারই কথা—"আমি এখন ঢাকা জেলে আছি। খুনী মামলার আসামী বিশেষতঃ পুলিশ কর্ম্মচারী খুন, কাজেই আমার প্রতি ব্যবস্থার খুব কড়াকড়ি। বিশ ডিগ্রী 'সেলে' আছি, রাত্রে দুই ঘণ্টা পর পাহারা বদল হয়, নূতন সিপাহী কাজের ভার লওয়ার সময় অর্থাৎ প্রত্যেক দুই ঘণ্টা পরপর আমাকে জাগাইয়া দেখে আমি সেলে আছি কিনা। পুলিশের অনুসন্ধান চলিতে লাগিল।"

রতিলালের আততায়ীকে গ্রেপ্তারের সাহায্য করিতে ৫০০০৲ টাকা পুরস্কার ঘোষিত হইয়াছে। পুলিশ লোকের পর লোক লইয়া আসে; সনাক্তকরণ চলে।

আনীত জনতা দাড়ি দেখে, মানুষটাকে দেখে, অবশেষে বলিয়া যায় "এ দাড়ি সে দাড়ি নয়।" এমনকি যাহারা সেদিনের প্রত্যক্ষদর্শী তাহারাও পাঁচ হাজারের লোভে ধরা দিল না। পুলিশকে বলিয়া গেল—"এ দাড়ি সে দাড়ি নয়। দাড়ির মিল থাকিলেও থাকিতে পারে, মানুষের মিল নাই।"

একটীমাত্র লোকও সেদিন বলে নাই এ ব্যক্তিই সেদিনের আততায়ী। তাই ত্রৈলোক্যনাথের বিরুদ্ধে খুনের মামলা পুলিশ চালাইতে পারিল না।

"পুলিশ তখন বিফলমনোরথ হইয়া আমার বিরুদ্ধে ঢাকা ষড়যন্ত্র মামলা চালাইতে স্থির করিল, কিন্তু সরকার তাহাতে রাজী হইল না। মামলা চালাইতে হইলে বহু টাকা ব্যয় হইবে, পূর্ব্বের সমস্ত সাক্ষীকে ডাকিতে হইবে, বিশেষতঃ পূর্ব্ব মামলার ললিতবাবু, যদু, বিনোদ খালাস পাইয়াছে, পুলিনবাবুর উচ্চ আদালতে মাত্র সাত বৎসর কারাদণ্ড হইয়াছে—আমাকে আট্‌কাইতে পরিবে কিনা তারও কোন স্থিরতা নাই। কাজেই সরকার আমার নামে ষড়যন্ত্র মামলা চালাইলেন না। তখন পুলিশ আমার বিরুদ্ধে অগতির গতি ১০৯ ধারা চালাইল। ঢাকার অতিরিক্ত ম্যাজিষ্ট্রেট রায় সাহেব যামিনী মোহন দাস মহাশয়ের এজলাসে আমায় বিচার আরম্ভ হইল, কিন্তু মামলা চলিল না। কয়েক মাস হাজত ভোগ করিবার পর আমি বেকসুর খালাস পাইলাম।"

মুক্তি পাইবার পর ত্রৈলোক্যনাথের মেজদা তাঁহাকে বাড়ী লইয়া গেলেন। সেই যে এক প্রভাতে লেবু পাতা ও লঙ্কা দিয়া পান্তা ভাত খাইয়া ত্রৈলোক্যনাথ বাজিতপুরের নাম করিয়া বাড়ী হইতে পাঁচটী টাকা লইয়া বাহির হইয়াছিলেন, তাহার পর দীর্ঘ চারি বৎসর বাদে স্ব-গৃহে পদার্পণ করিলেন। সে দিনের ত্রৈলোক্যনাথ আর আজিকার ত্রৈলোক্যনাথে অনেক প্রভেদ ঘটিয়াছে। মানসিকতায়, দৃঢ়তায়, বিচক্ষণতায়, সংগ্রামী চেতনায় ত্রৈলোক্যনাথ আজ অসীম শক্তিধর পুরুষ।

সেদিন তিনি বিচরণ করিতেন স্বপ্ন রাজ্যে, আজ তিনি বাস্তব ক্ষেত্রে উপনীত। পরিণত বয়সে আসিয়া ত্রৈলোক্যনাথ এই রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড সম্বন্ধে মন্তব্য করিতেছেন।

"বিপ্লবীরা নিজেদের লোককেও হত্যা করিয়াছে। চরিত্রহীনতার জন্য কেহ কেহ নিহত হইয়াছে, আবার যাহাদিগকে পুলিশের গুপ্তচর বলিয়া নিঃসন্দেহ হওয়া গিয়াছে তাহাদিগকে হত্যা করা

হইয়াছে। শুধু সন্দেহের বশবর্ত্তী হইয়া কাহাকেও হত্যা করা হয় নাই। কাহারও উপর সন্দেহ হইলে নিঃসন্দেহ হওয়ার জন্য তাহার পিছনে লোক লাগান হইত। পুলিশের গুপ্তচর প্রমাণ হইলে তাহাকে গুম্ করা হইত অর্থাৎ কোন নিভৃত স্থানে লইয়া গিয়া হত্যা করা হইত।"

আপাত দৃষ্টিতে অপরাধ মূলক হইলেও অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্যাবলী ব্যক্ত করিয়া ত্রৈলোক্যনাথ লিখিতেছেন---

"আমি পরাধীন ভারতে বহু ডাকাতি করিয়াছি, খুন করিয়াছি, চুরি করিয়াছি, নোট জাল করিয়াছি—কিন্তু যাহা কিছু করিয়াছি—সবই দেশের স্বাধীনতার জন্য, কর্ত্তব্যের দায়ে। আমার বিদ্বেষ ভাব হইতে বা ব্যক্তিগত স্বার্থ সাধনার জন্য কিছু করি নাই। আমি যাহাকে হত্যা করিয়াছি—তাহার আত্মার কল্যাণ কামনাই করিয়াছি, তাহার পরিবারের শুভ চিন্তাই করিয়াছি। ডাকাতি বা খুন আমাদের পেশা ছিল না। আমরা যাহাদের বাড়ীতে ডাকাতি করিয়াছি, যাহাদিগকে হত্যা করিয়াছি আমরা জানিতাম তাহারা আমাদের স্বদেশবাসী। আজ স্বাধীন ভারতে আমাদের হাতে যদি রাজনৈতিক ক্ষমতা থাকিত তবে আমরা যাহাদের বাড়ীতে ডাকাতি করিয়াছি তাহাদের বংশধরদের মধ্যে আজ যাহারা বিপন্ন তাহাদিগকে সরকারী সাহায্য দান করিতাম।"

বিপ্লবীরা এই প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ ছিলেন। Bengal Branch of Independent kingdom of united India সরকারেরর নামে একখানি পত্রে এই প্রতিশ্রুতি দেখিতে পাই। ডাকাতি সংঘটিত হইবার পর বাড়ীর মালিক পত্র পান—"আপনার নিকট হইতে ৯৮৯১ টাকা ৫ পাই ঋণ-স্বরূপ আমাদের তহবিলে জমা হইয়াছে। স্বাধীনতা লাভ করিয়া আমরা আপনার এই টাকা সুদসমেত পরিশোধ করিব।"

গীতামস্তকে লইয়া যে দীক্ষা গ্রহণ করা হইত সেই গীতার বাণী বিপ্লবীরা জীবন দিয়াও অনুসরণ করিবার প্রয়াস করিতেন— অশোচ্যং অকীর্ত্তিকরং অনার্য্যযুষ্টং ভাববিলাসে নীতিবোধের মানসিকতায় ক্লৈব্যগ্রস্ত দ্বিধাপরায়ণ হইতেন না। লক্ষ্য দেশের সার্বিকমুক্তি, মূকজনতার সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি, স্বদেশবাসীর স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা। পথ উপলক্ষ্য মাত্র।



পুলিশ এতদিনে এইবার বুঝিতে পারিল ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্ত্তী কে? তাই তিনি যখন দ্বিতীয়বার কারাগার হইতে ছাড়া পাইয়া স্বগ্রামে চলিলেন, দুজন গুপ্তচরও তাঁহার অনুসরণ করিল। দিবারাত্রি পশ্চাৎচর হইয়া রহিল। ত্রৈলোক্যনাথ যখন যেখানে যাইতেন—তাহারা ছায়ার মত তাঁহার পিছু পিছু যায়। আলোর পিছনেই ছায়া প্রতিফলিত হয়, কিন্তু এই ছায়াসম মানুষদুটী রাতের অন্ধকারেও সঙ্গ ছাড়ে নাই; সাম্‌নে তারা কখনই আসে না, অলক্ষ্যে, পশ্চাদনুসরণই করে।

ইহাদের নিরন্তর পশ্চাদ্ধাবন ত্রৈলোক্যনাথকে অস্বস্তিকর অবস্থায় লইয়া আসিল। নিজস্ব গতিবিধি পদে পদে ব্যাহত। স্বাধীন বিচরণ যেন তাঁহার বিস্মরণ হইতে বসিয়াছে; সব সময়

নিজেকে সংযত রাখিতে হয়। অবাধ কাজকর্ম্ম ক্ষুন্ন হইতে থাকে।

ত্রৈলোক্যনাথ স্থির করিলেন—পলাইতে হইবে। ইহাদের শ্যেন দৃষ্টির বাহিরে না যাইতে পারিলে কোন কাজই করা চলিবে না। তাই এক গভীর নিশীথে ইহাদের অলক্ষ্যে গৃহত্যাগ করিলেন।

বিস্ময়াভিভূত গুপ্তচরদ্বয় যখন জানিতে পারিল পাখী অজান্তে উড়িয়া গিয়াছে, তখন চারিদিকে তার চলিয়া গেল। সমগ্র পূর্ব্ব-বাঙলায় পুলিশ দপ্তর সক্রিয় ও সতর্ক হইয়া উঠিল। রতিলাল হত্যার মামলায় বেশীর ভাগ গুপ্তচরের দল ত্রৈলোক্যনাথের আকৃতির সহিত পরিচিত হইয়া গিয়াছে। এতদিন নাম জানিত, এইবার ব্যক্তিকে চিনিয়াছে। তাই পথে ত্রৈলোক্যনাথকে অত্যন্ত সতর্ক ও সন্ত্রস্ত থাকিতে হইল। দুই দিন পর অতি গোপনে ও নির্বিঘ্নে তিনি ঢাকায় পৌঁছিলেন। এমন স্থানে আত্মগোপন করিতে হইবে যেখানে পুলিশের সন্দেহ হওয়া অসম্ভব। উপযুক্ত স্থান সরকারী হাকিমের বাড়ী তদুপরি তিনি যদি রাজভক্ত বলিয়া সুবিদিত হন। রায় সাহেব যামিনীমোহন দাস ঢাকা হইতে ময়মনসিংহ বদ্‌লী হইলেও তাঁহার পরিবারবর্গ ঢাকাতেই থাকেন। তাঁহারই এজলাসে ত্রৈলোক্যনাথের বিরুদ্ধে ১০৯ ধারার মামলা কিছু দিন পূর্ব্বেই হইয়া গিয়াছে। রায় সাহেবের পুত্রেরা অনুশীলন সমিতির সভ্য। তাঁহারা আনন্দে ও সাগ্রহে ত্রৈলোক্যনাথকে তাঁহাদের গৃহে স্থান দিলেন। এইখানেই ইংরাজ শক্তির পরাজয়।

বেশী দিন এইরূপ ভাবে থাকা সমীচীন নহে। পূর্ববঙ্গে ত্রৈলোক্যনাথ পুলিশের অতি পরিচিত ব্যক্তি। কখন কোথায় কাহার চোখে পড়িয়া যাইবেন! অনেক চিন্তা করিয়া ত্রৈলোক্যনাথ উত্তরবঙ্গের উদ্দেশ্যে পাড়ি দিলেন। নূতন নাম লইলেন 'বিরজা'।

ত্রৈলোক্যনাথের রাশনাম। নূতন কর্ম্ম ক্ষেত্র—নূতন ব্যক্তি। যোগসূত্র বাহির করিতে পুলিশের সময় লাগিবে।

উত্তর বঙ্গে এতদিন অনুশীলন সমিতির প্রচার ও বিস্তার ছিল না, প্রভাবও অল্প। ত্রৈলোক্যনাথ এইবার উত্তরবঙ্গকে আপনার কর্ম্মকেন্দ্র করিলেন। ত্রৈলোক্যনাথ হারাইয়া গেলেন।

নূতন নেতা বিরাজবাবু উত্তর বাঙলায় সংগঠনের নিয়ামক ও সঞ্চালক হইলেন। বিরজাবাবু গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে সহর হইতে সহরান্তরে স্বচ্ছন্দে ও স্বাধীন ভাবে ঘুরিয়া বেড়ান। গুপ্তচরেরা যোগসূত্র হারাইয়া ফেলিয়াছে। সংগঠন অতি দ্রুত ব্যাপক ও বিস্তৃত হইয়া চলে। মালদহে সমিতির কোন শাখা নাই, কোন সভ্যও নাই। বিরজা স্থির করিলেন মালদহে সমিতির সূচনা করিতে হইবে। প্রথমেই প্রয়োজন নিরাপদ বাসস্থান। সঙ্কল্প স্থির হইয়া গেল।

বহরমপুর কলেজের বি, এ, শ্রেণীর একটী ছাত্র সমিতির সভ্য। তাহার বাড়ী মালদহ সহরে। ছাত্রটীর পিতা, কাকা ও দাদা সকলেই সরকারী কর্ম্মচারী। শিক্ষিত ও ধর্ম্মভীরু সংসার। এইরূপ গৃহই ত্রৈলোক্যনাথের পক্ষে উপযুক্ত বাসস্থান।

কলেজের ছুটীতে তিনি ছাত্রটীর সঙ্গ লইলেন। পূর্ব্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী ছাত্রটী গৃহে আসিয়া জানাইল, মালদহে তিনি নবাগত, গাড়ীর কামরায় পরিচয়, এ-সহরে কেহই তাহার জানা নাই। তাই তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া সে আপনার গৃহেই আনিয়াছে। অতিথি-বৎসল গৃহ-স্বামী সাগ্রহে আহ্বান জানাইলেন। বিরজাবাবুর অভীষ্ট আশ্রয় মিলিয়া গেল।

ছাত্রটীর দাদার সহিত বিরজাবাবুর ধীরে ধীরে প্রগাঢ় ভালবাসা জমিয়া উঠে; কিছুদিন পর মালদহ ত্যাগ করিবার পূর্ব্বে ত্রৈলোক্যনাথ দাদাকে অনুরোধ জানাইলেন—

"আমার একটী বন্ধু, বাড়ীর অবস্থা খুব খারাপ এখানে চাকুরীর সন্ধানে আসিবে। আপনাদের বাসায় অনেকগুলি ছেলেপিলে আছে, তাহাকে যদি আপনি আপনাদের বাসায় স্থান দেন তবে সে ছেলেদের পড়াইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে চাকরীর চেষ্টা করিতে পারিবে।"

দাদা বলিলেন—"টাকা পয়সা বিশেষ কিছু দিতে পারিব না।" ঢাকা সমিতির কেন্দ্রে চিঠি চলিয়া গেল। অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই সর্ব্বক্ষণের কর্ম্মী পূর্ণ চক্রবর্ত্তী বিরজাবাবুর চিঠি ও সুপারিশ লইয়া মালদহে নির্দ্দিষ্ট গৃহে আসিয়া উপস্থিত।

পূর্ণের লেখাপড়ার জ্ঞান খুব বেশী দূর নয়। তবুও তাহাকে গৃহশিক্ষক হইয়া থাকিতে হইবে। সমিতির পত্তন করিতে হইবে। অচিরে তাহার বিদ্যা প্রকাশ হইয়া পড়িলেও তাহাকে প্রস্থান করিতে হয় নাই—কারণ নিজের স্বভাব-মাধুর্য্য ও কর্ম্ম দক্ষতার গুণে সে গৃহকর্ত্রীর বিশেষ প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিয়াছিল। সংসারের পাঁচ জনের মতই স্বজন বলিয়া বিবেচিত হইত।

পূর্ণের প্রচেষ্টায় স্থানীয় বিদ্যালয়ের বহু শিক্ষক ও ছাত্র ধীরে ধীরে সমিতির সভ্য তালিকাভুক্ত হইতে থাকে। গ্রামে গ্রামেও সমিতির শাখা স্থাপিত হইল। পূর্ণ এখন মালদহে সুপ্রতিষ্ঠিত সত্তা। মালদহ ছাড়িবার জন্য আর সে অনুরোধ জানায় না। মালদহের প্রতি তাহার মায়া পড়িয়া গিয়াছে। মালদহে তাহার কাজ শেষ হইয়াছে। তাই সংগঠনের নির্দ্দেশে তাহাকে মালদহ ছাড়িয়া কুমিল্লায় চলিয়া যাইতে হইল।

একটানা পরিশ্রম ও শরীরের প্রতি অনাদরে ত্রৈলোক্যনাথ এই সময় অত্যন্ত অসুস্থ হইয়া পড়িলেন। পুরান কাশী হাঁপানির টানে রূপান্তরিত হইয়া উঠে। ত্রৈলোক্যনাথ চিকিৎসার্থে কলিকাতায় আসিলেন।

তাঁহার উত্তরবঙ্গ হইতে কলিকাতা আসিবার পূর্ব্বে—

কলিকাতার পুলিশ ,বাত্রা ডাকাতির অন্যতম পলাতক আসামী অমৃত—ওরফে—শশাঙ্ক হাজরার সন্ধান পাইল। তিনি তখন কলিকাতার এক বরফ কলে কাজ করিতেছেন ও এক কামরায় আপন বাসগৃহে বোমার খোল তৈয়ারী করিয়া চলিয়াছেন। এই খোলই চন্দননগরের শ্রীমণীন্দ্র নায়কের তত্ত্বাবধানে বোমায় রূপান্তরিত হইয়া ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে বিপ্লববাদীদের হাতে হাতে ফিরিতেছিল। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসের রাজকীয় শোভা যাত্রায়—বড়লাট হার্ডিঞ্জের উপর যে বোমা পড়ে তাহাও এই 'রাজাবাজারী' খোলেই প্রস্তুত। শশাঙ্ক হাজরার বোমার কারখানায় অর্থাৎ সেই এক কামরায় বাসা বাড়ীর তল্লাসীসূত্রে বহু নূতন খবর পুলিশের হাতে আসিল। আর আসিল একটী নূতন নাম—বিরজা। পুলিশের খাতায় এতদিন বিরজা বলিয়া কোন নামই নথীভুক্ত ছিল না। তাই পুলিশের চমক লাগে—কে এই বিরজা ? অনুসন্ধান চলে, খোঁজ মিলে না।

এই সময় বিরজা উত্তরবঙ্গের মাটিতে বিপ্লবের শিকড় সযত্ন পরিচর্য্যায় সুদৃঢ় ও সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া তুলিতেছেন।



সে দিনের বিপ্লবী নেতাদের হাতে হাজার হাজার টাকা ঘুরিতেছে—সংগৃহীত বিপুল অর্থ তাঁহাদের হাত দিয়াই ব্যয় হইতেছে। ইচ্ছা করিলেই তাঁহারা রাজকীয় পরিবেশে ও বিলাসের

মধ্যে নিজেদের দৈনন্দিন জীবন যাপন করিতে পারিতেন। কিন্তু আদর্শে অনুপ্রাণিত একনিষ্ঠ তরুণের দল কৃচ্ছ্রসাধনায় দিন কাটাইয়া চলেন। ত্রৈলোক্যনাথের জীবন এই আদর্শের এক পূর্ণ প্রতিচ্ছবি।

তাঁহারই ভাষায়—"আমরা খুব সাধারণ ভাবে জীবন যাপন করিতাম। কলিকাতা সহরে আমাদের বাস করিবার জন্য মাসিক ৩।৪ টাকার বেশী খরচ হইত না। খাবারও ছিল অতি সাধারণ—সকালে মুড়ি, দ্বিপ্রহরে ও রাত্রে ডাল ভাত অথবা মাছের ঝোল-ভাত। কোন কোন দিন আমাদের দুটী তরকারী হইত, আবার কোন কোন দিন উপবাসেও থাকিতে হইত।

আমাদের বাসায় কোন আসবাব থাকিত না, আসবাবের মধ্যে থাকিত বিছানা, তাহাও অতি সাধারণ। বাসার সমস্ত কাজ আমরা নিজেরাই করিতাম।"

কোন কোন সময়ে বা কোন কোন স্থানে বিপ্লবীদের এক পয়সার ছাতু ও এক ঘটী জল খাইয়া রাত্রের আহার সম্পন্ন করিতে হইত। তাহার জন্য কোন অনুযোগ ছিল না।

"আমাদের পান তামাক সিগারেট খরচও ছিল না। রাস্তায় আমাদের কুলীর প্রয়োজন হইত না—সাধারণতঃ পায় হাঁটিয়াই চলাফেরা করিতাম। কলিকাতায় তখন বাস ছিল না। বিশেষ জরুরী কাজ না থাকিলে ট্রামেও উঠিতাম না শ্যামবাজার হইতে কালীঘাট সাধারণতঃ আমরা হাঁটিয়াই যাইতাম। আমাদের সাধারণতঃ একটি জামার বেশী দুইটী জামা থাকিত না। জামা কাপড় আমরা ধোপার বাড়ী দিতাম না। নিজেরাই জামাকাপড় পরিষ্কার করিতাম। অসুখ-বিসুখ হইলে আমরা সাগু বার্লির উপর নির্ভর করিয়া থাকিতাম, ডাক্তারের ধার বিশেষ ধারিতাম না। অবস্থা খারাপ হইলে একমাত্র ডাক্তারের কাছে যাইতাম।" এই যে সন্ন্যাসীকল্প কৃচ্ছ্র সাধনা, এ কিসের জন্য?

জীবনের আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করিতে, কল্পনাকে বাস্তবায়িত করিতে, সর্ব্বহিতের মহাযজ্ঞে আত্মাহুতি দিবার দুর্ব্বার মানসে সে-দিনের তরুণের দুর্জ্জয় আত্মপ্রত্যয় ও কর্ম্মনিষ্ঠা।

স্বাধীনতোত্তর যুগে ·আজ সেদিনের ছবি স্বপ্নবৎ গল্পকাহিনী। এই মরণপণ অভিযাত্রীদের মনে নেতৃত্বপদ লইয়াও কোন দ্বেষ বা বিভ্রান্তি স্থান পায় নাই। চিরদিনের মত সেদিনও গতযৌবন ও যৌবনের আদর্শগত সংঘাত, নরমের সহিত গরমের মতদ্বৈধতা, পরিবর্ত্তনকামী যুব-মানসের সহিত স্থিতিশীলতাকামী যৌবনোত্তর দৃষ্টিভঙ্গীর চিরাচরিত দ্বন্দ্ব ছিল।

"যুবকদের দল ছিল নির্ভীক, নিঃস্বার্থ। তাহারা চাহিত আগে চলিতে। আগে চলিতে গেলে বিপদ আছে। যুবকদের আশা আকাঙ্খা ছিল অনেক প্রসারিত—তাহারা চাহিত পূর্ণ স্বাধীনতা। তাই প্রগাঢ় আত্মবিশ্বাসের মধ্য দিয়া তাহারা চলিয়াছে পূর্ণ স্বাধীনতার কণ্টকময় পথে।"

কতই বা বয়স এইসব সংগ্রামশীল তরুণদলের। আঠার হইতে তিরিশের মধ্যে ইহাদের বয়স। প্রবীনেরা সরিয়া গিয়াছেন, সংশয়াকুল গোষ্ঠী বিদ্রুপ করিয়াছে। ইংরাজ সরকার সন্ত্রাসবাদী বলিয়া ঘৃণা জাগাইতে সচেষ্ট। তবু তরুণের দল অচল, অটল, নিষ্কম্প, নির্ব্বিকার।

"এই সকল অল্পবয়স্ক যুবকদের স্কন্ধে যখন দায়িত্বভার চাপিয়াছে তখন তাহাদের প্রতিভা ও কর্ম্মশক্তি অধিকতর বৃদ্ধি পাইয়াছে, এই সব কর্ম্মীদের মধ্যে যাঁহারা প্রতিভা ও দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন তাহারাই সকলের নিকট নেতৃত্বস্থানীয় বলিয়া গন্য হইয়াছেন।"

"যাহারা নেতৃস্থানীয় ছিলেন তাঁহারাই নিকটে যাঁহারা থাকিতেন তাহাদের সহিত পরামর্শ করিয়া কাজ করিতেন। তখন কাহাকে পরামর্শসভায় ডাকা হইল কি কাহাকে পরামর্শ সভায় ডাকা

হইল না উহা লইয়া কেহ অভিমান করিতেন না। সেদিন আমরা বলিতে পারিতাম আমরা সকলেই নেতা অথবা আমাদের মধ্যে কোন নেতাই নাই, আমরা সকলেই কর্ম্মী।"

"মনের কোণে আমাদের সকলেরই সুর ছিল এক, বেসুরো আওয়াজ কোন দিন আমাদের মধ্যে প্রকাশ পায় নাই। যেন আমরা ছিলাম সকলেই একটী সূত্রে গাঁথা।"

একবার ত্রৈলোক্যনাথের একটী কোটের প্রয়োজন হইল। অসুস্থ শরীরে উপযুক্ত বস্ত্রের প্রয়োজন। দোকানে গেলেন, কোটও দেখিলেন কিন্তু কিনিলেন সস্তার ইঁদুরে-কাটা অনেকগুলি তালি দেওয়া একটী বাতিল করা কোট। প্রয়োজনের জন্য তাঁহার বস্ত্র, সৌন্দর্য্য বা আভিজাত্য দেখাইবার জন্য নহে।

ত্রৈলোক্যনাথ জীবনে দুইবার চলচ্চিত্র দেখিয়াছেন। একবার ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে যখন তিনি কলিকাতায় আসেন তখন শশাঙ্ক হাজরা দুই আনার টিকিট কিনিয়া মেছুয়া বাজারে তাঁহাকে চলন্ত ছবি দেখাইতে লইয়া যান। দ্বিতীয় বার ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে যখন রাজসাহীর কংগ্রেস নেতা সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র মহাশয়ের সঙ্গে নওঁগার কংগ্রেসনেতা রজনী সান্ন্যালের বাড়ীতে উঠেন তখন ছবি কেমন ভাবে কথা বলে তাহা দেখিবার জন্য সান্যাল মহাশয়ের নিজস্ব চিত্রগৃহে গিয়াছিলেন। কেন যাইতেন না, কোন মানসিকতায় সিনেমা দেখিতেন না তাহা নিজেই ব্যক্ত করিয়াছেন।

"আমরা কখনও থিয়েটার বায়োস্কোপ দেখিতে যাইতাম না। একদিন থিয়েটায় দেখিলে চরিত্র নষ্ট হইবে আমি মনে করি না। কিন্তু আমরা যদি বিনা পয়সাও থিয়েটার দেখি, তবে দলের লোকেরা থিয়েটার পয়সা খরচ করিয়া দেখিবে। তখন তাহাদের কিছু বলিতে পারিব না।"

'আপনি আচরি' ধর্ম পরকে শিখায়' এই বাণীর প্রকাশ আমরা দেখিতে পাই ত্রৈলোক্যনাথের জীবন-সত্তায়। পরকে সন্দেশ খাইতে নিষেধ করিবার পূর্ব্বে নিজে সন্দেশ খাওয়া ত্যাগ না করিলে কোন নিষেধ, কোন বাণীই ফলপ্রসূ হয় না এবং যিনি বিপরীত আচরণ করেন তিনি নেতা হইলেও শ্রদ্ধা লাভ করেন না ও অনুগামীদের উদ্বুদ্ধ করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইয়াই পড়ে।

শ্রীনলিনীকিশোর গুহ ত্রৈলোক্যনাথের তখনকার ছবিটি সুচারু রূপে অঙ্কিত করিয়াছেন তাঁহার "বাঙলায় বিপ্লববাদ" গ্রন্থে।

"ত্রৈলোক্যনাথ ঘর বাড়ী ছাড়িয়া আসিয়াছেন। সুদিনে দুর্দ্দিনে তিনি অবিচলিত। যাহা লক্ষ্য করিয়া তিনি বাহির হইয়াছেন সেদিকে একৈব লক্ষ্য। তাঁহাকে সুদিনেও যেমন নীরবে, অবিচলিত চিত্তে নিরলস ভাবে কর্ম্ম করিতে দেখিয়াছি, দুর্দ্দিনেও তেমনি দেখিয়াছি। ইঁহার ভরসা যে কোথায় বুঝিতাম না। কৃতকার্য্য হইলেও উৎফুল্ল নহেন, অকৃতকার্য্য হইলেও অবসাদগ্রস্ত নহেন।"

যে গীতা মস্তকে ধারণ করিয়া তিনি বিপ্লবের দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন সেই গীতার উদ্গাত স্থিত প্রজ্ঞের জীবন-লক্ষণে তিনি স্বভাব-উদ্বুদ্ধ। তাই তাঁহার সম্বন্ধেও বলা চলে—'সুখ-দুঃখে সমেকৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ' মানসিকতায় সমাহিত সাধক ত্রৈলোক্যনাথ জীবনে হয়ত অনেক জীবন হরণ করিয়াছেন, অনেক অর্থ লুণ্ঠন করিয়াছেন তবু কোন কালিমাই তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই, কারণ পার্থসারথির শাশ্বত বিধান—'ততো যুদ্ধায় যুজ্যস্ব নৈবং পাপমবাপ্স্যসি'। "কী একটা আনন্দ যেন বুকের মধ্যে জমিয়া আছে। গীতায় আছে কর্ম্মেই অধিকার ফলে নহে সে কথা আমরা যাহারা বলি, সংস্কৃত শ্লোক অনর্গল বলিয়া যাই সেই আমরা বিফল হইলে ভগ্ন মনোরথ জনিত দুঃখ যথেষ্ট ভোগ

করি। কিন্তু ত্রৈলোক্যনাথকে গীতার শ্লোক আওড়াইতে শুনি নাই, গীতার বাণী তাঁহার মধ্যে সার্থক হইয়াছে দেখিয়াছি।

দলের অর্থ যেন তাঁহার কাছে বুকের রক্ত হইতেও মূল্যবান। অর্থ ব্যয় সম্বন্ধে এত কৃপণতা, সত্যকার কৃপণ ভিন্ন কেহ করিতে পারে না। সহস্র সহস্র টাকা হাতে আসিয়াছে কিন্তু নিজে যে হোটেলে খরচ কম সেখানেই আহারের বন্দোবস্ত করিয়াছেন। যে সময়কার কথা বলিতেছি--তখন ছাত্রদের মেসে সাধারণত এক বেলার খোরাকী খরচা ছিল তিন আনা। হোটেলে ছিল দুই আনা। ত্রৈলোক্যনাথ খুব না ঠেকিলে তিন আনা ব্যয় করিয়া মেসে খাইতেন না। তাঁহার গায়ে দেখিয়াছি—একটি শক্ত কোট। সেই একটী কোটই তিনি শীত বা গ্রীষ্ম সমভাবে গায়ে দিতেন। ময়লা হইলে নিজে কাচিয়া লইতেন, সেই কোটেও তালি দেখিয়াছি। অত্যধিক পরিশ্রম করিলে মানুষ একটু আধটু জল খাবার খায়। কিন্তু তাঁহাকে দুই বেলায় ভাত খাওয়া ছাড়া আর কিছু খাইতে আমরা দেখি নাই। ভবানীপুর হইতে কলিকাতা প্রায় হাঁটিয়া আসিয়াছেন। মোটর তো স্বপ্নের অতীত, ট্রামেও উঠেন নাই। একবার মনে আছে দারুণ গ্রীষ্মে অনেকটা রাস্তা হাঁটিয়া পার্কের ভিতর আসিয়া একটু ছায়ায় বসিয়াছেন, মুখে ক্লান্তির চিহ্ন সুপরিস্ফুট। বলিলাম—চলুন ঐ সরবতের দোকানে। হাসিয়া বলিলেন—সরবৎ তো ছেলেমানুষে খায় আর খায় নবাব সওকত-জঙ্গ। ভোগবিমুখ ত্রৈলোক্যনাথকে কখনও ত্যাগের বক্তৃতা দিতে শুনি নাই কিন্তু তাঁহার সমগ্র জীবনটী, জীবনের প্রত্যেকটী খুঁটি-নাটি ব্যাপার ছিল এই ত্যাগ নিষ্ঠায় মণ্ডিত, অথচ কোথাও কোনও আড়ম্বর নাই কোন অভিনয় নাই।

তিনি যেন সবার চাইতেই ছোট, হিমালয় ও ধরণীর মতই যেন তিনি সহিষ্ণু; ভয় নাই, ভাবনা নাই, রাগ নাই। অথচ যে

পথে পা দিয়েছেন তাহাতে ভয়, ভাবনা ও রাগের কারণ যথেষ্টই আছে।”

পুরুষোত্তম মনুষ্যত্বের গুণ বর্ণনা করিয়াছেন।

“অদ্বেষ্টা সর্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ
নির্মমো নিরহঙ্কারঃ সমদুঃখসুখ ক্ষমী।
সন্তুষ্টঃ সততং যোগী যতাত্মা দৃঢ় নিশ্চয়ঃ
ময্যর্পিত মনোবুদ্ধির্যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ।
যস্মান্নোদ্বিজতে লোকো লোকান্নোদ্বিজতে চ যঃ
হর্ষামর্ষভয়োদ্বেগৈর্মুক্তো যঃ স চ মে প্রিয়ঃ।
অনপেক্ষ শুচির্দক্ষ উদাসীনো গতব্যথঃ
সর্বারম্ভপরিত্যাগী যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ।
যো ন হৃষ্যতি ন দ্বেষ্টি ন শোচতি নকাঙ্ক্ষতি
শুভাশুভ পরিত্যাগী ভক্তিমান্ যঃ স মে প্রিয়ঃ।
সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপোমানয়োঃ
শীতোষ্ণ সুখদুঃখেষু সমঃ সঙ্গবিবর্জ্জিতঃ।
তুল্যনিন্দাস্তুতির্মৌনী সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ
অনিকেতঃ স্থিরমতির্ভক্তিমান্ মে প্রিয় নরঃ।

গীতার মূর্ত্ত বাণী ত্রৈলোক্যনাথের জীবন শ্রীচৈতন্যের জীবন মন্ত্রের সার্থক প্রতিধ্বনি—“তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুণা।”



"আমি এখন শয্যাশায়ী, আমার কাসি হাঁপানিতে পরিণত হইয়াছে, কেহ কেহ বলিতে লাগিলেন ইহা যক্ষ্মা রোগ। আমার বন্ধুরা সেবা শুশ্রূষা করিতেছে। প্রত্যহ দিনের পর দিন হয়ত মায়ের কাছেও এমন যত্ন মিলে না। আমি মনে মনে খুব বিব্রত হইয়া পড়িয়াছি, মনে করিতেছি—আমি সমিতির একটা গলগ্রহ হইয়া পড়িয়াছি।" অসুস্থ ত্রৈলোক্যনাথ সেই সময় কলিকাতা থাকাকালীন তাঁহার অবস্থার বর্ণনা দিতেছেন। চিরবিপ্লবীর বিদ্যুৎ গতি মনকে দেহভার বারবার বাধা দিতেছে। ত্রৈলোক্যনাথ ভাবেন, মৃত্যু যখন এই রোগের অবধারিত পরিণতি—তখন তিলে তিলে মরিয়া লাভ কি, একটা কিছু করিয়া গৌরবময় মৃত্যুই ত শ্রেয়ঃ। তিনি একটা কিছু করিয়া মরিতে চাহেন। বন্ধুরা রাজী নহেন; তাঁহাকে বাঁচাইয়া রাখিতে চাহেন। কতই বা তাঁহার বয়স; চব্বিশ পঁচিশ বৎসরের যুবক। সম্ভাবনাময় জীবন মরিবে! তাহা হইতে পারে না, হইতে দেওয়া যায় না।

বিপ্লবী নলিনীকিশোর গুহ তখন ছাত্র। ফুস্‌ফুস সংক্রান্ত রোগের ডাক্তার শরৎকুমার মল্লিকের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ পরিচয়। তিনি ত্রৈলোক্যনাথকে সেথায় লইয়া গেলেন। সেই সূত্রে আরও অনেক ডাক্তার তাঁহার পরীক্ষা করিলেন। চিকিৎসা চলিল কিন্তু সুফল কিছুই মিলিল না। ডাক্তারের দল পরামর্শ দিলেন—সমুদ্রতীরে বায়ু পরিবর্ত্তন প্রয়োজন। বিপ্লবী বন্ধুরা ত্রৈলোক্যনাথকে পুরী পাঠাইতে মনস্থ করিলেন।

"দিন স্থির হইল—রাস্তায় attendent হিসাবে নলিনীবাবু আমার সঙ্গে চলিলেন। সেবা শুশ্রূষার জন্য আরও দুইজন সঙ্গী চলিল। কিন্তু পুরীতে আমার কোন উপকার হইল না, বরং রোগ বৃদ্ধি পাইল। সেখানকার এক ডাক্তার আমাকে ভুবনেশ্বরে যাইতে বলিলেন। আমি ভুবনেশ্বরে গেলাম। ভুবনেশ্বরেও আমার কোন

উপকার হইল না। কিছুদিন থাকিবার পর সেখান হইতে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলাম।”

এই যাতায়াত অতি সঙ্গোপনে, অতি সাবধানে করিতে হইতেছে। বিপ্লবীর দল আর এক বিপ্লবী চূড়ামণিকে লইয়া পথে বাহির হইয়াছেন। বিরজাকে পুলিশ খুঁজিতেছে। ত্রৈলোক্যনাথকে পুলিশ চিনিয়াছে। উপরন্তু ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দের শেষাশেষি বরিশাল ষড়যন্ত্র মামলা স্নুরু হইয়াছে, তাহার এক অন্যতম আসামী স্বয়ং ত্রৈলোক্যনাথ। সেদিনের ব্রিটীশের পুলিশ বাহিনী শুধু সতর্ক নহে সদাজাগ্রত। তাহার গুপ্তচর সংস্থা সুসংহত, সুচতুর ও সুপ্রসিদ্ধ। ইহাদের নজর এড়াইয়া এইরূপ পরিবেশে বিপ্লবীরা সাধারণ যাত্রীর মত ট্রেনে চলিতেছেন, প্রবাসে বাস করিতেছেন।

গড়পাড়া স্কুলের হেডমাষ্টার থাকাকালে ত্রৈলোক্যনাথের নাম ছিল শশী। ময়মনসিংহের অধিবাসী বলিয়া এবং মহারাজা শশীকান্তের গুণমুগ্ধ বলিয়া হয়ত তিনি শশী নামটীতে নিজেকে ভূষিত করিয়াছিলেন। ইতিমধ্যে ঘনিষ্ঠ সুহৃদ ও সহযোগীর দল তাঁহাকে নিজেদের মধ্যে রসিকতা করিয়া মহারাজ বলিয়া ডাকেন। রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসী মহারাজদের মত কানঢাকা টুপিটি প্রায় সময়েই ত্রৈলেক্যেনাথের মাথায় শোভা পাইত। তাই বন্ধুর দল মহারাজ নামের সূত্রপাত করেন। পুরীতে আসিয়া তাই তিনি মহারাজ শশী বলিয়াই পরিচিত হইলেন, সাধারণ মানুষ সপারিষদ ত্রৈলোক্যনাথকে দেখিয়া মনে করিল মহারাজা শশীকান্ত। ধীরে ধীরে ইতিহাস হারাইয়া গেল, ত্রৈলোক্যনাথ সহচর অনুচর সকলের কাছেই মহারাজ বলিয়াই খ্যাত হইলেন। চরিত্রের গুণাবলীর সঙ্গে যখন নামের অর্থ মিলিয়া যায় তখনই সে নাম সার্ব্বজনীন ও শাশ্বত হইয়া পড়ে। মহারাজার মতন উদারতায়, চারিত্রিক দৃঢ়তায় ও ও অনুশাসনের ক্ষমতায় মহারাজ উপাধিটী স্থায়ী হইয়া পড়িল।

ত্রৈলোক্যনাথ না বলিলেও শুধু মহারাজ বলিলেই বিপ্লবী সমাজে ব্যক্তিটীকে নিরূপণ করা চলিত, ধীরে ধীরে এ নাম জন সমাজেও পরিচিত হইয়া উঠিল। তাই ত্রৈলোক্যনাথের নাম উচ্চারণ করিতে হইলে মহারাজ উপাধিটী ত্যাগ করা চলে না।

শ্রীনলিনীকিশোর গুহ মহারাজের এই সময়কার অবস্থা অতি বিশদভাবে তাঁহার 'বাংলায় বিপ্লববাদ' গ্রন্থে বর্ণনা করিয়াছেন।

"কাসি বাড়িয়া উঠিল। হাঁফানির অবস্থা। ক্রমে বন্ধুবান্ধবদের কাছে ধরা পড়িতে লাগিল। শরীর যে দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে তাহাও লুকান সম্ভব নহে। অনুরোধে তিরস্কারে শেষকালে ডাক্তারের কাছে গেলেন। যে ডাক্তারের সঙ্গে পরিচয় অর্থাৎ টাকা লাগিবে না, সেখানেই গেলেন। ডাক্তার একটা মিক্শচার দিলেন দৈনিক চারবার ঔষধ খাইতে হইবে। সপ্তাহ খানেকমাত্র ঔষধ খাইয়া একদিন ডাক্তারের কাছে গিয়া ত্রৈলোক্যনাথ বলিলেন—ডাক্তারবাবু এমন একটা ঔষধ দিন যা জল দিয়ে খেতে না হয়, গ্লাসেরও দরকার না হয়। ডাক্তার বুঝিলেন, বুঝিয়া একটা পেটেণ্ট ট্যাব্লেট দিলেন। সুবিধা হইল। ঔষধ খাইবার জন্য আর বাসায় ফিরিবার প্রয়োজন নাই। রাস্তায় হাঁটিয়াই ট্যাবলেট মুখে ফেলা যায়। জলের কলও রাস্তায় আছে। একদিন বলিলাম—'ঔষধ যে খান না, মারা যাবেন তো শেষে'; অমনি হাসিয়া বলিলেন—'হ্যাঁ মরা গাছের ফল কিনা, একটু সর্দ্দি কাসি হলেই মারা যায় কি?' বলিলাম—ডাক্তার বলে নাই Rest নিতে?"

'ডাক্তার তো কতই বলে, না বল্‌লে কি ওদের ব্যবসা চলে?'

হাঁফানি ক্রমেই বাড়িল, কাশির সঙ্গে রক্তও দেখা দিল। বন্ধুবান্ধবেরা ঠিক করলেন—তাঁহাকে মরিতে দেওয়া হইবে না। জোর করিয়া চিকিৎসা চালাইতে হইবে। তাঁহাকে তত্ত্বাবধানে থাকিতে হইবে। শিশুকে মানুষ যে রকম শাসন করে ত্রৈলোক্যনাথের

উপর তেমনই শাসন চলিত। তাঁহার দুগ্ধের বন্দোবস্ত হইল। ঔষধপত্র কতকটা নিয়মিত হইল। শুশ্রূষার জন্য লোক নিযুক্ত হইল। ত্রৈলোক্যনাথ নিরুপায় হইয়া বলেন--'কেবল অপব্যয়'।

কলিকাতায় রোগের কিছু হইল না, ডাক্তার বায়ু পরিবর্ত্তন করিতে বলিলেন। হাওড়ায় গাড়ীতে ওঠা গেল—বলা বাহুল্য তৃতীয় শ্রেণীতে। গাড়ীতে দুইবার ফিট্ হয়। একটু একটু চোখ বুঝিয়া থাকেন; কিন্তু বিন্দু মাত্র হা হুতাশ নাই। বায়ু পরিবর্ত্তনে যাওয়ার পর ঔষধ পথ্যের যথা সম্ভব সুবন্দোবস্ত হইল। ত্রৈলোক্য নাথ বলিলেন—'আপনারা যে কি করিতেছেন, organisation টাকার অভাবে suffer করিতেছে, নষ্ট হইতেছে, এখানে আমার জন্য এত ব্যয়। Organisation-এর স্বার্থের দিক্ দিয়া এটা অন্যায়। তিনি বলেন—'সমুদ্র পারে মানুষ অমনি ভাল হয়, অত দুধের দরকার নাই'—দুধের পরিমাণ কমিল। এদিকে কোন চেষ্টাই সফল হইল না, রোগ বাড়িতেই লাগিল। যক্ষ্মার পরিণামে তিনি ক্রমেই দুর্ব্বল হইতে লাগিলেন। কাসির ফিট্ যখন উঠিত তখন সেই নীরব কর্ম্মীর দিকে চাহিয়া থাকা বস্তুতঃ শক্ত হইত। ফিট্ থামিলেই একটু হাসিয়া ফেলিতেন। যেন কিছুই হয় নাই।

আবার কলিকাতা আনা হইল। এখানে তিলে তিলে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি, দেখিয়া মনে হইয়াছে এই সমাহিত জীবন, এই ঔদার্য্য, এই অমানুষিক সহিষ্ণুতা এই ত্যাগ কোথা হইতে আসিল। কোন দিন সাধন ভজন করিতে দেখি নাই। কিন্তু নিষ্কাম কর্ম্মের ভিতর দিয়া যে ত্রৈলোক্যনাথ স্বভাবতই এই অনাড়ম্বর জীবন লাভ করিয়াছিলেন তাহাতে সন্দেহ কি?"

এত বড় রোগ, তিলে তিলে শরীর ভাঙিতেছে এতটুকু বিরক্তি নাই, বিকার নাই, বিরাগ নাই।

"মানুষ অনেক দিন রোগে ভুগিলে খিট্‌খিটে হয় ; আজ রান্নাটা খারাপ হইয়াছে, খাইতে পারি না—সময়মত পথ্যটা না পাইলে রোগী বিরক্তও ত হয়। কিন্তু এই যে নিদারুণ ব্যাধি—অসহনীয় হাঁপানী ও কাসির যন্ত্রণা তবু কিন্তু ত্রৈলোক্যনাথ পাথরের মত অবিচলিত। একদিনও শুনি নাই, এটা খাইতে ইচ্ছা করে বা করে না, একদিনও বলেন নাই, ক্ষুধা পাইয়াছে খাইতে দাও। বাড়ীঘর নহে, ঠাকুর চাকরও নাই। অনভ্যস্ত বিপ্লবকর্ম্মী কেহ রান্না করিতেছে। ডালের সঙ্গে জল মিশে নাই, কোন দিন হয়ত খুবই বিলম্ব হইয়া গেল কিন্তু রোগীর বিরক্তি নাই—এ দিকে যেন তাঁহার খেয়াল নাই।

একদিন অত্যন্ত দেরী হইয়া গিয়াছে, প্রায় একটা বাজে। তিনি খাইতে বসিলেন কিন্তু কেমন করিয়া সেদিন ভাতগুলি সব নষ্ট হইয়া গেল। আবার ভাত বসিল। সেবারত যুবক দুঃখ করিয়া বলিল, বড় দেরী হইয়া গেল—ত্রৈলোক্যনাথের একটুও বিরক্তি নাই চাঞ্চল্য নাই। তিনি যে রক্ত মাংসের মানুষ—তাঁহার যে ক্ষুধা আছে তাহার পরিচয় পাওয়া যাইত না। ত্রৈলোক্যনাথ হাসিয়া রহস্য করিয়া বলিলেন—'রাধতে সয় বাড়তে সয়না।' মানুষের রোগ হইলে কেহ যদি বাতাস করে, মাথায় হাত বুলায়—ভাল লাগে—তাঁহার সে ব্যসনও ছিল না। অনবরত কাসি, কাসির পর একটু রক্ত পড়িল। সেই ফিটের পর ভয়ানক ক্লান্ত হইতেন। কিন্তু একদিনও বলেন নাই একটু বাতাস কর। একথা কখনও বলেন নাই আমার কাছে একজন থাক। বরং কোন কাজ থাকিলে বলিয়াছেন, আমার কাছে থাকার কি দরকার, ওকেই তো ও কাজে পাঠান যায়।"

অর্জ্জুন প্রশ্ন করিলেন—স্থিতপ্রজ্ঞের রূপ কেমন, ভাব কেমন ভাষা কেমন তার চলন কেমন—তাকে চিন্‌ব কেমন করে।

কৃষ্ণ উত্তর দিলেন—

“প্রজহাতি যদা কামান্ সর্ব্বান্ পার্থ মনোগতান্।
আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্টঃ স্থিত প্রজ্ঞস্তদোচ্যতে॥
দুঃখেম্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ।
বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীর্মুনিরুচ্যতে॥
যঃ সর্বত্রানভিস্নেহস্তত্তৎ প্রাপ্য শুভাশুভম্।
নাভিনন্দতি ন দ্বেষ্টি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা॥

ত্রৈলোক্যনাথের জীবনচর্য্যা কি শ্রীকৃষ্ণের বাণীর সার্থক রূপায়ণ নহে? স্থিতপ্রজ্ঞের বাস্তব প্রতিচ্ছবি নহে? আজন্ম সাধক ত্রৈলোক্যনাথ গীতা-বিধৃত চৈতন্য সত্তারই বিকশিত জীবন।



১৯১৪ সালের প্রথম দিকে যখন ত্রৈলোক্যনাথ পুরী হইতে কলিকাতায় ফিরিলেন তখন কলিকাতার বৈপ্লবিক আবহাওয়া উত্তপ্ত। দিল্লী ষড়যন্ত্র মামলার আসামী রাসবিহারী বসুর উপর পনর হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করা থাকিলেও তিনি নির্ব্বিবাদে ভারতের একপ্রান্ত হইতে আর এক প্রান্ত পর্য্যন্ত নির্ব্বিকার চিত্তে নানাবেশে নানা পরিচয়ে অবাধ ভ্রমণ করিয়া ফিরিতেছেন। চন্দন-নগরের সমিতি ঢাকা সমিতির সহিত সংযুক্ত হইয়া গিয়াছে।

রাসবিহারী মাঝে মাঝে কলিকাতায় আসেন, আলাপ আলোচনা করেন। বারাণসীর সংগঠননেতা শচীন্দ্রনাথ সান্যালও কলিকাতায় আসেন, মহারাজ প্রভৃতি নেতৃস্থানীয় বিপ্লবীদের সহিত মিলেন। রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা হেড গোয়াডকার কলিকাতায় শিক্ষার্থী থাকাকালে বিপ্লবের দীক্ষা লইয়াছেন। ভারতের কিশোর ও যুবকদের শারীরিক, চারিত্রিক ও আত্মিক উন্নতি বিধানে তাঁহার প্রচেষ্টা অনুশীলন সমিতির মানুষ গড়ারই অনুরূপ।

রাসবিহারী আভাস পাইলেন—বিশ্বযুদ্ধ আসন্ন। ইংরাজ বহু সমস্যার সম্মুখীন হইবে। আঘাত হানিবার সেই হইবে সুবর্ণ সুযোগ।

সংগঠন চাই, একতা চাই, অর্থ চাই, অস্ত্র চাই। সেই মাহেন্দ্র ক্ষণে ইংরাজ রাজশক্তিকে ভারতের মাটিতে চরম আঘাত হানিতে হইবে। পরাধীন জাতির ভাগ্যে এ লগ্ন বারবার আসে না। শাসনশক্তি যখন তাহার শত্রুর হাত হইতে আত্মরক্ষায় ব্যস্ত থাকে তখনই তাহাকে আঘাত করিবার মহা সুযোগ। রাসবিহারী তৎপর হইলেন। তাঁহার গুপ্ত পত্রিকা 'লিবার্টি'তে তিনি আহ্বান জানাইতে থাকেন। ত্রৈলোক্যনাথের শরীর বাধা সৃষ্টি করিতেছে তবু তাঁহার বৈপ্লবিক কার্য্যধারায় বিরতি নাই। অসুস্থ শরীরে তিনি কলিকাতায় ঘুরিতেছেন; আলাপ-আলোচনা চলিতেছে, কার্য্যক্রম স্থির হইতেছে। বিপ্লবী কল্পনা আসন্ন উষার ছবি আঁকিতেছে।

শ্রীনলিনীকিশোর গুহ লিখিতেছেন—"এমনই যখন তাঁহার শরীরের অবস্থা তখন কলিকাতায় ঢাকায় ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে প্রধান প্রধান বিপ্লবীরা ধৃত হইয়াছেন। ত্রৈলোক্যনাথ এই শরীর লইয়াই খাটিতে আরম্ভ করিলেন। ছেলেগুলিকে ভরসা দিতে লাগিলেন—গুরুতর কাজে হাত দিতে অগ্রসর হইলেন।"

কলিকাতার পার্কগুলিই তখন বিপ্লবীদের গোপন মিলন কেন্দ্র,

আলাপ আলোচনার প্রধান স্থল। পুলিশের গুপ্তচরদের তাই প্রতিটি পার্কের উপর শ্যেনদৃষ্টি।

ডাক্তারিতে কোন সুফল না পাইয়া ত্রৈলোক্যনাথ বালাজী মহারাজ নামে এক সাধুর চিকিৎসাধীন আছেন। সাধুর নির্দ্দেশমত প্রাতে নয় দশ ঘটিকার সময় একঘণ্টা গায়ে সরিষার তেল মালিশ করিয়া গঙ্গায় অবগাহন করিতে হইবে এবং কমপক্ষে পঞ্চাশ ষাটটী ডুব দিতে হইবে। অপরাহ্নে গড়ের মাঠে প্রত্যহ মুক্ত বায়ু সেবনার্থে পদচারণা করিতে হইবে। ত্রৈলোক্যনাথ প্রত্যহ উক্ত নির্দ্দেশগুলি নিয়মমত পালন করিয়া চলেন। সম্পূর্ণ সুস্থ না হইলেও কিছুটা ভাল বোধ করিতেছেন।

অপরাহ্নে ভ্রমণের পর ক্লান্ত ত্রৈলোক্যনাথ ইডেন উদ্যানের এক বেঞ্চিতে আসিয়া বসিলেন। এখানেও গুপ্তচরের দৃষ্টি। একজনের সন্দেহ হইল হয়ত বা কোন বিপ্লবী হইবে। পাশে আসিয়া বসিল। ত্রৈলোক্যনাথের মতই যেন একজন উন্মুক্তবায়ু সেবনের জন্য পদচারণা করিতে করিতে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছেন। ইহার পরের ছবি শ্রীজিতেশচন্দ্র লাহিড়ীর 'নমামি' গ্রন্থে সুপরিস্ফুট।

"কলিকাতা ইডেন গার্ডেনে একখানি বেঞ্চে একটী লোক বসে বসে কাস্‌ছে। শুক্‌নো মুখ—ময়লা পোষাক, রুক্ষ চুল দাড়ি, চোখে মুখে একটা হতাশার ভাব। হরদম কেসেই চলেছে সে। ইতিমধ্যে একটী আই, বি স্পাই এসে বেঞ্চের অপর প্রান্তে বসে চেয়ে দেখছে কেসো রোগীকে। দাড়ির দিকেই তার বিশেষ মনোযোগ। খানিকটা ইতস্তত করে দাড়িওয়ালাকে জিজ্ঞাসা করল 'আপনার নাম কি?' লোকটী তখন রীতিমত হাঁফাচ্ছে। একটু দম নিয়ে বল্‌ল সে 'নাম ত্র—জ' পরবর্ত্তী অংশটুকুই ঢেকে দিল কাসিতে।

স্পাইটী প্রশ্ন কর্‌ল—'অসুখ নাকি?'

লোকটী মাথা ঝুঁকিয়ে জানাল--'হ্যাঁ'। তারপর ধীরে ধীরে বলল—'থাইসিস্ বলে সকলে সন্দেহ করে।' এবার স্পাইটী উঠে দাঁড়ালো। সহানুভূতির সুরে বল্ল—বড় পাজি জিনিষ—ভীষণ ছোঁয়াচে, খবরদার যেন বে-থা করবেন না। আবার ফ্যাৎ করে দীর্ঘশ্বাস ফেলে দাড়িওয়ালা। থমথমে ভারীগলায় সে বল্লে—'আমার তুই বিয়ে, এখন ভরসা'—আকাশের দিকে তর্জ্জনী নির্দ্দেশ কর্‌ল সে।"

স্পাইটী বুঝিল না পাঁচহাজার টাকার পুরস্কার তাহার হাতছাড়া হইয়া গেল।

১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্টে তুচ্ছ কারণ উপলক্ষ্য করিয়া কাইসারের জার্ম্মানীর সঙ্গে বিশ্বপরিব্যপ্ত ব্রিটীশ সাম্রাজ্যশক্তির প্রচণ্ড সংঘাত সুরু হইয়া গেল। পিতৃভূমির মহিমায় উদ্ধতমানস উন্নতশির নীট্‌শের 'রক্ত ও লৌহের' নবমন্ত্রে দীক্ষিত জার্ম্মাণ ক্ষাত্রশক্তি ইংরাজকে রণাঙ্গণে চরম আঘাত হানে, আর বাঙলা তথা ভারতের অবদমিত, লাঞ্ছিত জন-চেতনা আনন্দোৎফুল্ল হয়।

মানবিক চেতনার আদিসূত্র 'শত্রুর শত্রু মিত্র' অলক্ষ্যে প্রভাব বিস্তার করে। বিপ্লবীদের অন্তর নাচিয়া উঠে, প্রাণে গুঞ্জরণ জাগে—এসেছে, সময় এসেছে।

আঘাত হানিতে অস্ত্র চাই। এই আগষ্টেই অস্ত্র ব্যবসায়ী রডা কোম্পানীর পঞ্চাশটী মাউশার পিস্তল ও প্রচুর কার্ত্তুজ চুরি গেল। সে অস্ত্র চোরা পথে বিভিন্নস্থানে বিপ্লবীদের হাতে আসিয়া পৌঁছে।

ত্রৈলোক্যনাথ লিখিতেছেন—"বিদেশের সহিত যোগাযোগ স্থাপনের জন্য অনুশীলন সমিতির নেতারা কেদারেশ্বর গুহকে জার্ম্মানীতে পাঠান! এদিকে দেশে দেশে অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ, বোমা তৈয়ার ও ভারতীয় সৈন্যদিগকে হাত করার চেষ্টা চলিতে থাকে। সকল দলের কর্ম্মীদের মধ্যেই যুদ্ধের এই উৎসাহ উদ্দীপনা দেখা

দিল। আন্তরিকতার সহিত সকলেই বিপ্লবের আয়োজন করিতে লাগিল।"

শ্রীনলিনীকিশোর গুহ লিখিতেছেন "১৯১৪ খ্রীঃ অব্দে বাঙলার বিপ্লববাদীরা নূতন ভাবে কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়। বাঙলার বিভিন্ন দিকে ছোট বড় বিভিন্ন সমিতি কাজ করিতেছিল। স্বদেশী আন্দোলন হইতে আরম্ভ করিয়া ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সমস্ত সমিতিই সমান কার্য্য দক্ষতা দেখান নাই। বিচ্ছিন্ন হইয়া ছিল বলিয়াই অনেকে তেমন সুযোগ করিয়া উঠিতে পারে নাই। কিন্তু ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে যখন ইংরাজের সঙ্গে জার্ম্মানীর যুদ্ধ বাধিয়া গেল অধিকাংশ সমিতিই সম্মিলিত হইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইল।"

সেদিনের চাঞ্চল্য, সেদিনের আবেগ, সেদিনের আশা, সেদিনের প্রদীপ্ত কর্ম্মোল্লাস যে বিপুল উদ্দীপনায় বিপ্লবীদের মনে আলোড়ন তুলিয়াছিল তাহারই অভিব্যক্তি ত্রৈলোক্যনাথের ভাষায়।

"সকল দলের কর্ম্মীদের মধ্যেই যুদ্ধের উৎসাহ উদ্দীপনা দেখা গেল। আন্তরিকতার সহিত সকলেই বিপ্লবের আয়োজন করিতে লাগিল। গভর্ণমেণ্ট নিশ্চেষ্ট বসিয়া থাকে নাই, বিপ্লবীদিগকে ধৃত করিয়া বিপ্লবীদল পঙ্গু করার চেষ্টা করিল। বাঙলা দেশেই বারশত বিপ্লবী ধৃত হইয়া জেলে আবদ্ধ হইল। শ্রীরাসবিহারী বসু, শচীন্দ্রনাথ সান্ন্যাল, গিরিজা দত্ত, অনুকূল চক্রবর্ত্তী, অমৃত সরকার, পণ্ডিত পরমানন্দ, পৃথ্বী সিং, জোবালা সিং, মোহন সিং, পণ্ডিত জগৎরাম, বিষ্ণুগণেশ পিংলে, বিনায়ক রাও কাপ্‌লে প্রভৃতি অনুশীলন সমিতির নেতারা ও কর্ম্মীগণ লাহোর হইতে ঢাকা পর্য্যন্ত এবং মধ্যপ্রদেশে সৈন্যদল হাত করার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

ঐ সময় ভারতীয় সৈনিকদের মধ্যে স্বদেশের স্বাধীনতার বাণী প্রচার করার ফলে সৈনিকদের মন আনন্দে নাচিয়া উঠিল, তাহারা বিদেশী সরকারের জন্য প্রাণ বিসর্জ্জন দেওয়া অপেক্ষা

স্বদেশের স্বাধীনতা অর্জ্জন করাই শ্রেয়ঃ বলিয়া মনে করিল। • রাস-বিহারীর সংস্পর্শে ভারতীয় সৈনিকদিগের আত্মসম্বিৎ ফিরিয়া আসিল, তাহারা দেখিল ভারতের স্বাধীনতা তাহাদেরই হাতের মুঠার মধ্যে। ঐ সময়ে ভারতে মাত্র বার হাজার ব্রিটীশ সৈন্য ছিল।

ভারতীয় সৈন্যগণ স্থির করিলেন তাহারা হঠাৎ ব্রিটীশ সৈন্য-দিগকে আক্রমণ করিয়া পরাজিত ও বন্দী করিয়া প্রকাশ্য ঘোষণা দ্বারা জাতীয় গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠা করিবেন।"

অসুস্থ ত্রৈলোক্যনাথ পঙ্গু শরীরকে আয়ত্তে-রাখিতে প্রত্যহ গঙ্গা স্নান করেন, মুক্ত বায়ু সেবনার্থে অপরাহ্নে ময়দানে ভ্রমণ করেন, আর অবশিষ্ট সময় আগামী দিনের সংগঠনী কার্য্য-কলাপের সহিত স্বপ্নাবিষ্ট অন্তরে নিজেকে নানা কাজে নিবিষ্ট রাখেন।

বৎসর শেষ হইতে চলিয়াছে; গভর্ণমেণ্ট ঘরে ও বাহিরে উভয় ক্ষেত্রেই বিব্রত, ব্যস্ত ও বিপর্য্যস্ত। সারা দেশ জুড়িয়া গ্রেপ্তার চলিতেছে, পলাতকদের সন্ধান চলিতেছে।

গুপ্তচর খবর পাইল গ্রীয়ার পার্কে (বর্ত্তমানে মহিলা উদ্যান) অপরাহ্নে বিপ্লবীদের সমাবেশ হইবে। পুলিশ জাল পাতিল। টেগার্ট, ল্যোমান, কলসন তখন তরুণ কর্ম্মনিষ্ঠ পুলিশ কর্ম্মচারী—তাহারাও হাজির।

পুলিশের সহিত বিপ্লবীদের ধ্বস্তাধ্বস্তি সুরু হইল। এই পলাইবার ও ধরিবার সন্ধিক্ষণে কালীচরণের বীরা (বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়) ল্যোমান্ সাহেবের দক্ষিণ হস্তের কব্জি মচ্‌কাইয়া দিলেন। বীরেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে পরে ল্যোমান নিজেই ত্রৈলোক্যনাথকে বলিয়াছিলেন—

"He is a dangerous man. If he could have arms he would have killed all of us."

ইহার কিছুদিন পরই ত্রৈলোক্যনাথ গ্রেপ্তার হইলেন, ১৯১৪

খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে। ত্রৈলোক্যনাথ নিজেই গ্রেপ্তার কাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন।

"১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে শেষ ভাগে একদিন আমি গঙ্গার ঘাটে বসিয়া তেল মালিশ করিতেছি—এমন সময় দেখি পুলিশের দারোগা প্রভাত বিশ্বাস মহাশয় আমার দিকে অগ্রসর হইতেছেন। তখন আমার এইরূপ অবস্থা যে দৌড় দিবারও ক্ষমতা নাই। মনে হইল এযাত্রা আর রক্ষা পাইব না। দারোগাবাবু আমার নিকট আসিয়া অতি সম্মানের সহিত পায়ে ধরিয়া প্রণাম করিয়া বলিলেন, কর্ত্তব্যের অনুরোধে গ্রেপ্তার করিলাম এবং তিনি আমাকে একখানা গাড়ীতে উঠাইয়া লইয়া চলিলেন। সঙ্গে কয়েকজন কনেষ্টবলও ছিল। লালবাজার হাজতে আনিয়া আমাকে আটক করিলে আই, বি-র মধ্যে মহা হৈ চৈ পড়িয়া গেল। বহুলোক আমাকে দেখিতে আসিল। এমন কি ল্যোমান সাহেব, টেগার্ট সাহেবও আসিলেন। ল্যোমান সাহেব আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া দারোগাবাবুকে পুনঃ পুনঃ ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন।"

এই দারোগা বাবুটী উপলক্ষ্য বটে ; ত্রৈলোক্যনাথকে ধরিবার কৃতিত্ব তাঁহার কিছুই নাই। কারণ তিনি ঢাকা সহরের সাধারণ পুলিশ কর্ম্মচারী। অনুশীলন সমিতির এক পুরাতন সভ্য—বর্ত্তমানে দলছাড়া—বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া গোয়েন্দা বিভাগের বড় কর্ত্তার নিকট খবর দিল ত্রৈলোক্যনাথ প্রত্যহ গঙ্গা স্নান করেন। সে বাসা চিনিত না। তাই গঙ্গার ঘাটে গ্রেপ্তার করা স্থির হইল। কিন্তু অগণিত স্নানার্থীর মধ্যে ত্রৈলোক্যনাথকে সনাক্ত করিবে কে ? তাই ঢাকার পুলিশ দারোগাকে কলিকাতায় আনাইয়া গ্রেপ্তারের নির্দ্দেশ দেওয়া হইল। বিশ্বাস মহাশয় রাম ও রাবনের মধ্যে মারীচের অবস্থায় পড়িলেন।

জবানবন্দী লওয়া সুরু হইল। ত্রৈলোক্যনাথ কোন কিছু

বলিতে অস্বীকার করিলেন। তবু ল্যোমান প্রশ্নের পর প্রশ্ন করিয়া চলেন। ত্রৈলোক্যনাথের পৈতায় বাঁধা চাবিটি দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করেন—

'কিসের চাবি ?'

উত্তর পান—তালার চাবি।

ল্যোমান—কিসের তালা ?

ত্রৈলোক্যনাথ—লোহার তালা।

ল্যোমান—এই তালাটা কিসের জন্য ব্যবহার করিতে ? ইহা কি দরজার তালা, না ট্রাঙ্কের ?

ত্রৈলোক্যনাথ—ইহা দরজারও হইতে পারে, ট্রাঙ্কেরও হইতে পারে।

ল্যোমান—তোমার জামা কোথায় ?

ত্রৈলোক্যনাথ—জানি না।

ল্যোমান—অমৃত হাজরাকে চিন ?

ত্রৈলোক্যনাথ—আমি কি করিয়া চিনিব ?

ল্যোমান—তুমি তাহার বাসায় যাইতে ?

ত্রৈলোক্যনাথ—কেন তাহার বাসায় যাইব ?

ল্যোমান রাগে গরগর করে। স্নানের বসন ব্যতীত ত্রৈলোক্যনাথের আর কিছুই নাই। ল্যোমানের কাছে জামা কাপড় চাহিলেন। পরের দিন সাহেব নিজের অর্থব্যয় করিয়া জামা-কাপড় কিনিয়া সার্জেন্ট মারফৎ পাঠাইয়া দিলেন। বিস্মৃত সার্জেন্ট—ত্রৈলোক্যনাথকে জানাইল—'তুমি সত্যই ভাগ্যবান্, সাহেব নিজের টাকায় তোমার জামা কাপড় কিনিয়া দিলেন।' হাসিয়া ত্রৈলোক্যনাথ জবাব দেন—বামুনের ছেলে দান গ্রহণের অভ্যাস আছে।

ল্যোমান সম্বন্ধে ত্রৈলোক্যনাথ স্মৃতিচারণ করিয়াছেন।

"ল্যোমান সাহেব সকলের সহিত খুব মিশিতে পারিতেন।

তিনি প্রায়ই আমার সহিত গল্প করিতে আসিতেন। অবশ্য সব সময়ই তাঁহার চেষ্টা থাকিত কথার ফাঁকে আমার কাছ হইতে কিছু বাহির করিতে পারেন কিনা। একদিন তিনি বলিলেন—'তোমাদের বীরেন আমার হাত ভাঙিয়া দিয়াছে।'

আমি ল্যোমান সাহেবকে বলিলাম—'বীরেনকে থানায় লইয়া গিয়া পরে নিশ্চয়ই ইহার প্রতিশোধ লইয়াছিলেন।

ল্যোমান সাহেব বলিলেন—'নিশ্চয়ই না, বীরনের সঙ্গে যখন তোমার দেখা হইবে তখন জিজ্ঞাসা করিলেই তাহা জানিতে পারিবে।'

তিনি আরও বলিলেন—'তোমাদের কয়েকজন বাঙালী কর্ম্মচারী আমাকে পরামর্শ দিয়াছিল তাহার বিরুদ্ধে মামলা করিতে। কিন্তু আমি বলিয়াছিলাম—সে যেমন আমাকে মারিয়াছে আমিও তেমনি তাহাকে মারিয়াছি, সমান সমান হইয়াছে।'

বাঙালী পুলিশ কর্ম্মচারীর দল হয়ত ভুলিয়া গিয়াছিলেন যে ল্যোমান সাহেবের জন্ম পরাধীন দেশে হয় নাই, তিনি স্বাধীন দেশের লোক।

ল্যোমান আরও বলেন 'বীরেন খুব সাহসী, তাহার গায়ে বেশ জোর আছে। আমি যখন ছাত্র ছিলাম তখন কত মারামারি করিয়াছি। তবে আমাদের মারামারি রাস্তাঘাটেই শেষ হয়, তোমাদের দেশে উহা অন্যরূপ। কাহারও সহিত বিবাদ হইলে পরে একদিন অন্ধকারে পিছন হইতে মাথায় বাড়ি মারিয়া সে পলাইয়া যাইবে।

ত্রৈলোক্যনাথের হাতে হাতকড়ি ও কোমরে দড়ি পড়িল। বন্দুকধারী সিপাহী পরিবৃত হইয়া ত্রৈলোক্যনাথ বরিশাল জেলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

মহারাজ ত্রৈলোক্যনাথ

বরিশাল ষড়যন্ত্র মামলার পলাতক আসামী সর্ব্বশ্রী প্রতুলচন্দ্র গাঙ্গুলী, মদনমোহন ভৌমিক, রমেশ চৌধুরী, খগেন চৌধুরী ও ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্ত্তী ওরফে বিরজা ওরফে হরেন্দ্র ওরফে মহারাজ ওরফে শশীর বিরুদ্ধে বরিশাল ষড়যন্ত্র মামলার দ্বিতীয় পর্য্যায় সুরু হইল।

"রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধের ষড়যন্ত্র এই অভিযোগে ৪৪ জনের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বাহির হয়, ৩৭ জন ধৃত হন, অবশিষ্ট পলাতক ছিলেন। সরকার পক্ষের অভিযোগ ছিল তাহারা সশস্ত্র বিপ্লবের জন্য অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করিতেছিল এবং ডাকাতি করিয়া অর্থ-সংগ্রহ করিতেছিল। ইহারা সকলেই ঢাকা অনুশীলন সমিতির সভ্য।

এই মামলায় তিনজন রাজসাক্ষী হইয়াছিল এবং এক বৎসরের অধিক মামলা চলিয়াছিল। আমাদের পক্ষে ব্যারিষ্টার ছিলেন বিজয়চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এবং উকীল ছিলেন শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীমনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি।

বিপক্ষের ব্যারিষ্টার ছিলেন মিঃ এস. গুপ্ত, উকীল ছিলেন ফজলুল হক সাহেব ও বরিশালের প্রধান উকীলগণ।"

নিম্নলিখিত কর্ম্মাবলী বরিশাল ষড়যন্ত্র মামলার overacts বলিয়া রাজসাক্ষী প্রিয়নাথ আচার্য্যের সাক্ষ্যে প্রকাশ পায়।

ঢাকা জেলায়—হলদিয়াহাট ডাকাতি, কালাগাঁও-দাদপুর-পণ্ডিতসার গাঁওদিয়া ডাকাতি, সুকইত ডাকাতি, গোলোকপুর বন্দুক চুরি, কাওয়াজী ডাকাতি, বিবঙ্গল ডাকাতি, পানাম (ঢাকা) ডাকাতি। সারদা চক্রবর্ত্তীর হত্যা, কুমিল্লা ডাকাতি, লাঙ্গলবন্ধ ডাকাতি। রতিলাল রায়ের হত্যা, বরিশালে ইন্‌স্‌পেক্টর মনোমোহনের হত্যা, মৌলবী বাজার বোমা বিস্ফোরণ, সোনারঙে হত্যা, রাউত ভোগে হত্যা।

বরিশাল সমিতি ঢাকা সমিতির অঙ্গ বলিয়াই সিদ্ধান্ত হয় ও সোনারঙে জাতীয় বিদ্যালয়ই বিপ্লবীদের প্রধান কর্ম্মকেন্দ্র বলিয়া বর্ণিত হয়। ত্রৈলোক্যনাথ এই সকল কর্ম্ম ধারার সহিত ওতঃপ্রোতঃ ভাবে জড়িত।

দ্বিতীয় পর্য্যায়ের পাঁচজন আসামীই একত্রে বরিশাল কারাগারে রহিয়াছেন। সশস্ত্র গুর্খা পুলিশ অহোরাত্র পাহারা দিয়া চলে। মনে মনে বিপ্লবীদের সব সময়ে উত্তেজনা কবে ভারতীয় সৈন্যেরা সরকার হস্তগত করিবে।

গ্রেপ্তারের পূর্ব্বে তাঁহারা জানিতেন ভারতব্যাপী ভারতীয় সৈন্যের অভ্যুত্থান আসন্ন। সংগঠন চলিতেছে কিন্তু সময় তখনও নির্দ্ধারিত হয় নাই। একদিন উকীল শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় জানাইলেন, আর বেশী দিন কারাগারে থাকিতে হইবে না।

১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দের ২১শে ফেব্রুয়ারী সশস্ত্র অভ্যুত্থানের পুণ্য দিন রূপে চিহ্নিত হইয়াছিল। স্থির হয় ১০ নং রাজপুত রেজিমেণ্ট বরিশাল অধিকার করিয়া কারাগারের ফটক খুলিয়া দিবে। নিয়তির অমোঘ বিধানে সেই স্বপ্ন সেদিন বাস্তবায়িত হইতে পারে নাই। ভাগ্য ইংরাজের প্রতি তখনও সুপ্রসন্ন। তাই অভ্যুত্থানের সমাচার পূর্ব্বেই ভারত সরকারের গোচরীভূত হইয়া পড়িল। সমিধে অগ্নি সংযোজিত হইল না।

বিচারে ত্রৈলোক্যনাথ ১৫ বৎসর ও অন্যান্য চারিজন প্রত্যেকে ১০ বৎসর করিয়া দ্বীপান্তর দণ্ড প্রাপ্ত হ'ন। আপীলে ত্রৈলোক্য-নাথের ১০ বৎসর, মদন ভৌমিকের ১০ বৎসর ও খগেন চৌধুরী সাত বৎসর দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হইলেন। প্রতুলচন্দ্র গাঙ্গুলী ও রমেশ চৌধুরী মুক্তি লাভ করিলেন বটে কিন্তু কারাগারে আটক থাকিলেন।

পঞ্চবিপ্লবী হাসিমুখে জেলাজজের দণ্ডাদেশ গ্রহণ করিলেন।

পায়ে শিকলী বেড়ী পরিয়া বরিশাল কারাগার হইতে কলিকাতায় প্রেসিডেন্সী কারাগারে আসিলেন। সেখানে উপস্থিত হওয়া মাত্র শিকলী-বেড়ী কাটিয়া ডাণ্ডা বেড়ী পরাইয়া দেওয়া হইল এবং ৪৪° ডিগ্রী প্রকোষ্ঠে আটক রাখা হইল।

এই ৪৪° ডিগ্রী প্রকোষ্টেই অরবিন্দকে বন্দী করিয়া রাখা হইয়াছিল। এইখানেই অরবিন্দ আপন চৈতন্য সত্তা উপলব্ধি করিয়া অধ্যাত্মশক্তির উৎসসন্ধানে আজীবন সাধনায় মগ্ন হইলেন।

ত্রৈলোক্যনাথের বর্ণনায়—"৪৪° ডিগ্রীর যেরূপ ব্যবস্থা ছিল তাহাতে সাধারণলোক কিছুদিনের মধ্যেই চোখে সরিষার ফুল দেখিত। একবার মুক্তি লাভ করিলে আর কেহ জেলে যাইবার নাম করিত না—বিপ্লবের পথ পরিত্যাগ করিত।

৪৪° ডিগ্রীকে নির্জ্জন কারাবাস বলা যাইতে পারে। ক্ষুদ্র সেলের মধ্যে সমস্ত দিনরাত্র আবদ্ধ থাকিতে হইত—কাহারও সহিত দেখা হইত না বা কাহারও সহিত কথা বলিবার উপায় ছিল না, দিনের মধ্যে একবার সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট সদলবলে আসিয়া দেখা করিতেন মাত্র।"

ত্রৈলোক্যনাথদের চট সেলাইয়ের কাজ দেওয়া হইল। পরস্পরের কথাবার্ত্তা বলা বারণ। কথা বলিলে তৎক্ষণাৎ সাজা দেওয়া হইত। ভাতের মধ্যে ধান বেশী না পাথর বেশী ত্রৈলোক্যনাথ বহু চেষ্টা করিয়াও স্থির করিতে পারেন নাই। তাই কবিতা রচনা করিয়া চীৎকার সুরু করিলেন—

"জেলার বেটা বড় খচ্চর
খেতে দেয় ধান আর পাথর।"

প্রচণ্ড শীত। হাঁপানী রোগী—শীত কাটে না। একটী

কম্বল চাহিলেন। আবেদন না-মঞ্জুর। রসিক ত্রৈলোক্যনাথ আবার চীৎকার সুরু করেন।—

"সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট পাজীর পাজী
বেশী কম্বল দিতে হয় না রাজী।"

মাঝে মাঝে টেগার্ট ও ল্যোমান আসে। ত্রৈলোক্যনাথের সহিত কথাবার্ত্তা হয়। একদিন কারা-অধিকর্ত্তা আসিলে ত্রৈলোক্যনাথ নালিশ জানাইলেন—

"আমার হাঁফানী হইয়াছে কিন্তু আমাকে হাসপাতালে লইয়া যায় না। আমাকে দিয়া এখনও কাজ করায়। আমি কোন ঔষধ পাই না, এমন কি সাবু বার্লি পর্য্যন্ত চাহিয়া পাই না।"

ইংরাজ কারা-অধিকর্ত্তা ত্রৈলোক্যনাথের টিকিটখানি হাতে লইয়া চোখ বুলাইলেন ও ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিলেন। ঘৃণায় শুধু বলিলেন—দাগী চোরের মত একগাদা নাম। টিকিটে ত্রৈলোক্যনাথের সব কটী নামই লেখা ছিল। ত্রৈলোক্যনাথ, মহারাজ, কালীচরণ, বিরজা ইত্যাদি।

উচ্চ আদালতের রায়ে ১৫ বৎসরের দ্বীপান্তর দশ বৎসর হইয়াছে। একখণ্ড তিনকোণা কাঠঝুলানো লোহার হাসুলী গলায় পরাইয়া দিল। শক্ত করিয়া গলায় সে হাঁসুলী চাপিয়া ধরে, ঘাড় ফিরানো যায় না, শোয়ার সময় অস্বস্তি। দণ্ডের পুরামেয়াদ ইহাকে বহন করিতে হইবে। সেই ঝুলানো কাঠে কয়েদীর নম্বর, ধারা, কত বৎসর সাজা ও খালাসের তারিখ লিখিত রহিল। একটী লোহার থালা ও বাটী লইয়া ত্রৈলোক্যনাথ আন্দামান যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। তবুও বারেক আশা জাগে—হয়ত বা হাঁপানী রোগী বলিয়া আন্দামান হইতে রেহাই পাইলেও পাইতে পারেন।

চিকিৎসকমণ্ডলী স্বাস্থ্য পরীক্ষা করিল। ডাক্তারেরা জানিলেন ত্রৈলোক্যনাথ শুধু হাঁফানীর রোগী নহেন, ফুস্‌ফুসের রোগও আছে, তবুও টিকিটে লেখা হইল—Has asthma Vide I. G. Prisons letter. FIT FOR TRAVEL.



প্রেসিডেন্সী কারাগারে প্রায় নয় মাস কাটাইবার পর আন্দামান যাইবার দিন আসিল। হাতকড়ি ও পায়ে বেড়ির উপর কোমরে দড়ি পড়িল। কারাগারের কার্য্যালয়ের সম্মুখে আন্দামান যাত্রীর দল শেষবারের মত জোড়ায় জোড়ায় বসিল। কারাসঞ্চালক কারান্তরে প্রেরণের সময় পরিদর্শনে আসিলেন। ত্রৈলোক্যনাথকে তিনি এ কয়মাসে খুব ভালভাবেই চিনিয়াছেন। তাঁহার সামনে আসিয়া বিদ্রুপাত্মক কণ্ঠে ভবিষ্যৎবাণী করিলেন—'তুমি সেখানেই মরবে।'

অলক্ষ্য বিধাতা কারাসঞ্চালকের ঔদ্ধত্যে হয়ত সেদিন হাসিয়া ছিলেন। খিদিরপুরের জাহাজঘাটা হইতে আন্দামানের জাহাজ তাহার যাত্রা সুরু করিল। বিলাতী কোম্পানীর জাহাজ—ইংরাজের জাতীয় পতাকা ইউনিয়ন জ্যাক্ সদম্ভে উদ্ধত মহিমায় দক্ষিণ বাতাসে উড়িতেছে। নজরে পড়িতে হয়ত ত্রৈলোক্যনাথের অন্তরে এক দুঃসহ ব্যথা বাজিল—আমার দেশ, আমার গঙ্গা, আমার মাটি আর উদ্ধত পতাকা জানাইতেছে, তুমি কেউ নয়, আমিই এই ভূখণ্ডের,

এই জলধারার সর্ব্বময় কর্ত্তা। তুমি তোমার দেশকে ভালবাস তাই তুমি শৃঙ্খলিত, তোমাকে আমার উদ্যত বাহু তোমারই জন্মভূমি থেকে, তোমার পরিবেশ থেকে ছিনাইয়া লইতেছে, কাহারও কথা কহিবার সামর্থ্য নাই, রক্ষা করিবার সাধ্য নাই। শৃঙ্খলিত হস্তপদে শির নত করিয়া জাহাজের ডেকে আসিয়া বসিয়া থাক।

জাহাজে শ্বেতাঙ্গ কর্ম্মচারীদের তত্ত্বাবধানে দেশীয় সিপাহীর দল সঙ্গীন উঁচাইয়া ঘোরাফেরা করিতেছে। কয়েদীরা জাহাজে উঠিল। জোড়ায় জোড়ায় গর্ভগৃহে স্থান লইল। সকল আনুসঙ্গিক ব্যবস্থাদি সম্পন্ন হইলে জাহাজ তীব্র স্বরে হুঙ্কার তুলিল। ধীরে ধীরে নোঙর উঠে—জাহাজের গতি বাড়ে। গঙ্গার স্রোত কাটিয়া জাহাজ সাগরাভিমুখে চলিতে থাকে। দূরে দূরে মানুষের দলে নির্ব্বাক বিস্ময়ে তাকাইয়া রহিল।

সাগরে জাহাজ পড়িয়াছে। দূরে উত্তর দিগন্তে বাঙলার শ্যাম ঘন তটরেখা অস্পষ্ট হইয়া আসিতেছে। ত্রৈলোক্যনাথ আকুল নয়নে তাকাইয়া আছেন। মধুসূদনের আকুতি তাঁহার মনকে স্পর্শ করে—

বিদেশে দৈবের বশে জীবতারা যদি খসে
এ দেহ আকাশ হতে খেদ নাহি তায়।

নির্বিকার নির্লিপ্ত ত্রৈলোক্যনাথ ভাবিতেছেন 'আন্দামান হইতে ফিরিব কিনা তার কোন ভরসা নাই, না ফিরিবার সম্ভাবনা বেশী। প্রাণের কথা কাহারও নিকট ব্যক্ত করিবার উপায় নাই। হয়ত চিরকালের মত বিদায় হইয়া যাইতেছি। বন্ধু বান্ধব কাহারও সহিত দেখা হইল না, কাহাকেও দুটো কথা বলিয়া যাইতে পারিলাম না। কাহারও নিকট বিদায় লইবার সুযোগ পাইলাম না।'

পূর্ব্বদিন কারাগারের প্রকোষ্ঠের গায়ে যে কবিতাটী তিনি সুরকী দিয়া লিখিয়া আসিয়াছেন সেইটীই বারবার উচ্চারণ করেন।

"বিদায় দে মা প্রফুল্ল মনে যাই আমি আন্দামানে,
এই প্রার্থনা করি মাগো মনে রেখো সন্তানে।
আবার আসিব ভারত জননী মাতিব সেবায়,
তোমার বন্ধন মোচনে মাগো যেন প্রাণ যায়।
বিদায় ভারতবাসী বিদায় বন্ধু বান্ধবগণ,
বিদায় পুষ্প তরুলতা বিদায় পশু পাখীগণ।
ক্ষমো সবে যত করেছি অপরাধ জ্ঞানে অজ্ঞানে,
বিদায় দে মা প্রফুল্লমনে যাই আমি আন্দামানে।"

বহু হত্যার বহু ডাকাতির যিনি নায়ক, কর্ম্মক্ষেত্রে যাঁহার প্রাণ এতটুকু চঞ্চল হয় নাই, অজান্তে তিনি আজ চঞ্চল। চিরদিনের প্রতিজ্ঞাদীপ্ত বিশুষ্ক আঁখি আজ সজল ঝাপসা।

তটরেখা মিলাইয়া গেল, অকূল সমুদ্রে জাহাজ দুলিতেছে; ত্রৈলোক্যনাথের আবিষ্ট ভাবও কাটিয়া গেল। পুরাতন সত্তা ফিরিয়া পাইলেন। আবার হাসিখুসী ভাব। প্রথমেই স্থির করিলেন নরকেই যখন যাইতেছেন তখন নরকই গুলজার করিতে হইবে।

তিন দিন তিন রাত্রির পর চতুর্থ দিন বেলা দশ ঘটিকা নাগাদ জাহাজ পোর্ট ব্লেয়ারে পৌঁছিল। পথে আহার্য্য ব্যবস্থা ছিল চিড়া আর গুড়, কিন্তু কেহই তাহা স্পর্শ করে নাই। একে প্রথম সমুদ্র-যাত্রা, দ্বিতীয়ত ছোট আয়তনের জাহাজ প্রচণ্ডভাবে দুলিতেছে, তাই যাত্রীর দলও বিছানা হইতে মাথা উঠাইতে পারে না; উঠিলেই বমি হইতে থাকে।

"ঢেউয়ের সঙ্গে জাহাজ যখন উপরে উঠিত তখন মনে হইত উহা আকাশ স্পর্শ করিবে আবার যখন নীচের দিকে নামিত মনে হইত এইবার উহা পাতালপুরী চলিল।"

সাধারণ কয়েদীসহ জাহাজে মোট কয়েদীর সংখ্যা ৯৬। তাহার

মধ্যে দশজন মহিলা কয়েদী, সাথে জনাতিনেক শিশু। ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি ত্রৈলোক্যনাথ আন্দামানে উপনীত হইলেন।

ভারতবর্ষে তখন ভারতীয় সৈন্যের সশস্ত্র অভ্যুত্থানের সংগঠন প্রয়াস ব্যর্থ হইয়াছে। নানা ষড়যন্ত্র মামলায় বহু স্বাধীনতা পিয়াসীর বিচার হইয়াছে ও হইতেছে। কাহারও ফাঁসি, কাহারও বা দ্বীপান্তর। ভারত জুড়িয়া ইংরাজের প্রতিশোধ স্পৃহার তাণ্ডব নৃত্য চলিতেছে। ভারত সাম্রাজ্যের নানা দিক হইতে নানা ধর্ম, নানা বর্ণ, নানা সম্প্রদায়ের দেশ প্রেমিকের দল আন্দামানে সমাবিষ্ট। এ যেন ভারতের বিপ্লবী শিরোমণিদের মহাসম্মেলন। আহ্বায়ক স্বয়ং ইংরাজ সরকার। এতদিন সবাই সবাইকে হয়ত চিনিতেন না, আজ সবাই সবাইকে দেখিলেন, মনে প্রাণে গ্রহণ করিলেন, শ্রদ্ধা জানাইলেন। দমন করিতে যাঁহাদের আনা হইয়াছে তাঁহারা প্রদীপ্ত হইয়া উঠিলেন।

ত্রৈলোক্যনাথের বর্ণনায় "আন্দামান স্থান হিসাবে অস্বাস্থ্যকর হইলেও ইহার প্রাকৃতিক দৃশ্য খুব সুন্দর। সমুদ্রের মধ্যে পাহাড় এবং পাহাড়ের ওপর সেলুলর জেল। তেতলা হইতে সমুদ্র ও পাহাড়ের দৃশ্য মনোরম দেখা যাইত। সেলুলর জেলে সাতশত কয়েদী রাখিবার ব্যবস্থা আছে। সাতশত সেল আছে। আন্দামানে ছোট বড় প্রায় দুই শত দ্বীপ আছে। সাধারণ কয়েদীদের সেলুলর জেলে তিন মাস হইতে দুই বৎসর রাখা হয়, পরে বিভিন্ন দ্বীপে বা টাপুড়ে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। সেখানেও তাহাদিগকে কয়েদীদের মতই থাকিতে হয়, সরকারী কাজ করিতে হয় এবং সরকার হইতে তাহারা আহার্য্য পায়। তবে সেখানে তাহারা জেল হইতে কিছু বেশী স্বাধীনতা ভোগ করিতে পারে।

রাজনৈতিক কয়েদীদের জন্য কোন পৃথক ব্যবস্থা হইত না, তাহাদিগকে বরাবর জেলেই থাকিতে হইত।"

রাজনৈতিক বন্দীদের জন্য এই আন্দামান জেলের পত্তন হইয়াছিল আবার রাজনৈতিক বন্দীদের প্রতিরোধ ও আন্দোলনেই এই পেনাল সেটেল্‌মেণ্ট দণ্ডবিধায়ক দ্বীপান্তর উঠিয়া যায়।

সুরু ১৮৫৭— সারা ১৯২১।

"১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে সিপাহী বিদ্রোহের পর এত লোক দণ্ডিত হইয়াছিল যে ভারতীয় জেলে তাহাদের স্থান সঙ্কুলান হয় নাই। তাই সরকার তাহাদিগকে আন্দামান পাঠাইবার বন্দোবস্ত করেন। আন্দামান তখন আরও অস্বাস্থ্যকর ছিল। বর্ত্তমানে আন্দামানে অনেকগুলি সুন্দর সুন্দর সহর দেখিতে পাওয়া যায়। এই সহরগুলি সেই রাজনৈতিক কয়েদীদের মৃতস্তূপ হইতে সৃষ্ট। হতভাগ্য কয়েদীরা রৌদ্রে পুড়িয়া, বৃষ্টিতে ভিজিয়া, ম্যালেরিয়া ডিসেণ্ট্রির সহিত লড়াই করিয়া জঙ্গল কাটিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সহরগুলি পত্তন করে। তখন আন্দামানের অবস্থা এরূপ ছিল যে কেহ আর দেশে ফিরিয়া আসিতে পারিত না—কিছুদিনের মধ্যেই সেখানে তাহাদের জীবন দীপ নিভিয়া যাইত।"

পরিচয় পত্র মিলাইয়া কয়েদীদের একে একে কারাভ্যন্তরে প্রবেশ করান হইল। ত্রৈলোক্যনাথের পরিচয় পত্র টিকিটে লেখা—

Previous history : The accused was one of gang of Bengali students concerned in a conspiracy, a conspiracy to wage war against the King Emperor and whose operations extended from the year 1908 to December 1914. He was a member of Anushilan Samity, a society whose object was to overthrow the British rule in India and whose members committed several dacoities to procure money for the purchase of arms and ammunitions and the carrying out of the bussiness of the society.

He was one of the earliest members, took training from the arch anarchist P. Das. He absconded while the Dacca conspiracy case was started. He was one of the leaders of the revolutionary party, was suspected in 14 murders and dacoities. Very dangerous".

পায়ের বেড়ী কাটিয়া দেওয়া হইল। বিশেষ ভাবে তল্লাসী করা হইল—কোন টাকা পয়সা যেন লুকান না থাকে। গলায় ঝোলানো ব্রাহ্মণের প্রতীক পৈতাটুকু পর্য্যন্ত কাড়িয়া লওয়া হইল, পাছে কেহ গলায় ফাঁস লাগাইয়া আত্মহত্যা করিয়া না বসে। ত্রৈলোক্যনাথ প্রথমটা আপত্তি তুলিলেও যখন শুনিলেন বীর সাভারকর ও উপেন বন্দ্যোপাধ্যায়কেও যজ্ঞোপবীত খুলিয়া দিতে হইয়াছে তখন আশ্বস্ত ও নিরস্ত হইলেন।

কিন্তু পৈতাপর্ব্ব উপলক্ষ্য করিয়াই একদিন জেল কর্ত্তৃপক্ষের সহিত বার্ম্মা ষড়যন্ত্র মামলার দণ্ডিত আসামী হিন্দুস্থানী গোঁড়া ব্রাহ্মণ রাম রক্ষার প্রচণ্ড সংঘর্ষ বাঁধিল। পৈতা কাড়ার পর তিনি জল গ্রহণ করাও বন্ধ করিলেন এবং মাস দুই অনশনের পর তাঁহার মৃত্যু হইল। কিন্তু হুকুমে অটল সরকার পৈতা ফেরৎ দিয়া মৃত্যু পথ-যাত্রীর প্রাণ রক্ষা করিবার কোন চেষ্টাই করেন নাই।

ত্রৈলোক্যনাথ নরক গুলজার করিতে আসিয়াছেন। তাই আসিয়াই একবার নরকের বাসিন্দাদের উপর চোখ বুলাইয়া লইলেন।

বার্ম্মা ষড়যন্ত্র মামলার চৈৎরাম, কাপুর সিং, হরদিৎ সিং, বদনসিং গুজরা সিং, পণ্ডিত রাম বক্ষা, ব্যাঙ্ককের ইঞ্জিনিয়র সর্দ্দার অমর সিং ও লক্ষপতি ব্যবসায়ী সর্দ্দার বুড্ডাসিং।

লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার বলবন্ত সিং, হরণাম সিং, তুন্দ্রা, কেদার সিং, খুসল সিং, নন্দাসিং, পৃথ্বীসিং, রুলা সিং, দেওয়ান সিং, মোহন

সিং, ওয়াসন্ সিং, ভাই পরমানন্দ, পণ্ডিত পরমানন্দ, হিদেরাম, রামসোনদাস, জাত্রিৎরাও, গুরুমুখসিং, জোয়ালা সিং, শের সিং, পণ্ডিত জগৎরাম, নিধান সিং, কেশর সিং, বিশাখা সিং, রুবা সিং, ভাল সিং, মেহের সিং, উদম সিং, প্যারা সিং, কৃপাল সিং, ইন্দ্র সিং, লাল সিং, কালা সিং, নাথা সিং, শিব সিং, সজ্জন সিং, প্রভৃতি আরও অনেকে।

বেনারস ষড়যন্ত্র মামলার শচীন্দ্রনাথ সান্যাল।

দিল্লী ষড়যন্ত্র মামলার বালরাজ।

পূর্ব্ববাঙলায় অনুশীলন সমিতির প্রাণ প্রতিষ্ঠাতা পুলিন দাস-ঢাকা ষড়যন্ত্র মামলার দণ্ডিত আসামী।

আলীপুর ষড়যন্ত্র মামলার উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, হেমচন্দ্র দাস, বিভূতি সরকার, বীরেন্দ্র সেন, সুধীর ঘোষ, ইন্দ্রনাথ নন্দী, অবিনাশ ভট্টাচার্য্য, শৈলেন্দ্রনাথ বসু, হৃষীকেশ কাঞ্জিলাল, ইন্দুভূষণ রায় ও বারীন্দ্রকুমার ঘোষ।

মহারাষ্ট্রের গণেশ দামোদর সাভারকর, বিনায়ক দামোদর সাভারকর ও নারায়ণ যোশীও আন্দামানের বাসিন্দা।

প্রায় একশত বন্দী সেলুলর জেলে ছিলেন।

ত্রৈলোক্যনাথের স্বাস্থ্য পরীক্ষা হইল এবং হাঁপানীর রোগী জানিয়াও নারিকেলের ছোবড়া পিটাইয়া তার বাহির করার কঠিন কাজ তাঁহাকে দেওয়া হইল। হাঁপানি লইয়াই কাজ করিতে হয় —দেহ অনেক সময় অসাড় হইয়া পড়ে। যে যাহা খাইতে বলে তাহাই খান। তামাক পাতা মুখে রাখিলে নাকি হাঁপানির টান সারে, তো তাহাই করেন, মাথা ঘুরিতে থাকে অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া যান। সাথীরা হাসপাতালে রাখিয়া আসেন। পরের দিন সুপারিন্টেনডেণ্ট ত্রৈলোক্যনাথকে হাসপাতালে দেখিতে পাইয়া ডাক্তারকে ধমক লাগান। ত্রৈলোক্যনাথই জবাব দেন—আমার

হাঁপানি হয়েছে। সাহেব ব্যঙ্গ করিয়া বলেন—এটা আন্দামান। তোমার ঘর নয়। দেশে থাকিতে তো জ্বালিয়েছ, অনেক অশান্তি করেছ। ইংরাজ রাজত্ব উল্টাতে চেয়েছ তা মনে আছে। আর এখানে এসেছ দুধ খেতে?

সাহেবের হুকুমে অসুস্থ ত্রৈলোক্যনাথকে সেই অবস্থায় হাসপাতাল হইতে বাহির করিয়া দেওয়া হইল। আবার কারাগারের ছোট কুঠরীতে ফিরিলেন।

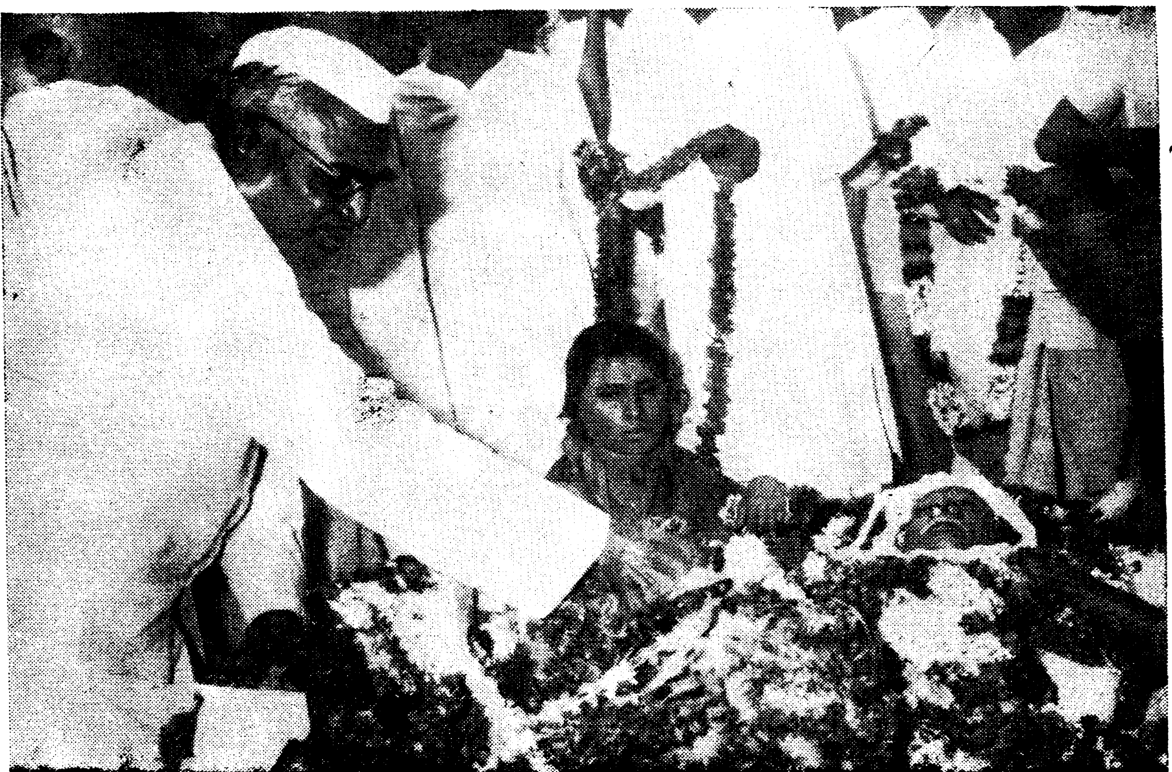


"আন্দামানে জেলার ও সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট ছিলেন সর্ব্বেসর্ব্বা। সেখানে কোন জেল পরিদর্শক যাইতেন না—চীফ কমিশনার বৎসরে তিন চারদিন পরিদর্শন করিতে যাইতেন। চীফ কমিশনারের নিকট কয়েদীদের অভিযোগ করিবার অধিকার ছিল। কিন্তু আগে পিছে বন্দুকধারী সিপাহীসহ এরূপ জাঁকজমকের সহিত তিনি আসিতেন যে সাধারণ কয়েদীরা কিছু বলিতে সাহস করিত না। আর বলিলেও বিশেষ কিছু লাভ হইত না। কারণ তিনি কয়েদীদের কথা কখনও বিশ্বাস করিতেন না, জেলার ও সুপারের কথাই বিশ্বাস করিতেন। আন্দামানে প্রত্যেক কয়েদী বৎসরে একখানা চিঠি

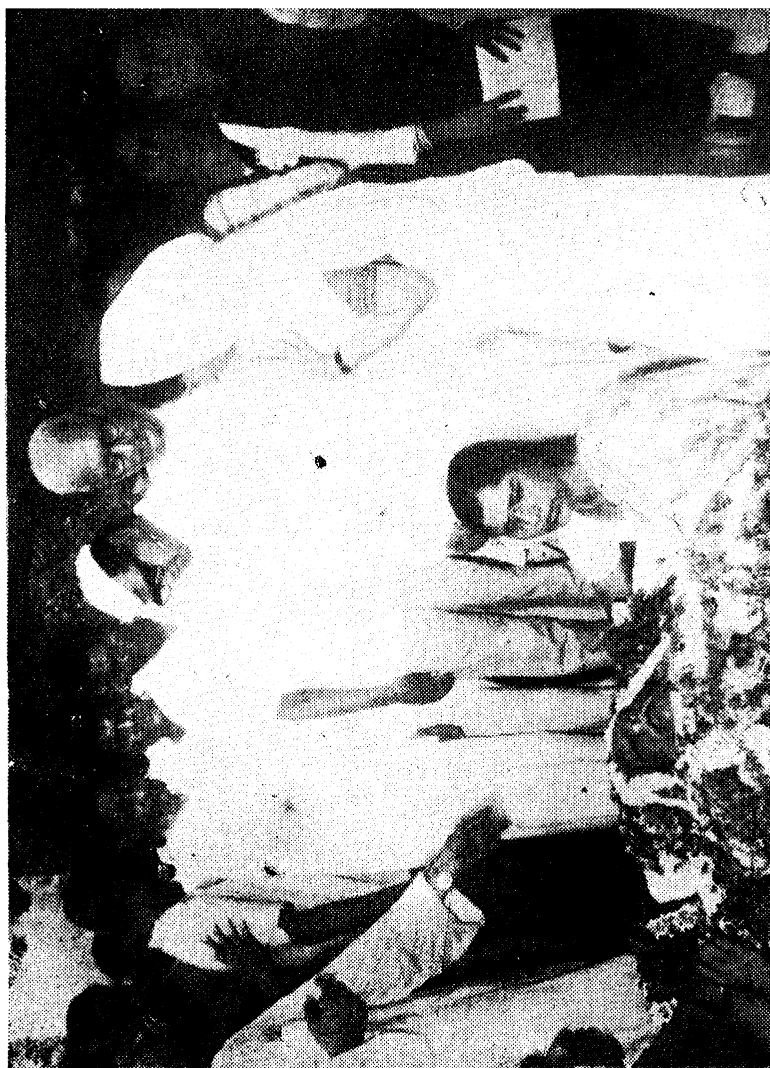
বাড়ীতে লিখিতে পারিত ও একখানা চিঠি বাড়ী হইতে পাইতে পারিত। কিন্তু ইতিমধ্যে যদি কোন অপরাধের জন্য তাঁহার সাজা হইত, তবে সেই অধিকার হইতেও বঞ্চিত হইত। আন্দামানের জেলের খাওয়া দেশের জেল হইতে অনেক খারাপ। সস্তা রেঙ্গুন আতপ চাউলের ভাত, দুই বেলা অড়হড়ের ডাল এবং ঘাস পাতার তরকারী—ইহাই ছিল নিত্যকার খাদ্য।"

"রাত্রে জেলে কোন আলোর ব্যবস্থা ছিল না, পায়খানার ব্যবস্থাও ছিল অদ্ভুত। রাত্রে প্রত্যেকের সেলে একটী করিয়া মাটির ভাঁড় দেওয়া হইত, এক সেরের বেশী তাহাতে জল ধরিত না। রাত্রে কাহারও পায়খানার বেগ পাইলে প্রথমতঃ তাহাকে অন্ধকারে পা দিয়া ঘটিটীর অনুসন্ধান করিয়া তাহার মুখ ঠিক করিয়া পরপর মলমূত্র ত্যাগ করিতে হইত। মল ও মূত্র দুইটী একসঙ্গে ত্যাগ করিবার উপায় ছিল না। তাই মুত্রের বেগ বন্ধ করিয়া ঘটের মধ্যে মলত্যাগ করিতে হইবে, মলত্যাগ বন্ধ করিয়া পুনরায় ঘটের মুখ ঠিক করিয়া মূত্র ত্যাগ করিতে হইবে। একসঙ্গে দুইটী ত্যাগ করিলে মাটিতে পড়িবে এবং তাহাতে নিজের কোঠাই নষ্ট হইবে। কারণ ২।৩ মাস পর একদিন মলমূত্র ত্যাগের স্থানে চূণ লাগাইবে, আর মলমূত্র মাটিতে পড়িলে মেথর যদি রিপোর্ট করে তবে বন্দীর সাজা হইবে। জল খরচও সাবধানে করিতে হইবে, বেশী জল খরচ করিলে তাহা গড়াইয়া নিজের বিছানা ভিজাইবে। কিছুদিন পর আমাদের এই সব অভ্যাস হইয়া গিয়াছিল। সাভারকর ভ্রাতৃ-দ্বয়, বারীনবাবু প্রভৃতি সকলেই একাজে খুব দক্ষ ছিলেন। ঘটের মুখ তিন চার ইঞ্চির বেশী চওড়া হইবে না।"

"আন্দামানে কয়েদীদের আহারের পরিমাণ যেমন ছিল কম, তাহাদের উপর দুর্ব্যবহার হইত তেমন বেশী। বছরে দুই একদিন মাছের ঝোল বা মাছ সিদ্ধ পাওয়া যাইত।"



শ্রীজগজ্জীবন রামের পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন



"আন্দামানে সাতটা ইয়ার্ড আছে, ইহাদের এক ইয়ার্ড হইতে অন্য ইয়ার্ডে যাইবার হুকুম নাই। রাজনৈতিক কয়েদীদিগকে এই সাত ইয়ার্ডে ভাগ করিয়া রাখা হইয়াছিল, কোন ইয়ার্ডে চারজন আবার কোন ইয়ার্ডে পনর ষোল জন থাকিত। প্রেসিডেন্সি জেলে আমরা পাশাপাশি থাকিতাম। সেখানে না হয় কথা বলিবার নিয়ম ছিল না, কিন্তু এখানে আমরা এক ইয়ার্ডে থাকি, দিনের বেলায় একত্রে থাকি, এক বারান্দায় কাজ করি তথাপি পরস্পর কথা বলিতে পারিব না, পাশাপাশি বসিয়া খাইতে পারিব না, পাশাপাশি পায়খানায় বসিতে পারিব না—প্রত্যেকটী সময় আমাদের পরস্পরের মধ্যে কয়েক জন সাধারণ কয়েদী বসিবে।"

"সেলুলর জেলে গড়ে প্রতিমাসে তিনটি করিয়া লোক আত্মহত্যা করিয়াছে। মানুষ সহজে আত্মহত্যা করিতে চায় না, কিন্তু সেখানে কয়েদীদের প্রতি এতটা নির্য্যাতন করা হইত যে তাহারা তাহা সহ্য করিতে পারিত না, আত্মহত্যা করিয়া সকল নির্য্যাতনের হাত হইতে মুক্ত হইত।"

"সেলুলর জেলে বাঙালী রাজনৈতিক কয়েদী ছিল পঁচিশ ত্রিশ জন, মারাঠী তিন জন, ইউ. পি-র অল্প কয়েকজন এবং বাকী সব ছিল পাঞ্জাবের এবং তাহাদের অধিকাংশই ছিল শিখ। ইহার পর মার্শাল-ল কেসে পাঞ্জাব ও আমেদাবাদ হইতেও কিছু লোক আসিয়াছিল। জেলে বিশেষ শ্রেণীর কোন কয়েদী ছিল না, সকলেই সাধারণ শ্রেণীর কয়েদী বলিয়া গণ্য ছিল। ব্যারিষ্টার বিনায়ক সাভারকর, প্রফেসর ভাই পরমানন্দ, বারীন ঘোষ, ভাই বুড্ডা সিং (তিনি ব্যাঙ্ককের একজন প্রসিদ্ধ ধনী ব্যবসায়ী), সকলেরই এক অবস্থা, সকলেই সাধারণ কয়েদী।"

"কয়েদী কর্ম্মচারীদের মধ্যে প্রধান ছিল জমাদার, তাহার অধীনে টিণ্ডেল, তাহাদের অধীনে পেটী অফিসার ও সর্ব্বনিম্ন ওয়ার্ডার

ছিল। রাজনৈতিক কয়েদীদের জন্য প্রতি ইয়ার্ডে সাতজন শ্বেতাঙ্গ প্রহরী ছিল। আন্দামানে ব্রহ্মদেশ ও ভারতবর্ষের প্রত্যেক প্রদেশের কয়েদী ছিল। সেখানের সাধারণ ভাষা ছিল হিন্দী। মেয়ে কয়েদীরা ভিন্ন জেলে থাকিত। তখন সেখানে পুরুষ কয়েদী ১০ বৎসর পর এবং মেয়ে কয়েদী ৫ বৎসর পর বিবাহ করিয়া একত্রে বাস করিতে পারিত। সেখানকার নৈতিক অবস্থা খুব শোচনীয় ছিল। যুবক ও স্ত্রীলোক ঘটিত ব্যাপারে প্রায়ই খুন হইত।"

"পাঞ্জাবী শিখেরা ছিলেন খুব বলিষ্ঠ, কাহারো ওজন ২০০ পাউণ্ড কাহারও ওজন ২৫০ পাউণ্ড। একজনে একটা আস্ত পাঁঠা খাইতে পারিতেন। জেলের সাধারণ খাওয়াতে তাঁহাদের পেট ভরিত না। এক একজনের ওজন ৪০।৫০ পাউণ্ড কমিয়া গিয়াছিল।"

"সেলগুলি আট হাত লম্বা ও পাঁচ হাত চওড়া ছিল। ইহাদের মধ্যেই আমাদের সারা দিন-রাত থাকিতে হইত। সেলে দিনের বেলা বিছানা রাখিবার হুকুম ছিল না, সকালে বিছানা লইয়া যাইত। সেলে আমরা কবিতা লিখিয়া সময় কাটাইতাম। কিন্তু কেহই কবি ছিলাম না। সকলে বাঙলা জানিতেন না। তাই আমি স্থির করিলাম ইংরাজীতে কবিতা লিখিব।

কবিতা লিখিবার মত আমাদের কাগজ কলম ছিল না, কাগজ কলমের প্রয়োজন হইত না। আমাদের সম্বল ছিল সেলের মেঝে, দেওয়াল ও সুরকী। প্রথম কবিতা লিখিলাম—

What have I, how shall I worship thee
I know not oh God please tell me,
I am prisoner, have no pleasure
My heart is desert, there is no water.
I am always wandering always in the dark
Unable to follow the Single foot mark ;

I heard that you are with the name
So I always sing your fame.

দ্বিতীয় কবিতা লিখিলাম।

Murray the Superintendent is a first class
Scoundrel
Unwilling to keep the Sick man in the hospital
For nothing he abuses, punishes the prisoner
What shall I say of his brutal behaviour.

এইরূপ বেপরোয়া ভাবে আমরা কবিতা লিখিতে লাগিলাম ও পরস্পরের কবিতা শুনিতাম।"

"আমাদিগকে যখন খাইবার সময় ও স্নানের সময় সেল হইতে বাহির করিত তখন জেলের অপর সকল কয়েদীদিগকে ভিতরে বন্ধ করিয়া রাখিত যাহাতে কাহারও সহিত আমাদের দেখা না হয়।"

"তখনও আমার হাঁফানী সারে নাই—আমি তখন সারারাত্র কাশিতাম, সময় সময় প্রহরীরা বলাবলি করিত আজ রাত্রে এ বাঙালী মারা যাইবে। শেষ রাত্রে যখন একটু তন্দ্রার ভাব আঁসিত তখন প্রহরীরা আমাকে জাগাইয়া দেখিত আমি বাঁচিয়া আছি কিনা। সুপারিন্টেণ্ডেন্টের নিকট রাত্রে কফ্ ফেলার জন্য একটী পাত্র চাহিয়া ছিলাম কিন্তু উহা পাইলাম না।"

"জেলার সাহেব বলিলেন, প্রস্রাবের পাত্রে কফ ফেলিও। আমি দেওয়ালের গায়ে কফ্ ফেলিতাম্। আমার শরীর এত দুর্ব্বল ছিল যে দুই হাত দূরে যাইয়া প্রস্রাব করিতে কষ্ট হইত। আমার ধারণা হইল প্রেসিডেন্সী জেলের জেলারের ভবিষ্যৎ বাণীই সত্য হইবে ; আমি আর দেশে ফিরিয়া যাইতে পারিব না। সময় সময় নির্জ্জন অন্ধকার সেলে বহু পূর্ব্বস্মৃতি জাগিত। মনে হইত যে পা

এক সময়ে আমাকে ৮৫ মাইল রাস্তা অনায়াসে বহন করিয়া লইয়া গিয়াছে, ১০৫° জ্বরের মধ্যে ৩২ মাইল পাহাড়িয়া রাস্তা বহন করিয়া লইয়া গিয়াছে আজ সেই পা দুই হাত রাস্তা আমাকে বহন করিতে অক্ষম।

এই অবস্থায় বাঁচিয়া থাকা বিড়ম্বনা। সারা জীবন পরের গলগ্রহ হইয়া থাকিতে হইবে। ইহা অপেক্ষা মৃত্যুই শ্রেয়ঃ।"

সেই অন্ধকারে সেলে, সেই ঘনায়মান অন্ধকার পথ পরিক্রমায় হয়ত সেই সময় উদ্দীপিত আলোক রেখায় লিখিয়া চলিত—

> নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ।
> ন চৈনং ক্লেদয়ান্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ॥
> অচ্ছেদ্যোহয়মদাহ্যোহয়মক্লেদ্যোহশোষ্য এব চ।
> নিত্যঃ সর্বগতঃ স্থাণুরচলোহয়ং সনাতনঃ॥

বদ্ধ ঘরের রুদ্ধ বাতাস সেই মহামন্ত্রের উদাত্ত ঝঙ্কারে যে রনন তুলিত তাহা ত্রৈলোক্যনাথের মানসপটে আগে চলার উন্মাদনায় নূতন প্রেরণার সঞ্চার করিত।

শাশ্বত ভারতের অমৃত অনুজ্ঞা 'চরৈবেতি' ঝঙ্কৃত হইত।



আন্দামানে ত্রৈলোক্যনাথের সহবাসীদের মধ্যে গনেশ দামোদর সাভারকর, বিনায়ক দামোদর সাভারকর (ব্যারিষ্টার) প্রঃ ভাই পরমানন্দ, জবালা সিং, পৃথ্বী সিং, গুরুমুখ সিং,

ছত্তর সিং, নিধান সিং, কেশর সিং, বুড্ডা সিং, শের সিং, অমর সিং, বিশাখা সিং, রুর সিং, মোহন সিং, নন্দা সিং, ভান সিং, কেহের সিং, পণ্ডিত পরমানন্দ, পণ্ডিত জগৎরাম, পণ্ডিত রামশরণ দাস, পণ্ডিত রামরক্ষা, চৌধুরী বেগগামল, মহাশয় রতন চাঁদ, মোহম্মদ মোস্তাফা, আলী আহম্মদ কাসেম, পুলিনবিহারী দাস, বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, হেমচন্দ্র দাস, উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেশচন্দ্র সেন, অমৃতলাল হাজরা, মদনমোহন ভৌমিক, খগেন্দ্রচন্দ্র চৌধুরী, নরেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ চৌধুরী, ভূপেন্দ্রকুমার ঘোষ, শচীন্দ্র সান্যাল, আশুতোষ লাহিড়ী, নিকুঞ্জ পাল, গোবিন্দ কর, মহেন্দ্র দাস, যতীন নন্দী, সত্যরঞ্জন বোস, গোপেন্দ্রলাল রায়, ক্ষিতীশচন্দ্র সান্ন্যাল, নিখিলচন্দ্র গুহ, অনুকূল চাটার্জ্জী, সুবোধ কর প্রভৃতির নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

আন্দামানে কয়েদীদের উপর নিপীড়ন অবাধে ও অবিরত চলিয়া আসিতেছে। প্রতিবাদ করিবার উপায় নাই, শাস্তির মাত্রা আরও বাড়িবে। প্রতিরোধ করিবার শক্তি নাই, সাথী মিলিবে না। তাই এতদিন আন্দামানের কয়েদীরা যত কিছু নির্য্যাতন নীরবে সহ্য করিয়াছে, মাত্রাতিরিক্ত হইলে আত্মহত্যা করিয়াছে। বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদিয়া ফিরিয়াছে। বিদেশী শাসককুল উদ্ধত মেজাজে ক্রীতদাসের মত কয়েদীদের সহিত ব্যবহার করিয়া আসিতেছে। বাহিরের জগতে তাহার কোন সংবাদই আসিত না। আন্দামান ভারতবাসীর মনে একটী ভয়াবহ নাম হিসাবেই পরিচিত ছিল।

এইবার চক্র পরিবর্ত্তনের লগ্ন আসন্ন, রাজনৈতিক বন্দীরা এই অত্যাচার ও যথেচ্ছাচারিতা নীরবে সহ্য করিতে রাজী নহে। ইংরাজ শাসনের উচ্ছেদ-মানসে যাঁহারা মৃত্যু পণ করিয়াছেন তাঁহারা কাহার ভয়ে কীসের ভয়ে আজ মূক থাকিবেন, নিশ্চেষ্ট থাকিবেন।

এই প্রতিরোধ আন্দোলনে সকল রাজনৈতিক বন্দীরা কিন্তু একচিত্ত হইতে পারিলেন না। কেহ কেহ অহেতুক দ্বন্দ্বে আরও ভয়াবহতার ছবি দেখিলেন। অধিকাংশ বন্দী কিন্তু অন্ধকারে ঝাঁপ দিতে উদ্যত, তাই নরম ও গরম দুই দলে বন্দী শিবির বিভক্ত হইল।

"সাভারকর ভ্রাতৃদ্বয় ও বারীনবাবু পূর্ব্বে আসিয়াছেন, তাঁহাদের অনেক নির্য্যাতন ভোগ করিতে হইয়াছে, তাঁহারা সংগ্রাম করিয়া কিছু সুবিধাও আদায় করিয়াছেন। এখন তাঁহারা জেলার ও সুপারিন্‌টেন্‌ডেন্ট সাহেবের কাছে খুব প্রিয় পাত্র হইয়া উঠিয়াছেন। তাঁহারা এখন এই সব সুবিধা ত্যাগ করিয়া আমাদের সঙ্গে আসিয়া সংগ্রাম করিতে প্রস্তুত নন। পুলিনবাবু কোন গণ্ডগোলে যাইতেন না, কর্ত্তৃপক্ষের প্রিয় পাত্র হইবার চেষ্টাও করিতেন না। স্নেহ পরবশ হইয়া তিনি আমাদিগকে বলিতেন—জেলে গণ্ডগোল করিয়া সাজা বাড়াইয়া লাভ কি, বরং শান্ত ভাবে থাকিয়া বাহিরে যাইতে পারিলে আরো দেশের সেবা করিতে পারিবে।"

ত্রৈলোক্যনাথ যদিও হাঁপানির রোগী ও হীনবল, তবুও তিনি এই প্রতিরোধ আন্দোলনে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। চির-উন্নত শির নত করিতে রাজী নহে—শরীর যত বাদই সাধুক না কেন। অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ জানাইতে কারাগারে আইন অমান্য করা স্থির হইল্। সেলুলর জেলে আইন অমান্য সুরু হইয়া গেল, নরম পন্থীরা যদিও যোগ দিলেন না। আন্দামানের ইতিহাসে নূতন পরিচ্ছেদ।

জনে জনে জানাইয়া দিল তাহারা কোন হুকুমের বরদার নহে। কোন আদেশের অনুবর্ত্তী নহে—তাহারা স্বাধীন, তাহারা নির্ভয়।

"আমরা এখন পরস্পর কথা বলি, খাবার খারাপ ও কম বলিয়া হৈ চৈ করি, কোন কয়েদীকে কোন জেল কর্ম্মচারী প্রহার করিলে

আমরা দলবদ্ধ ভাবে বাধা দিই। এই সব অপরাধের জন্য আমাদের হাত কড়ি, বেড়ী, সেল-বাস প্রভৃতি সাজা হয়।

শিখেরাই সংখ্যায় বেশী এবং সবাই চল্লিশ বৎসরের ঊর্দ্ধে, পঞ্চাশ ষাট বৎসরেরও দু'একজন ছিলেন আর বাঙালীরা সবাই ত্রিশ বৎসরের নীচে। শিখদেরই বেশী নির্য্যাতন ভোগ করিতে হইয়াছে; বীরত্বের সহিতই তাহা করিয়াছেন।"

সারাদিন কাজের পর অমরসিং বারান্দায় পাইচারী করিতেছে। জেলার সাহেব ধমক দেয়—বেড়াইতেছ কেন? অমর সিংয়ের উদ্ধত জবাব—আমি কি তোমার বাবার মাথায় বেড়াইতেছি? তৎক্ষণাৎ তিন মাস ডাণ্ডাবেড়ী ও সেল সাজার বন্দোবস্ত হইল।

পণ্ডিত পরমানন্দ টিণ্ডেলদের কথা শোনেন না, বে-ফাইলে চলেন; জেলার নালিশ শুনিয়া মা-বাপ তুলিয়া গালাগালি দিতে না দিতেই পরমানন্দের লাথি ও ঘুষির আঘাতে জেলার মাটিতে লুটাইয়া পড়িল। জেলারের পার্শ্বচর জমাদার ও টিণ্ডেলদের লাঠির ঘায়ে অচৈতন্য পরমানন্দকে হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হইল। আন্দামানের ইতিহাসে এই প্রথম শ্বেতাঙ্গের উপর, জেলারের উপর হাত উঠিয়াছে। শাসককুলের প্রেষ্টিজ প্রচণ্ড আঘাত পাইল, ইমেজে ছায়া পড়িল। সুপার সাহেবের বিচারে পরমানন্দের শাস্তি কুড়ি ঘা বেত।

সাধারণ কয়েদীরা মনে মনে আনন্দিত হইয়া উঠে। উপরতলার ইঙ্গিতে যে কোন সুযোগে, যে কোন অছিলায় জমাদার টিণ্ডেলদের দল বন্দীদের উপর যথেচ্ছ প্রহার চালায়। শক্তির জানান দিতে শক্তি অপব্যবহার করে।

এই প্রকার প্রহারে একদিন সর্দ্দার ভান সিং মৃতপ্রায়। বিপ্লবীরা প্রতিবাদে ষ্ট্রাইক করিলেন। ইয়ার্ডে ইয়ার্ডে গোপন-

বার্তা চলিয়া গেল। প্রায় সত্তরজন রাজনৈতিক বন্দী কোন কাজ করিলেন না, অনশন করিয়া রহিলেন।

"এই অপরাধের জন্য আমাদের প্রত্যেকের ছয়মাস ডাণ্ডাবেড়ী ছয় মাস সেল, সাতদিন খাড়া হাতকড়ি, কমখানা সাজা হইল।"

জেল পরিদর্শনে চীফ্ কমিশনার আসিতেছেন। প্রত্যেক ইয়ার্ড হইতেই দু'একজন লোক বলিবার জন্য ঠিক হইল। ত্রৈলোক্যনাথ তাঁহাদের মধ্যে একজন।

কমিশনার সাহেব সেলের সামনে আসিতে ত্রৈলোক্যনাথ সেলাম করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

ধমক দিয়া সাহেব বলেন—তোমরা গণ্ডগোল করিতেছ কেন?

শান্তভাবে ত্রৈলোক্যনাথ জবাব দেন—'ভান সিংকে নির্দ্দয়ভাবে মারা হয়েছে।'

'ভান সিংকে প্রহার করা হয় নাই।'

'ভান সিংয়ের এখনও মৃত্যু হয়নি—এখনও মৃত্যুশয্যাশায়ী, দয়া করে আপনি তাকে দেখে আসুন।'

কমিশানার উত্তেজিত হইয়া বলেন—"যদি তাকে মারিয়াই থাকে তাহাতে তোমার কি? সে তোমার চাচাও নয় নানাও নয়।"

'সে আমার সহকর্মী সে আমার বন্ধু'—দীপ্ত উত্তর।

কথা পাল্টাইয়া কমিশনার সাহেব প্রশ্ন করেন—'তোমার নিজের সম্বন্ধে কিছু বলিবার আছে।'

'আমি অসুখে ভুগিতেছি, আমাকে হাসপাতালে রাখা হয় না। ডাক্তার একদিন ভর্ত্তি করিলেও সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ফেরৎ পাঠান ও ডাক্তারকে ধমকান।'

উত্তেজিত সুপার সাহেব প্রচণ্ড স্বরে বাধা দেন—'মিথ্যা কথা।'

ত্রৈলোক্যনাথ টিকিট দেখান—'৩০শে আমাকে হাসপাতালে বহন করা হয়েছে—ডাক্তার ডিটেন করেছেন। ৩১শে আমার

স্বাস্থ্য আরও খারাপ ছিল—ডাক্তার ভর্ত্তি করিলেন। কেমন করে আমি নীরোগ হলাম।'

'এ তোমার বাহানা' বলিয়া সাহেব আগে চলেন।

আর একটী সেল। বন্দী শিখ পিছন ফিরিয়া সেলের মধ্যে বসিয়া আছে। জেলার তাহাকে দাঁড়াইতে আদেশ করিল। সে গ্রাহ্যই করিল না—এমন কি পেছন ফিরিয়াও একবার চাহিল না। যেমন ছিল তেমনই পেছন ফিরিয়া বসিয়া রহিল।

পরের সেলে আর একজন শিখ শুইয়া আছে। তাহাকে ডাকিতেই সে জেলারের মা বাপ ও উর্দ্ধতন চৌদ্দ পুরুষ তুলিয়া গালি পাড়িতে সুরু করে ও কর্কশ কণ্ঠে জবাব দেয়—'আমার ঘুমের ব্যাঘাত করিও না, এখান হইতে নিকাল যাও।'

প্রত্যেক ইয়ার্ডে একই ব্যাপার। চীফ্ কমিশনার সাহেব স্তম্ভিত, সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব উত্তেজিত, জেলার ক্রোধে কম্পমান। একী হইল! হঠাৎ কেমন করিয়া এতদিনের চিরাভ্যস্ত আবহাওয়া পাল্টাইয়া গেল। এত সাহস কয়েদীরা কোথা হইতে পাইল। এ যে অবিশ্বাস্য, এযে অসম্ভব—সেলুলর জেলের বাতাবরণে এ যে কল্পনা।

ছোট ছোট ঘটনা—কিন্তু কয়েদীদের চরিত্রের নির্য্যাস ও সৌরভ প্রকাশ করিয়া যায়।

শক্তিধর সের সিং খাইতেও বিশেষ পটু। একদিন হাসপাতালের ডাক্তার দশ সের দুধ ভর্ত্তি বাল্‌তি দেখাইয়া বিদ্রূপ করিয়া বলেন—'শের সিং এটা খেতে পার?' শের সিং অবলীলাক্রমে চুমুক দিয়া বাল্‌তি শেষ করিয়া দেয়।

সহবন্দী ফণীবাবু দুপাতা তামাক পাঠাইয়া ত্রৈলোক্যনাথকে সেরখানেক তেল জোগাড় করিয়া দিতে অনুরোধ জানান। তদনুযায়ী ত্রৈলোক্যনাথ তেলঘরের কয়েদীর সহিত বন্দোবস্ত করিয়া এক সের

তৈল লইয়া ফিরিবার পথে প্রহরারত টিণ্ডেলের হাতে ধরা পড়িয়া যান এবং যখন অবধারিত শাস্তি পাইতে টিণ্ডেলটীর সহিত জেলারের আফিসের দিকে চলিয়াছেন সেই সময় হঠাৎ শের সিংয়ের সেই স্থানে অভ্যুদয়। সর্দ্দার, জনাব প্রভৃতি নানা সম্ভাষণে আপ্যায়িত করিয়া শের সিং টিণ্ডেলকে প্রশ্ন করেন—'কি হয়েছে ?'

'এই বাঙালী তেল চুরি করেছে'—টিণ্ডেল জবাব দেয়। 'তাই নাকি, বড় অন্যায়, দেখি কতটুকু তেল', বলিয়া পাত্রটী টিণ্ডেলের হাত হইতে আপন হাতে লইয়াই একচুমুকে এক সের তেলের সবটুকু পান করিয়া খালি পাত্রটী 'নে শালা' বলিয়া মাটিতে ফেলিয়া দিলেন।

মালও নাই—সাক্ষীও নাই। এতবড় সুযোগটা হাতছাড়া হইয়া গেল। টিণ্ডেল রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে চলিয়া যায়।

একদিন অপরাহ্নে—সবাই খাইতে বসিয়াছে। জেলার সাহেব পরিদর্শনে আসিয়া বৃদ্ধ নাধন সিংকে জিজ্ঞাসা করিলেন "ক্যায়সা হ্যায় জী ?"

বৃদ্ধ সাথে সাথে জবাব দেয়—'ক্যান, তোমার মেয়েকে বিয়ে দেবে নাকি ? তাই বর খুঁজ্‌ছ। পায়ে বেড়ী, সারা দিনরাত সেলে বন্ধ, খাবার কম আবার জিগাও কেমন আছি—দিল্লাগি।'

লাভা স্রোত থামে না। 'বেকুব, বেহায়া লাজ লাগে না—বেসরম্‌।'

জেলার সাহেব তাড়াতাড়ি সরিয়া পড়েন।

কেউ আর শাস্তির কথা ভাবেন না। সব শাস্তিই ত দেওয়া হইয়াছে। জেলের কোডে আর নূতন কোন শাস্তির নাম নাই। সব শাস্তি মাথায় করিয়া বন্দীদের দল অটল, নির্ভয়, বেপরোয়া।

ভয় দেখাইতে গিয়া শাসকগোষ্ঠী নিজেরাই ভয় পাইতে সুরু করিয়াছে। ইতিমধ্যে ভানু সিং ও আরো দু'একজনের মৃত্যু হইয়াছে।

যদিও 'মহারাজ' জাহাজ ছাড়া কোন জাহাজ আন্দামানে যাতায়াত করিত না এবং কোন পোষ্ট আফিস না থাকায়— কয়েদীদের যে কয়েকটী চিঠি কর্ত্তৃপক্ষের হাত দিয়াই যাওয়া আসা করিত—তবুও আন্দামানে কয়েদীদের উপর অত্যাচার ও নির্য্যাতন, ভানু সিংহ ও রামরক্ষার অপমৃত্যুর সংবাদ ও সেলুলর জেলের দুরবস্থার কাহিনী সুরেন্দ্রনাথের 'বেঙ্গলী' সংবাদ পত্রে প্রকাশিত হইয়া পড়িল এবং সুরেন্দ্রনাথ স্বয়ং কাউন্সিলে ইংরাজ সরকারকে তাঁহার জ্বালাময়ী প্রশ্নবাণে ও অগ্নিময়ী বাগ্মিতায় জর্জ্জরিত করিয়া তুলিলেন।

সরকার বাহাদুরের উত্তর—কতকগুলি দুষ্ট প্রকৃতির লোক গণ্ডগোল করিতেছে।

এই ধর্ম্মঘটে কোন নেতা যোগ দেন নাই এবং ইহাতে তাহাদের সহানুভূতিও নাই।

ত্রৈলোক্যনাথ লিখিতেছেন—"ক্রমে ক্রমে এই সংবাদ আমাদের নিকট পৌঁছাইল। ধর্ম্মঘট চলিতে লাগিল। অবশেষে ছয় মাস অতীত হইবার পর আমাদের বেড়ী কাটিয়া দিল। আমরা সেল হইতে বাহির হইলাম। কিন্তু আমাদের সংগ্রাম চলিতে লাগিল। আমরা পুনঃ পুনঃ দণ্ডভোগ করিতে লাগিলাম। সেদিন ছত্তার সিং সুপারিণ্টেডেণ্টকে প্রহার করিলেন। ফলে ছত্তার সিং যমের দক্ষিণ দ্বার দেখিয়া আসিলেন। তাঁহার প্রতি অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য হাতকড়ি, বেড়ী ও সেল সাজা হইল। পুরা পাঁচ বৎসর তিনি এই অবস্থায় ছিলেন।

হঠাৎ একদিন ত্রৈলোক্যনাথের মেজদার চিঠি আসিয়া হাজির। 'তোমার জন্য অত্যন্ত চিন্তিত ও দুঃখিত আছি। তুমি তোমার দুষ্কর্ম্মের ফল ভোগ করিতেছ, সদ্ভাবে থাকিও' ইত্যাদি।

ত্রৈলোক্যনাথ কখনও ত কোন চিঠি লেখেন নাই তবে এচিঠি

কেন? তিনি বুঝিতে পারিলেন, সরকার বাহাদুর তাঁহার মেজদাকে দিয়া এ চিঠি লিখাইয়াছেন—আশা যদি অনুভূতিতে নাড়া দেওয়া যায়। ত্রৈলোক্যনাথ চিঠিটি পড়েন আর আপন মনে হাসেন।

"আমাদের সাজার ভয় নাই, প্রাণের মায়া নাই। তাই জেল কর্ম্মচারীরা এখন আমাদের ভয়ের চক্ষে দেখিত। সাধারণ কয়েদীরাও আমাদিগকে সম্মানের চক্ষে দেখিত। জেলের এখন অনেক পরিবর্ত্তন হইয়া গেল। এখন আর আত্মহত্যা হয় না।"

হঠাৎ আবার গোলমাল বাধে। পাঞ্জাব ও আমেদাবাদ হইতে মার্শাল-ল কেসের আসামীরা হাজির—তাহাদের ঘানিতে দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু তাহারা ঘানি টানিবে না। ঘানি ঘরে শুইয়া পড়িল। জেলারের হুকুমে তাহাদের হাত পা বাঁধিয়া ঘানির সঙ্গে বাঁধিয়া অপর কয়েদীদের দ্বারা ঘানি ঘোরানো চলিল। ঘানি ঘোরে আর হাত পা বাঁধা অবস্থায় সত্যাগ্রহীর দল মাটির উপর হেঁচড়াইতে হেঁচ্ড়াইতে ঘুরিতে থাকে। অনবরত মাটির সহিত ঘর্ষণে হাত-পা ও পিঠের চামড়া উঠিয়া যায়—রক্ত ঝরে। সত্যাগ্রহীরা অনড়—সরকার অটল।

বন্দীদের মুখে মুখে দাবানলের মত এই নৃশংস কাহিনী ইয়ার্ডে ইয়ার্ডে ছড়াইয়া পড়ে। ত্রৈলোক্যনাথ, ভূপেন ঘোষ, নাধান সিং চীৎকার জুড়িয়া দেন। শান্ত আবহাওয়া আবার অশান্ত হইয়া উঠে। জেল কর্ত্তৃপক্ষ গণ্ডগোলের আশঙ্কায় সত্যাগ্রহীদের মুক্ত করিয়া দেয় কিন্তু প্রতিবাদকারীদের সেলে বন্ধ করে। ত্রৈলোক্যনাথ পূর্ব্বের সাজায় ডাণ্ডা বেড়ী অবস্থায় তখন সেলেই ছিলেন—তাই সেলেই থাকিলেন।

সুপার সাহেব আসিতেই ত্রৈলোক্যনাথ এই অমানুষিক অত্যাচারের কৈফিয়ৎ তলব করিলেন

রাগত সুপার প্রশ্ন করেন—সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট কে? তুমি না আমি?'

"জেলের কর্ত্তা আপনি তাই আপনাকে প্রশ্ন করছি—অত্যাচার কেন?"

ধমক দেন সুপার সাহেব—"চোপ্ রও শুয়ার ক্যা বাচ্চা"

সাথে সাথে দ্বিগুণ স্বরে পাল্টা চেঁচান ত্রৈলোক্যনাথ—"চোপ্-রও কুত্তীকা বাচ্চা"

তারপর অনর্গল পাঞ্জাবী ও হিন্দীতে নানাধরণের গালি শব্দ-ভাণ্ডার উজাড় করিয়া আশেপাশের সব সেলগুলি হইতে ক্রমান্বয়ে বর্ষিত হইয়া চলিল। সুপার সাহেব বেগতিক দেখিয়া পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিলেন বটে কিন্তু ত্রৈলোক্যনাথের শাস্তি বিধান করিতে ভুলিলেন না।

'পেনাল ডায়েট্' বন্দোবস্ত হইল—সারাদিনে আলুনি আধসের ফেন। আর কিছু পাইবেন না।

"এ সংবাদ অল্পক্ষণের মধ্যে জেলের সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িল। খাবার সময় পাচক আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, আমি কি খাইতে চাই, ভাত না রুটী। আমি বলিলাম আমার সাজা হইয়াছে, আমাকে ফেন দাও। সে বলিল তোমার বাহাদুরির কথা আমরা শুনিয়াছি; চৌকায় আমরা ঠিক করিয়াছি তোমাকে ফেন খাইতে দিব না। তুমি যাহা খাইতে চাও তাহাই দিব। আমি ইতস্তত করিতেছি—এমন সময় খাবারের সঙ্গে যে পেটী-অফিসার আসিয়াছিল সে ফেন মাটিতে ফেলিয়া দিয়া বলিল, 'বাঙ্গালী শের হ্যায়, ডবলখানা দাও।"

"ইহার পর আমার সেলে অনেকে গোপনে চাটনি ও রুটী পাঠাইতে লাগিল। এত খাবার আসিতে লাগিল যে আমি তাহা বিতরণ করিতে লাগিলাম। আমার চার দিন এই ভাবেই কাটিয়া গেল। ফেন একদিনও খাইতে পাইলাম না।"

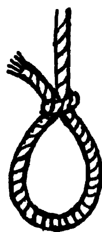
মহারাজ ত্রৈলোক্যনাথ

আন্দামানের যমপুরীসম সেলুলর জেলে উদ্ধত শাসকের অলক্ষ্যে পরাজয় ঘটিয়া গেল।

তিন বৎসরের এই ক্রমাগত সংগ্রামে ত্রৈলোক্যনাথ একজন অন্যতম অগ্রণী। শরীরের ব্যাধি তাহার প্রতিবন্ধকতা করিতে পারে নাই। বেত ছাড়া সব সাজাই তাঁহাকে ভোগ করিতে হইয়াছে। ক্রস্‌বার, ফেটার্স, ডাণ্ডাবেড়ী, শিকলী বেড়ী, খাড়া হাতকড়ি, পিছনে হাতকড়ি, রাত্রে হাতকড়ি, পেনাল ডায়েট, সেলবাস জেল কোর্ডের সব প্রকার শাস্তিই তাহার উপর দিয়া গিয়াছে।

তবুও উন্নত শির উন্নত রাখিয়াছেন—নত করেন নাই। ত্রৈলোক্যনাথ প্রায়শই আপন মনে গাহিতেন ও বিশ্বাস করিতেন--

"ওদের বাঁধন যত শক্ত হবে মোদের বাঁধন টুট্‌বে,
ওদের আঁখি যত রক্ত হবে মোদের আঁখি ফুটবে।"



"সরকার বাহাদুর যখন দেখিলেন বিপ্লবীরা এতকালের বিশ্বাসী সৈন্যদিগকেও হাত করিতে সক্ষম এবং জার্ম্মাণীর সহিত বন্দোবস্ত করিয়া তিন জাহাজ বোঝাই অস্ত্রশস্ত্র আমদানীর ব্যবস্থা করাও

তাহাদের দ্বারা সম্ভব হইয়াছে তখন তাহাদের ঘুম ভাঙিল। সরকার চিন্তা করিয়া দেখিলেন শুধু দমন নীতি দ্বারা দেশ শাসন চলিবে না, সঙ্গে সঙ্গে শাসনভারও দেশবাসীর হাতে দিতে হইবে।"

ব্রিটীশ শাসকরা এতকাল আন্দামান সম্বন্ধে চোখ বুজিয়া থাকিলেও আর নিশ্চেষ্ট থাকা সমীচীন বোধ করিলেন না। জেল কমিশন গঠিত হইল ও সরেজমিনে তদন্ত করিতে তাঁহারা আন্দামান আসিলেন। রাজবন্দীদের সহিত আলাপ হইল। অতীতের কথা ভুলিয়া গিয়া ভবিষ্যতে কী করা যায় তাহার সুপারিশ চাহিলেন। রাজনৈতিক বন্দীরা দাবী করিলেন পেনাল সেটেল্‌মেণ্ট উঠাইয়া দিতে হইবে, পৈতা ও ধর্ম্মের চিহ্ন রাখিতে দিতে হইবে, ফাঁসী উঠাইয়া দিতে হইবে, শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। জেল কমিশন দরখাস্ত পাইয়া আদেশ দিলেন—বন্দীরা তিন মাস অন্তর চিঠি লিখিতে পারিবে এবং পৈতা ও ধর্ম্মের চিহ্ন রাখিতে পারিবে।

গত তিন বৎসর ধরিয়া অনবরত গণ্ডগোল চলিতেছে তাই জেলার ও সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট উভয়কেই বদলী করা হইল। নূতন চিন্তাধারায় উদ্বুদ্ধ হইয়া নূতন কর্ম্মকর্ত্তাদ্বয় আসিলেন। তাই পরিকল্পিত সদয় ব্যবহার সুরু হইল, শান্তিও প্রতিষ্ঠিত হইল।

ইতিমধ্যে বিশ্বযুদ্ধ থামিয়াছে। গভর্ণমেণ্ট 'অ্যাম্‌নেষ্টি' ঘোষণা করিলেন। বারীণ ঘোষ, শচীন সান্যাল ও কয়েকজন শিখ মোট কুড়ি জন বন্দী মুক্ত হইয়া স্বদেশ প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। কিছু দিন পর পেনাল সেটেলমেণ্ট উঠিয়া গেল। সমস্ত রাজনৈতিক বন্দী ভারতের মাটিতে ফিরিয়া আসিলেন।

সকলের সহিত ত্রৈলোক্যনাথও জাহাজে উঠিলেন। মৃত্যু গুহায় বাস করিয়া মৃত্যুর সহিত সারাক্ষণ পাঞ্জা লড়িয়া আজ তাঁহারা সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। শাসককে সন্ধি করিতে হইয়াছে। এ জয়ের

হয়ত চাক্ষুষ অভিব্যক্তি নাই—কিন্তু মানস-পটে ইহার অমৃত-স্পন্দন অনুভূত হয়।

ত্রৈলোক্যনাথ সেই ১৯১৬ সালে যেদিন আন্দামানে নির্ব্বাসিত হইয়াছিলেন ও ১৯২১ সালের শেষভাগে আবার যখন ভারতের মাটিতে ফিরিলেন—এই দীর্ঘ পাঁচ বৎসরের ব্যবধানে তখন বাঙলা তথা ভারতের জনচেতনায় ও মানসিকতায় প্রচণ্ড বিপ্লব ঘটিয়া গিয়াছে। শেষবারের মত পশুশক্তির প্রভাব দেখাইতে জালিওয়ানওয়ালাবাগের ক্ষুদ্র পরিসরে অবরুদ্ধ- জনতার উপর মেসিনগানের মুখ খুলিয়া দিয়া গণহত্যা করিয়াছে। বিবেকাহত রবীন্দ্রনাথ ইংরাজ রাজশক্তির এই পাশবিকতায় তাহাদের প্রদত্ত নাইট উপাধি ঘৃণায় পরিত্যাগ করিয়াছেন। স্যার রবীন্দ্রনাথ মানব রবীন্দ্রনাথে উন্নীত হইয়াছেন।

শতশত যুবকের আত্মত্যাগ ও নির্য্যাতন বিফলে যায় নাই। "তাহাদের ধ্বংসস্তূপ হইতে নূতন ভারত সৃষ্টি হইল, দেশে নূতন জাগরণ আসিল। দেশবাসী প্রাণের অব্যক্ত ব্যথা এখন স্পষ্ট করিয়া ব্যক্ত করিতে শিখিল। গভর্ণমেণ্টের দমন-নীতি ব্যর্থ হইল, 'মণ্টেগু চেমস্ ফোর্ড রিফর্ম্ম' এর চাল ব্যর্থ হইয়া গেল। এখন হইতে সুরু হইল আন্দোলন। ইহা পূর্ব্বের আন্দোলন হইতে বৃহৎ ব্যাপক—ইহাই নন্-কো-অপারেশন বা অসহযোগ আন্দোলন।"

এই আন্দোলন শুধু যুবকদের মধ্যে নিবদ্ধ ছিল না—ইহা দেশের জনসাধারণের আন্দোলন। নেতৃবৃন্দ ঘোষণা করিলেন সরকারের সহিত কোনরূপ সহযোগ করা হইবে না, আদালত বয়কট, স্কুল কলেজ বয়কট ও নূতন শাসন সংস্কার বয়কট করিতে হইবে এবং নূতন কাউন্সিলে কেহ যাইতে পারিবে না। এখন খেলাফৎ আন্দোলন চলিতেছিল। দলে দলে মুসলমানগণ এই আন্দোলনে যোগ দিলেন। এই আন্দোলন ছিল ভারতব্যাপী- এবং ইহাতে

প্রায় পঁচিশ হাজার লোক জেলে যায়। ইহার পূর্ব্বে কখনও রাজনৈতিক অপরাধে এত অধিক লোক জেলে যায় নাই।"

এতদিন যাহা ছিল সীমিত আজ তাহাই পরিব্যাপ্ত। বিপ্লব-পথযাত্রীরা তাঁহাদের প্রজ্জ্বলিত অগ্নি আসমুদ্র-হিমাচলে বিধূমিত দেখিয়া পরম উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন।

স্বাধীনতাস্পৃহা জীব জগতের আদি ধর্ম্ম। এই স্বাধীনতাকে যাহারা যখন শক্তিমদমত্ততায় দলন করে – তখন তাহাদের উদ্ধত ধ্বজা ধূলায় লুটাইবেই। ইহা ইতিহাসের বিধান।

বাঙলায় আবার প্রাণের জোয়ার আসিয়াছে। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের পর বাঙলা আবার উদ্বেল হইয়া উঠিয়াছে। মিঃ. সি. আর. দাশ তাঁহার সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া দেশবন্ধুরূপে এই আন্দোলনের পুরোধা হইলেন। ত্রৈলোক্যনাথ যখন আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে নীত হইলেন তখন সত্যাগ্রহী বন্দীর দল সময়ে অসময়ে 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনিতে আলিপুর জেল-প্রাঙ্গণ মুখরিত করিতেছে। যে মন্ত্র সম্বল করিয়া তাঁহারা একদা তামসীরাতে বন্ধুর পথে নিরুদ্দেশের ঠিকানায় পাড়ি দিয়াছিলেন, যে মন্ত্র উচ্চারিত হইলে পুলিশের নির্য্যাতন নামিয়া পুলিশের হাতের লাঠি মন্ত্রমুগ্ধ কিশোরের মাথা ফাটাইতে দ্বিধা করিত না, সেই মন্ত্র আজ সর্ব্বত্র সর্ব্বকণ্ঠে মন্দ্রিত ; বজ্রনির্ঘোষের মত বাজিতেছে।

ত্রৈলোক্যনাথও কণ্ঠ মিলাইলেন—বন্দেমাতরম্। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, দেশগৌরব সুভাষচন্দ্র বসু, শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী, দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ শাসমল, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, মৌলানা আক্রাম খাঁ, মৌলানা মুজিবর রহমন, পীর বাদশা মিঞা, চাঁদ মিঞা সাহেব, হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, শ্রীযুক্ত ত্রিপুরা চৌধুরী প্রভৃতি নেতৃবৃন্দ তখন আলীপুর কেন্দ্রীয় কারাগারে বন্দীদশায় রহিয়াছেন।

"আলিপুর জেলে তখন প্রায় ছয়শত সত্যাগ্রহী কয়েদী ছিলেন। জেলে যদি অল্প কয়েকজন রাজনৈতিক বন্দী থাকে তবে তাঁহাদের উপর আইন কানুন চালানো বা বলপ্রয়োগ করা সহজ হয়, কিন্তু বহুলোক হইলে তাহা চলে না।"

বিপ্লবীদের আনিয়া 'বম্‌ইয়াড´' নামে পরিচিত নির্দ্দিষ্ট এলাকায় আবদ্ধ রাখা হইল। কাহারও সহিত মেলামেশা নিষেধ। তাঁহারা আপন এলাকা ছাড়িতে পারিবেন না, অন্যেরাও তাঁহাদের এলাকায় আসিতে পারিবেন না। "কিন্তু যখন বহু লোকের সমাগম হইল তখন দলে দলে যুবকেরা দেওয়াল টপ্‌কাইয়া ইয়ার্ডে আসিতে লাগিলেন। অবশেষে সুপারিণ্টেডেণ্ট আমাদিগকে তাঁহাদের সহিত মেলামেশার সুযোগ দিলেন।"

আলিপুরের কারাসঞ্চালক বড় রায়ন সাহেব তাঁহার সদয় ও প্রীতিপুর্ণ ব্যবহারে বিপ্লবীদের মুগ্ধ করিয়া তুলিলেন এবং অত্যাচারের বিরুদ্ধে সতত সংগ্রামী ত্রৈলোক্যনাথও তাঁহার চরিত্র-মাধুর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া আদর্শ কয়েদী বলিয়া গণ্য হইলেন।

আলিপুর জেলে স্থানান্তরিত হইবার পরে পরেই বড়লাটের শাসন পরিষদের সভ্য হোমমেম্বর স্যার হিউ ষ্টিফেন্স জেল পরিদর্শনে আসিয়া ত্রৈলোক্যনাথকে বলিলেন—"তুমি আন্দামানে খুব ট্রাবল দিয়েছ, তোমার বিরুদ্ধে আমাদের কাছে অনেক অভিযোগ আসিয়াছে।" ত্রৈলোক্যনাথ উত্তরে বলিলেন—"আমি শুধু জেল কর্তৃপক্ষের অত্যাচার ও অবিচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়াছি।"

"বাঙলা দেশের সমস্ত বড় বড় নেতৃবৃন্দ আলিপুর জেলে প্রত্যেকেই বম্‌ইয়ার্ডে আসিয়া আমাদের সাথে দেখা করিয়া গিয়াছেন। আমরাও পরে তাঁহাদের ইয়াডে´ গিয়া সকলের সহিত আলাপ করিয়াছি।"

"নেতাদের প্রত্যেকেই আমাদিগকে স্নেহের চক্ষে দেখিতেন এবং তাঁহাদের বাড়ী হইতে যে সমস্ত খাদ্যদ্রব্য আসিত আমরা তাহার ভাগ পাইতাম। আমরা সাত আট বৎসর যাবৎ জেলে আছি, বাহিরের খাদ্যদ্রব্য চোখে দেখি নাই। এখন আমাদের কাছে সব জিনিষই নূতন মনে হইতে লাগিল। কলা, কমলালেবু, রসগোল্লা, চিড়া, গুড় প্রভৃতির স্বাদ আমরা ভুলিয়া গিয়াছিলাম।"

বাসন্তী দেবী চিত্তরঞ্জনের জন্য আহার্য্য পাঠাইতেন। একদিন দেশবন্ধু ত্রৈলোক্যনাথ ও শশাঙ্কবাবুকে নিমন্ত্রণ করিয়া একসঙ্গে বসিয়া আহার করিলেন। পরিবেশন করিলেন দেশবন্ধুর দক্ষিণ হস্ত বাঙলার দুলাল সুভাষচন্দ্র।

বিপ্লবীদের সংস্পর্শে আসিয়া তরুণ সত্যাগ্রহীরা আকৃষ্ট হইয়া পড়ে; সব সময়েই তাহারা বিপ্লবীদের সহিত মেলামেশা করিতে থাকে। তরুণ সাগ্নিক সুভাষচন্দ্র এইখানেই প্রথম বিপ্লবীদের সংস্পর্শে আসেন। ত্রৈলোক্যনাথের সহিত সুভাষচন্দ্রের আলাপ এই আলীপুর কারাগারে। কারাগারে বীরেন্দ্রনাথ শাসমল মহাশয়ের সহিত ত্রৈলোক্যনাথের প্রায়ই জাতীয় বিদ্যালয় সম্বন্ধে আলোচনা হইত।

অসহযোগ আন্দোলনের সময় সরকার-প্রবর্ত্তিত শিক্ষা বয়কট চলে। স্কুল কলেজ বন্ধ হয়। জাতীয় আদর্শে শিক্ষা দানের উদ্দেশ্যে কিছু জাতীয় বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হয়।

ত্রৈলোক্যনাথের বক্তব্য—"স্বদেশী আন্দোলনের সময় বহু জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে—কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত একটিও টিঁকে নাই। এবং ঐ সকল বিদ্যালয় হইতে একটীও মানুষ বাহির হয় নাই। জাতীয় বিদ্যালয়গুলি যদি সরকারী বিদ্যালয়ের অনুকরণে প্রতিষ্ঠিত হয় তবে সে বিদ্যালয়ের কোন প্রয়োজন নাই। জাতীয় বিদ্যালয়ের কাজ হইবে ছেলেদিগকে দেশপ্রেমিক করিয়া তোলা। জাতীয়

বিদ্যালয়ে পড়িয়া যদি জাতীয় ভাব না জাগে, দেশপ্রেম না জন্মে তবে সে শিক্ষা জাতীয় শিক্ষাই নহে। জাতীয় বিদ্যালয়ের ছেলে-মেয়ে যদি দেশের কাজে না আসে, তাহাদের যদি অপর দশজনের মত চাকুরীই করিতে হয় তবে জাতীয় বিদ্যালয়ের কোন প্রয়োজন নাই। জাতীয় বিদ্যালয়ের ছাত্রদের নির্ভীক, দেশপ্রেমিক ও চরিত্রবান্ হইতে হইবে। তাহারা এরূপ শিক্ষা পাইবে যে তাহার ফলে তাহারা দেশের সেবায় নিযুক্ত হইবে এবং প্রয়োজন হইলে দেশের জন্য প্রাণ বিসর্জ্জন দিবে।"

বীরেন্দ্রনাথ বলিলেন, তাঁহার মেদিনীপুর জেলায় জাতীয় পর্য্যায়ে প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের পরিকল্পনা আছে এবং মুক্তির পর ত্রৈলোক্যনাথকে এই সংগঠনের ভার লইতে আহ্বান জানাইয়া রাখিলেন।

কথায় কথায় ইহাও স্থির হইল, জাতীয় বিদ্যালয়ের উপযুক্ত কোন পাঠ্য পুস্তক নাই—তাই সর্ব্বপ্রথম প্রয়োজন কতকগুলি সার্থক পাঠ্য পুস্তক। ত্রৈলোক্যনাথকে শিশুমনের উপযোগী কতকগুলি এই ধরণের পুস্তক রচনা সুরু করিতে অনুরোধ জানান বীরেন্দ্রনাথ এবং উদ্বুদ্ধ ত্রৈলোক্যনাথ অতি অল্প সময়েই প্রথম হইতে পঞ্চম ভাগ পর্য্যন্ত রচনা শেষ করিলেন।

"আমার পাণ্ডুলিপি তিনি মাঝে মাঝে দেখিতেন এবং যে সব জায়গায় মনে করিতেন সরকার হইতে আপত্তি হইতে পারে সে সব জায়গা পরিবর্ত্তন করিতে বলিতেন, এবং আমি তাহা পরিবর্ত্তন করিয়া দিতাম। আমার লেখার কথা ইতিমধ্যে রাষ্ট্র হইয়া পড়িল, এবং একদিন হেমেন্দ্র দাশগুপ্ত দাশমহাশয়কে (দেশবন্ধু) এই সংবাদ দিলেন। দাশমহাশয় এই সম্বন্ধে আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন এবং খাতাগুলি দেখিতে চাহিলেন। তিনি তাহা পড়িয়া বলিলেন—"আমার একটী প্রাইমারী এডুকেশন স্কীম আছে,

খাতাগুলি তুমি আমাকে দাও। আমি খাতাগুলি দাশ মহাশয়কে দিলাম। সুভাষবাবু ইহা জানিতেন। দাশ মহাশয় মুক্ত হইবার সময় খাতাগুলি সঙ্গে লইয়া যান। অবশ্য আমার নিকট আরও এক কপি ছিল।”

গান্ধীজী দেশব্যাপী আন্দোলনের প্রারম্ভে ঘোষণা করিয়াছিলেন, নয় মাসে স্বরাজ আসিবে। উত্তাল জনসমুদ্র সে আন্দোলনে ঝাঁপাইয়া পড়িল এবং মনে-প্রাণে সকলেই বিশ্বাস করিত ৩১শে মার্চ্চ ভারতবর্ষ স্বাধীন হইবে।

নির্দ্দিষ্ট সময় অতিক্রান্ত হইল, কিন্তু ভারতবর্ষ ইংরাজের হস্তচ্যুত হইল না। ৩১শে মার্চ্চের পর আর কাহাকেও কারাগারে থাকিতে হইবে না —এ বিশ্বাস ফলপ্রসু হইল না। অনেকেই নিরাশ হইয়া পড়িলেন। যাহা হউক আইন অমান্য আন্দোলনের সকল সত্যাগ্রহী বন্দীরা মুক্ত হইয়া চলিয়া যাইতে লাগিলেন। কেবল বিপ্লবীরা দণ্ড ভোগ করিতে রহিয়া গেলেন। তাহাদের মুক্তির কথা কেহ বলিল না, কেহ তুলিল না।

এইরূপে রাজনীতিতে হিংসা ও অহিংসা তত্ত্বের সূত্রপাত হইল। রাজনৈতিক চরিত্র দ্বিধাবিভক্ত হইল।

আলীপুর কারাগারে আসিবার পর এতদিন কীভাবে যে দিনগুলি কাটিয়া গিয়াছে তাহা ত্রৈলোক্যনাথ বুঝিতে পারেন নাই। এইবার বড় ফাঁকা ঠেকিতে লাগিল। কারাগারের প্রাণচাঞ্চল্য চলিয়া গিয়াছে।

ত্রৈলোক্যনাথ গীতায় মনোযোগ দিলেন। অতীতে বহু পণ্ডিত, দার্শনিক, চিন্তাবিদ্ গীতার ভাষ্য লিখিয়াছেন, আধুনিক কালে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দও গীতার ভাষ্য লিখিয়াছেন। গীতার শ্লোকের মধ্যে সবাই নিজের মানসিক ভাববিন্যাসের, আপন চৈতন্য বোধের রূপরেখা নির্ণয় করিয়াছেন—তাই প্রত্যেকের ভাষ্য আপন আপন

মতবাদের অভিপ্রকাশ। ত্রৈলোক্যনাথও আপন রাজনৈতিক মতাদর্শ, আপনার জীবন-জিজ্ঞাসা, আপনার ভাবসত্তা গীতার শ্লোকের মাধ্যমে বাখ্যা শুরু করিলেন। ত্রৈলোক্যনাথেব বক্তব্য :

"শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ শ্রবণ করিয়া অর্জ্জুন জ্ঞানমার্গ অবলম্বন পূর্ব্বক কোন নির্জ্জন পাহাড়ের উপব যাইয়া ধ্যানস্থ হইয়া বসিয়া থাকেন নাই, অথবা ভক্তিমার্গ অবলম্বন পূর্ব্বক গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া প্রেম বিতরণ করেন নাই, তিনি যুদ্ধ করিয়াই পৈতৃক রাজ্যের পুনরুদ্ধাব সাধন করিলেন"—ইহাই ত্রৈলোক্যনাথেব নিকট গীতার সারমর্ম্ম।

ত্রৈলোক্যনাথের বিশ্লেষণ—"যখন উভয় পক্ষের সৈন্য যুদ্ধার্থে প্রস্তুত তখন অর্জ্জুন দেখিলেন এই যুদ্ধে বহু লোকক্ষয় হইবে, আত্মীয় স্বজনদিগকে হত্যা করিতে হইবে এবং ভারত বীবশূন্য হইয়া পড়িবে। তিনি স্থির করিলেন যুদ্ধ কবিবেন না। শ্রীকৃষ্ণ তখন অর্জ্জুনকে বলিলেন—তুমি ক্লীবত্ব পরিত্যাগ কর ; ইহা তোমার মত লোকেব শোভা পায় না। তিনি তখন সমস্ত বেদবেদান্ত মন্থন করিয়া জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ ও কর্ম্মযোগেব আলোচনা করিয়া অর্জ্জুনকে ইহাই বুঝাইলেন, তোমার পৈতৃক রাজ্যের পুনরুদ্ধার করাই তোমাব একমাত্র ধর্ম্ম।

ত্রৈলোক্যনাথের প্রশ্ন—"গীতা আমাদের দেশে সকলেই পড়েন এবং পাঠ না করিলে হিন্দুর শ্রাদ্ধ কার্য্য সমাপ্ত হয় না। আমাদের দেশে যাঁহারা গীতা পাঠ করেন তাঁহাদের মাঝে কয়জন বলিতে পারেন, আমার মোহ নষ্ট হইয়াছে—আমি এখন আমাদের পিতৃ-রাজ্যের উদ্ধার সাধনে নিযুক্ত হইব, দেশে ধর্ম্মরাজ্য প্রতিষ্ঠা করিব এবং শান্তি প্রতিষ্ঠা করিব।"

ত্রৈলোক্যনাথের প্রত্যয়—"মরুভূমিতে বসিয়া জল জল চীৎকার করিলেই জল পাওয়া যায় না, কষ্ট করিয়া জল সংগ্রহ করিতে হয়।

আমরা চাই সহজে পুণ্য সঞ্চয় করিতে। কষ্ট করার প্রবৃত্তি নাই, তাই আমাদের পুণ্যও সঞ্চয় হয় না—দুঃখ মোচনও হয় না।"

সর্ব্বক্ষণের জন্য ত্রৈলোক্যনাথের শ্রবণে শ্রীকৃষ্ণের সেই উদাত্ত আহ্বান ধ্বনিত হয় "মৃতো বা প্রাপ্স্যসে স্বর্গং জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীম্।"

"আলীপুর জেলে আমি গীতার চারি অধ্যায় বাখ্যা করি। আমি গীতার শ্লোকে সাধারণ বাখ্যা লিখিয়া ভাবার্থে আমার মত গীতার মধ্য দিয়া অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের এই শ্লোক বলার এই অভিপ্রায় ছিল, এইভাবে চালাইয়াছি।"

অনন্ত সমুদ্র গীতা। সবাই আপন আপন পাত্রে সেই সমুদ্র বারি তুলিয়া তাহার আকৃতি দিয়াছে। প্রকৃতিতে সে এক।

শ্রীকৃষ্ণেরই প্রতিশ্রুতি—যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং তথাহি ভজাম্যহং।

যে যেমন করে সেবে সে তেমনি করে পাবে।

দেখিতে দেখিতে ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দ আসিয়া পড়িল। ত্রৈলোক্যনাথ আলীপুর কারাগার হইতে ময়মনসিংহ কারাগারে আসিলেন, সেখান হইতে মুক্ত হইলেন।



ময়মনসিংহ কারাগার হইতে ছাড়া পাইয়া ত্রৈলোক্যনাথ সরাসরি বাড়ী গিয়া হাজির হইলেন। সুদীর্ঘ বার বৎসর পর স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন। ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে তেইশ বৎসরের উদ্দাম যৌবন

আজ যৌবন প্রান্তে উপনীত। বহু অভিজ্ঞতা, বহু সংগ্রামের স্বাক্ষর তাঁহার স্থিত-প্রজ্ঞ আননে বিদ্যমান, কালের ব্যবধানে মুখমণ্ডলে ঘটিয়াছে অনুভবযোগ্য পরিবর্ত্তন। তাই প্রণাম করিলে মেজদাদা চিনিতে পারিলেন না, প্রশ্ন করিলেন—কী নাম ?

"আমার পরিচয় দেবার পর বাড়ীতে ও গ্রামে হৈ চৈ পড়িয়া গেল। গ্রামের ও আশেপাশের গ্রামের বহুলোক আমাকে দেখিতে আসিল, অনেকের সাথে তখন আমার নূতন করিয়া পরিচয় হইল। লোকজন, রাস্তাঘাট সবই আমার কাছে নূতন ঠেকিল। বার বৎসরের ব্যবধান কম নহে, ইহার মধ্যে অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে।"

দুই তিনদিনের বেশী ত্রৈলোক্যনাথের গৃহে থাকা হইল না। সহযাত্রী, সমগোত্রীয়েরা আহ্বান জানাইতেছেন। তাই ঢাকা ময়মনসিংহ ঘুরিয়া ত্রৈলোক্যনাথ আবার কলিকাতায় আসিলেন। পূর্ব্বেই মুক্তি পাইয়া মদনবাবু কলিকাতায় একটী মেস খুলিয়াছেন, ত্রৈলোক্যনাথ সেই মেসেই উঠিলেন।

দেশবন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। তিনি ত্রৈলোক্যনাথকে দক্ষিণ কলিকাতায় অবস্থিত জাতীয় বিদ্যালয়ে শিক্ষকতার কাজ লইতে অনুরোধ জানাইলেন। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক চণ্ডীবাবু, পরিচালক সমিতির সম্পাদক ও সভ্য দেশবন্ধুর মুখে ত্রৈলোক্যনাথের প্রশংসা শুনিয়া খুবই আদর যত্ন করিয়া তাঁহাকে বিদ্যালয়ে লইয়া আসিলেন।

প্রথম দিনে স্কুলে আসিয়া ত্রৈলোক্যনাথের চমক লাগিল। এটা কি মধ্য বিদ্যালয়, না উচ্চ বিদ্যালয়। গত দশ বৎসরে ত্রৈলোক্যনাথ ছোট ছোট ছেলেদের দেখেন নাই, আজ দেখিলেন ছেলেদের বাড় অসম্ভব কমিয়া গিয়াছে। যদিও তাহারা নবম শ্রেণীতে বা অষ্টম শ্রেণীতে পড়ে তথাপি দেখিয়া মনে হইল তাহারা ষষ্ঠ বা আরও

নীচু শ্রেণীর ছাত্র। এমনই তাহাদের শরীরের অপুষ্টিজনিত গঠন।

"আমার মনে হইল এই দশ বৎসরে দেশ কতটা গরীব হইয়া পড়িয়াছে। এই যে দেশের ছেলেদের পুষ্টি বৃদ্ধি কমিয়া গিয়াছে ইহার কারণ দেশের দারিদ্র্য। এই ভাবে যদি কয়েক পুরুষ চলে আমাদের প্রবাদ বাক্য সফল হইবে। লোকে কোটা দিয়া বেগুন পাড়িবে। পঁচিশ বৎসর পুর্ব্বে দেশের যে রূপ সচ্ছল অবস্থা ছিল, এখন তাহা নাই—দেশ ক্রমশই গরীব হইয়া পড়িতেছে। এরূপ ভাবে কতদিন চলিবে?"

গড়পাড়া মধ্য বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করার পর চৌদ্দ বৎসর গত হইয়াছে। ত্রৈলোক্যনাথ দ্বিতীয়বার শিক্ষকতা সুরু করিলেন। এখানে পরিদর্শক মহিম বসুর স্কুল পরিদর্শনের আতঙ্ক নাই, দশম শ্রেণীর ছেলেকে অঙ্ক কষাইবার ভয় নাই। স্থির হইল ত্রৈলোক্যনাথ উপরের চারি শ্রেণীতে ইতিহাস ও ষষ্ঠ শ্রেণীতে ইংরাজী পড়াইবেন।

"জেল খানায় আমি বহু ইতিহাস পড়িয়াছি। গ্রীস, রোম, ইংল্যাণ্ড ও সমগ্র ইউরোপের ইতিহাস এবং অন্যান্য জায়গায় আরও অন্যান্য ইতিহাস পড়িয়াছি। আমি রমেশ দত্তের ঋগ্ বেদের অনুবাদ, কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারত, মূল রামায়ণের অনুবাদ, বাইবেল, ধর্ম্মপদ, কোরাণ ইত্যাদি সবই পড়িয়াছি।"

ত্রৈলোক্যনাথ বিশেষ করিয়া গ্রীক্ ও রোমকদের বীরত্ব কাহিনী, তাহাদের দেশপ্রেম এবং প্রাচীন ভারতের গৌরবময় ইতিহাসের কথা বলিতেন। তিনি সেই গৌরবজ্জ্বল ভারতের ছবি আঁকিয়া চলিতেন। সেইদিনকার ভারতবর্ষে যুদ্ধ জাহাজ, হাওয়াই জাহাজ, বেতার বার্ত্তার প্রচলন ছিল। সেই ভারতের যুদ্ধ জাহাজ 'বেগীনী" "মন্থরা" মহাসাগরের বুকে অতন্দ্র প্রহরায় নিযুক্ত থাকিত। সেই

ভারতবর্ষ আমেরিকা আবিষ্কার করিয়াছিল, জাপানের সন্ধান পাইয়াছিল। সেদিন তাহার বাণিজ্য পোত সপ্তসিন্ধু অতিক্রম করিয়া পৃথিবীর সর্ব্বত্র ঘুরিয়া বেড়াইত।

কল্পনাপ্রবণ ছাত্রের দল অভিভূত হইয়া গৃহে ফিরিয়া পিতামাতা অভিভাবকদের নিকট সমুজ্জ্বল-আননে আন্দামান-ফেরৎ শিক্ষক মহাশয়ের বিবরণ শুনাইত ও সগর্বে ভারতের মহিমময় অতীতের প্রদীপ্ত ঐতিহ্যের উল্লেখ করিত। কেহ কেহ বিশ্বাস করিতেন, আবার কোন কোন অভিভাবক ভৎর্সনা করিতেন।

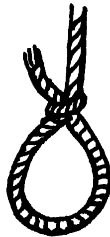
ত্রৈলোক্যনাথের নিকট ছাত্রদের অপরিসীম স্বাধীনতা। তাহারা যেমন চায় ত্রৈলোক্যনাথ তাহাদের তেমনই সুযোগ দেন। কোন দিন বা তাহারা আন্দামানের গল্প শোনে, কোন দিন বা তাহারা বক্তৃতা করিতে চায়, আবার কোন দিন বা রচনা লেখে। লেখাপড়া ছাত্রদের নিকট নীরস ও বিরক্তিকর না হইয়া সরস ও আনন্দদায়ক বলিয়া মনে হইত। ছাত্রদের অমনোযোগী দেখিলে ত্রৈলোক্যনাথ হুকুম দেন—"কথা না কহিয়া পাঁচ মিনিট যাহা পার তাহা কর।" ছাত্রের দল নির্ব্বাক লড়াই সুরু করিয়া দেয়। ধূলায় পড়ে আবার ওঠে, ধাক্কাধাক্কি করে আর ত্রৈলোক্যনাথ এই আনন্দোচ্ছল ছাত্রদের দেখেন আর নীরবে বসিয়া বসিয়া হাসেন।

"ইন্‌ফ্যাণ্ট ক্লাসের ছাত্রেরা দুই দিন যাইতে না যাইতে আমাকে চিনিয়া ফেলিল এবং আমাকে তাহাদেরই দলের একজন বলিয়া মনে করিয়া লইল। আমি স্থির করিয়াছিলাম ছেলেদিগকে কখনও প্রহার করিব না। যখনই আমি ইন্‌ফ্যাণ্ট ক্লাসের দরজার সম্মুখে যাইতাম, ছাত্রেরা তখনই একসঙ্গে দৌড়াইয়া আসিয়া কেহ আমার হাত, কেহ জামা কেহ বা কাপড় ধরিয়া টানিয়া লইয়া যাইয়া আমাকে চেয়ারে বসাইয়া দিত এবং একসঙ্গে সকলেই বই লইয়া আসিয়া আমার নিকট পড়া দেবার জন্য ভিড় করিত।"

জাতীয় বিদ্যালয়ে চরকার সুতাকাটা এক অবশ্য পাঠ্যক্রম। ত্রৈলোক্যনাথ তাহাদের সহিত সুতা কাটেন, কিন্তু ছাত্রদের মত পারদর্শিতা দেখাইতে পারেন না। কারণ ত্রৈলোক্যনাথ বন্দুক চালনাই আজীবন অভ্যাস করিয়াছেন, সুতা কাটিতে শেখেন নাই। তাই ছাত্রের দল বিস্মিত হইয়া প্রশ্ন করে, স্যার আপনি এত বড় স্বদেশী আন্দামান-ফেরত, আপনি সুতা কাটা জানেন না? তাহাদের মনে হয়ত সংশয় জাগিত, যে সুতাকাটা জানে না সে আবার কিসের স্বদেশী?

"শিক্ষকতার কাজ আমার খুব ভাল লাগিয়াছিল কিন্তু বেশীদিন একাজে থাকিতে পারি নাই। পুলিশ আমার পিছনে লাগিয়াই ছিল, সর্ব্বদা গতিবিধি লক্ষ্য করিত।" তাই ত্রৈলোক্যনাথ স্থির করিলেন গ্রীষ্মের ছুটির পর আর ফিরিয়া আসিবেন না। তিনমাস শিক্ষকতা করিয়াছেন কিন্তু বেতন গ্রহণ করেন নাই। তাই যাইবার সময় হাতে পয়সা নাই। তাই প্রধান শিক্ষকের নিকট বিশটি টাকা লইয়া আবার নিরুদ্দেশের পথে পাড়ি দিলেন।

পুলিশের ব্যাপক অনুসন্ধান আরম্ভ হয়। নজরের বাহিরে ত্রৈলোক্যনাথকে রাখিতে পুলিশ রাজী নহে।



ঢাকায় আসিয়া ত্রৈলোক্যনাথ আবার সমিতির সংগঠনে আত্ম-নিয়োগ করিলেন। তখন শ্রীজিতেশচন্দ্র লাহিড়ী ঢাকা অনুশীলন সমিতির পরিচালক। অর্থের অভাবে তখন সমিতি বিশেষভাবে বিব্রত; ডাকাতি করিয়া অর্থ সংগ্রহ রহিত হইয়াছে। তাই অর্থের সুরাহা করিবার জন্য টাকা ও নোটজাল করার প্রক্রিয়ায় ত্রৈলোক্যনাথ মনপ্রাণ সমর্পণ করিলেন।

"আমরা টাকা তৈয়ার করা ও নোট জালের চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু কোনটাতেই আশানুরূপ সাফল্য হয় নাই। আমরা ছাঁচ তৈয়ার করাইয়া, রূপা গলাইয়া ছাঁচের মুখ দিয়া তাহা ঢালিয়া দিয়াছি। টাকা ঠিকই হইয়াছে কিন্তু ছাঁচের মুখ খাঁজকাটা ঠিক হইত না।"

"নোটের কাগজ খস্‌খসে করার জন্য অ্যাসিডে ভিজাইয়া পার্চমেণ্ট করিয়া সেই কাগজ ব্লকে ছাপান হইত। জলছাপ ঠিক হইত না। এক সপ্তাহের মধ্যেই দাগ পড়িয়া যাইত। জলছাপ বিকৃত হইয়া উঠিত এবং লাল্‌চে রঙ ধরিয়া যাইত।"

শ্রীযুক্ত নলিনীকিশোর গুহের "বাঙলায় বিপ্লববাদ" গ্রন্থে ইহার বিবরণ পাই।

"১৯১০ খ্রীষ্টাব্দ হইতেই জাল নোট তৈয়ারী ও উহার প্রচলন-প্রয়াস চলে। সেই চেষ্টা এক আধ বার নহে—জানা ঘটনা হইতে বলিতে পারি—বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্থানে কমপক্ষে চারবার সেই চেষ্টা হয়। কিছুটা সাফল্যও ঘটে। শেষ বারের চেষ্টা (প্রবোধ দাশগুপ্ত—সোনারগাঁয়) অনেকটা সফল হইয়াছিল। দশ পনর হাজার টাকা বোধহয় চলিয়াছিল—শেষে ধরা পড়িয়া যায়।"

কিছু দিন পরে এই জালনোট তৈয়ারীর কেন্দ্র ঢাকা হইতে ময়মনসিংহ সহরে একটি ভাড়া বাড়ীতে স্থানান্তরিত হয়। এইখানে ত্রৈলোক্যনাথ ও প্রবোধ দাশগুপ্ত উভয়েই থাকিতেন।

সহকারী হিসাবে থাকিত কলেজে অধ্যয়নরত কয়েকজন বিশ্বাসী সভ্য। কোন ঠাকুর চাকর রাখা হইত না—তাই সভ্যদেরই সকল গৃহকর্ম্ম সম্পাদন করিতে হইত।

"আমরা দ্বিপ্রহরে নোট তৈয়ার করিতাম—দিনের বেলায় বাহির হইতাম না।"

এই সময় ত্রৈলোক্যনাথের নামে তিন আইনের পরোয়ানা বাহির হইয়াছে। পুলিশ চারিধারে তাঁহার অনুসন্ধানে ব্যস্ত অথচ আত্মগোপন করিয়া ত্রৈলোক্যনাথ একস্থানে স্থির হইয়া বসিয়া নাই। ঢাকা, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহ, কলিকাতা প্রভৃতি বিভিন্ন স্থানে সমিতির সংগঠনে ও স্বার্থে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। যাতায়াতের পথে গুপ্তচরদের সহিত তাঁহার নিয়তই সাক্ষাৎ হয়। তিনি তাহাদের চিনিতে পারেন কিন্তু গুপ্তচরেরা ত্রৈলোক্যনাথকে সনাক্ত করিতে সক্ষম হয় না। সতর্ক ত্রৈলোক্যনাথ নির্বিঘ্নে চলিয়া যান আর মনে মনে হাসেন।

একদিন সন্ধ্যার পর ত্রৈলোক্যনাথ বাহির হইয়া কলেজের ছাত্র ননী চৌধুরীর বাসায় উপস্থিত। আলাপ আলোচনায় রাত্রি এগারটা বাজিয়া গেল। বাসায় না ফিরিয়া ত্রৈলোক্যনাথ রাত্রিটা বিনয়ের বাসাতেই কাটাইতে মনস্থ করিলেন।

সেদিন ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসের শেষপাদ। গোপনসূত্রে সংবাদ পাইয়া আগ্নেয়াস্ত্রের সন্ধানে পুলিশ শেষরাত্রে ননীদের বাড়ী ঘিরিয়া ফেলিল। দরজায় ধাক্কা পড়িতে ননী দরজা খুলিয়া দিতে পুলিশের নজরে পড়িল গৃহাভ্যন্তরে আর এক ব্যক্তি উপস্থিত।

ত্রৈলোক্যনাথকে দেখাইয়া পুলিশ প্রশ্ন করে—'ইনি কে?' ননীর সাথে সাথে জবাব—"আমার কাকা, বাড়ী হইতে আসিয়াছেন।" ত্রৈলোক্যনাথ বিব্রত হইয়া পড়েন, ননীর কাকা এই গৃহেই বাস করেন, তিনি সরকারী স্কুলের একজন শিক্ষক।

তিনি ত্রৈলোক্যনাথকে কখনও দেখেন নাই। তাঁহাকে প্রশ্ন করিলে মিথ্যা প্রকাশিত হইবে এবং ত্রৈলোক্যনাথের গ্রেপ্তার অনিবার্য্য। তাই ত্রৈলোক্যনাথ পলাইবার চেষ্টা করেন।

দারোগা জিজ্ঞাসা করেন—'কোথায় যান?'

'মুখ ধুইতে' বলিয়া ত্রৈলোক্যনাথ দৌড়াইতে থাকেন। কয়েক-জন পুলিশ পশ্চাতে ছুটিল। ত্রৈলোক্যনাথ বিভিন্ন রাস্তা দিয়া ছুটিতেছেন, অচিরে পুলিশ নিশানা হারাইয়া ফেলে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ সম্মুখ হইতে আর একদল পুলিশ ঠিক সেই সময়ে আসিয়া উপস্থিত। তাহারা ত্রৈলোক্যনাথকে আনিয়া ঐ বাড়ীতে হাজির করিল। ননীর কাকা স্পষ্ট করিয়া পুলিশকে জানাইয়া দিলেন তিনি আগন্তুককে জানেন না। বারবার পুলিশ নাম জিজ্ঞাসা করে, ত্রৈলোক্যনাথ কিন্তু নীরব। থানায় আনিবার পর গোয়েন্দাদের ডাক পড়িল। পুলিশের বিশ্বাস কোন এক পলাতক বিপ্লবী। কিন্তু বিপ্লবীটি যে কে তাহা পুলিশ ধরিতে পারিতেছে না। অবশেষে পরিচয় প্রকাশ হইয়া পড়িলে ত্রৈলোক্যনাথকে অচিরে কলিকাতায় স্থানান্তরিত করা হইল।

এইবার কোন ধারায় অভিযুক্ত হইয়া ত্রৈলোক্যনাথকে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়াইতে হইল না। আর কয়েদীরূপে নয়, অতিথিরূপে অর্থাৎ রাজবন্দী হইয়া এইবার তিনি আলীপুর আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আগে আসিয়াছিলেন কারাদণ্ড ভোগ করিতে, এবার আসিলেন কারারুদ্ধ থাকিতে।

"এখন আর জেলার সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের অফিসে গেলে পূর্ব্বের মত দাঁড়াইয়া থাকিতে হয় না—বসার জন্য চেয়ার পাই।"

ত্রৈলোক্যনাথের ভ্রাতুষ্পুত্র দরখাস্ত করিলেন—আমি আমার কাকার সঙ্গে দেখা করিতে চাই; প্রার্থনা মঞ্জুর হইল, কিন্তু গোয়েন্দা বিভাগের উর্দ্ধতন কর্ম্মচারী জানাইয়া দিলেন, শুধু দেখা করা চলিবে,

কোন কথা কওয়া চলিবে না। কারণ?—ত্রৈলোক্যনাথ প্রশ্ন করেন। তাহার উত্তর—দরখাস্তে শুধু 'To see' দেখা করার কথা লেখা আছে, কথা বলার কোন উল্লেখ নাই। ত্রৈলোক্যনাথ দেখা না করিয়া রাগত ভাবে চলিয়া গেলেও মনে মনে পুলিশের আদেশের ভাষ্য করিবার নিপুণতায় না হাসিয়া পারিলেন না।

ইংরাজ সরকার ত্রৈলোক্যনাথকে বাঙলার মাটিতে রাখিতে সাহস পাইলেন না। ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে সুদূর ব্রহ্মের মান্দালয় কারাগারে পাঠাইবার বন্দোবস্ত হইল।

সেদিন ব্রহ্ম যাত্রায় সহযাত্রী হইলেন সুভাষচন্দ্র, সত্যেন্দ্র মিত্র, সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ ও মদনমোহন ভৌমিক। সঙ্গে চলিয়াছেন স্বয়ং ল্যোমান্।

যেদিন আন্দামান গিয়াছিলেন সেদিনের পরিস্থিতি ও পরিবেশ আর আজিকার পরিস্থিতি ও পরিবেশে বহু পার্থক্য। আজ হাতে হাত কড়ি নাই, সারি বাঁধিয়া চলিতে হয় না। ডেকে অবাধ ভ্রমণ করেন, আলাপ আলোচনা চলে। পশ্চাতে সঙ্গীনধারী প্রহরী নাই। চিড়া গুড়ের সাহায্যে উদর পূর্ত্তি করিতে হয় না। প্রয়োজন মত রুচি সম্মত আহার পাওয়া যায়। উপরন্তু প্রকৃতিও সদয়। সমুদ্র উত্তাল তরঙ্গ বিক্ষুব্ধ নয়, প্রশান্ত। তিন দিনের যাত্রাপথ আনন্দে অতিবাহিত হইল। প্রতিদিনের সূর্য্যোদয় ও সূর্য্যাস্তের বর্ণচ্ছটা ত্রৈলোক্যনাথের চিত্তকে শ্রদ্ধাবনত ও বিমুগ্ধ করিয়া তুলে। পূর্ব্ব দিগন্তে সমুদ্র-সঞ্জাত বাল-সূর্য্যের রক্ত-বিন্যাস ত্রৈলোক্যনাথকে আগামী দিনের ইঙ্গিত দেয়, পশ্চিমের অস্তগামী সূর্য্যালোকে পশ্চিমাধিপত্যের অবসানের আভাস পান। স্বাধীনতার স্বপ্ন-দর্শক ত্রৈলোক্যনাথ অনাগত কালকে প্রণাম করেন।



রেঙ্গুন হইতে রাজকীয় অতিথিদের মান্দালয় বন্দীশালায় আনা হইল। প্রাক্তন ব্রহ্মরাজ থিবোর প্রাসাদ-সংলগ্ন মান্দালয় দুর্গের অভ্যন্তরে মান্দালয় কারাগার। সুভাষচন্দ্র অভিলাষ জানাইলেন ত্রৈলোক্যনাথ তাঁহার কক্ষে তাঁহার পার্শ্ববর্ত্তী স্থানেই থাকিবেন। কারা কর্তৃপক্ষ সেই ইচ্ছা পূর্ণ করিল। সুভাষচন্দ্র ও ত্রৈলোক্যনাথ পাশাপাশি অবস্থান করিতে থাকিলেন। আটাশ বৎসরের তরুণ সুভাষচন্দ্রকে ত্রৈলোক্যনাথ চিনিতে পারিয়াছিলেন। তাই তিনি লিখিতেছেন—

"সুভাষবাবুর জন্ম বড় ঘরে, শৈশব হইতে তিনি সুখে লালিত পালিত হইয়াছেন। কিন্তু দেশের জন্য দুঃখ কষ্ট বরণ করিতে তিনি কাহারও অপেক্ষা পশ্চাৎপদ ছিলেন না। তিনি অম্লান বদনে সকল কষ্ট সহ্য করিয়াছেন। তিনি সকল অবস্থাতেই সন্তুষ্ট থাকিতেন। খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারে কোন আপত্তি নাই তাঁহার— যাহা পান তাহাই খান। চাকরবাকরদের উপরও তাঁহার ব্যবহার খুব সদয়—কখনও কটু কথা বলেন না। কাহারও অসুখ হইলে তিনি নিজে সারারাত্রি জাগিয়া সেবা করিতেন।"

খেলাধুলা, হৈ চৈ ও আমোদ প্রমোদে কারাগারের মধ্যে দিনগুলি নিশ্চিন্তে কাটিতে লাগিল। একদিন টেনিস খেলার সময় ত্রৈলোক্যনাথ পড়িয়া যান ও হাঁটুর চামড়া উঠিয়া ক্ষত হয়। সুভাষচন্দ্র পরম যত্নসহকারে প্রত্যহ আপন হাতে সেই ক্ষত নিম পাতা ও গরম জলে ধুইয়া দিতেন। সেবাতেই সুভাষ চন্দ্রের প্রীতি।

"কয়েদীরা খালাসের সময় সুভাষ চন্দ্রের কাছে কাপড় জামা চাহিত, তিনি কাহাকেও না বলিতে পারিতেন না।

সুভাষবাবুর মত লোককে জেলখানায় সঙ্গী হিসাবে পাওয়া খুবই সৌভাগ্যের বিষয়।"

বহু বন্ধুর পথের অমারাত্রির অভিযাত্রী ত্রৈলোক্যনাথ সাগ্নিক ব্রাহ্মণের ন্যায় বিপ্লবের আগুণ সর্ব্বযত্নে ও সর্ব্বঅবস্থায় বহন করিয়াছেন ও করিতেছেন। বহু অত্যাচার ভোগ ও বহু বাধা অতিক্রম করিয়া তিনি স্থিতধী মহীরুহ সন্নিভ প্রশান্তিতে প্রকাশিত।

নিবেদিত জীবনের পূর্ণ পাত্র হাতে ধরিয়া জাগ্রত সুভাষচন্দ্র অনায়াসলব্ধ প্রাত্যহিক ভোগৈশ্বর্য্য পরিত্যাগ করিয়া সেই পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর পন্থার অভিযাত্রী রূপে স্বেচ্ছায় নিজেকে দান করিয়াছেন ; আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন শৃঙ্খলিতা দেশ-মাতৃকার শৃঙ্খল মোচনের দুর্ব্বার আগ্রহে, দুর্নিবার চেতনায়। মহাসাগরের আহ্বান তাঁহাকে সেই সাগর-সঙ্গমে লইয়া আসিয়াছে। দুই জন দুই জনের সান্নিধ্য লাভ করিলেন। সমভাবাপন্ন তাই অচিরে সুহৃদ্ হইলেন। কত কথা, কত স্বপ্ন, কত বেদনা তাঁহাদের মানসলোকে আবর্ত্তিত হয়। বাস্তব রূপরেখার মননে সময় কাটে। স্বপ্ন ও সাধনা দুইটি জীবনকে আত্মস্থ করিয়া রাখে। মান্দালয় কারাগারে বসিয়া সুভাষচন্দ্র একান্তে ত্রৈলোক্যনাথের মুখে বাংলার বিদ্রোহী তারুণ্যের রোমাঞ্চকর প্রদীপ্ত কাহিনী শুনিয়া চলেন।

দূর্গা পূজা আসন্ন। বন্দীরা স্থির করিলেন, পূজা করিবেন। অর্থ চাহিয়া দরখাস্ত দেওয়া হইল। মঞ্জুরী আসিল না। বন্দীরা অনশন সত্যাগ্রহ করিতে মনস্থ করিলেন। সবাই পরম উৎসাহে অনশনে ব্রতী হইলেন। চৌদ্দ দিন অনশনের পর সরকার অর্থ মঞ্জুর করিলেন।

ইংরাজ সরকার ত্রৈলোক্যনাথকে মান্দালয় কারাগার হইতে সরাইয়া লইলেন। ইনসিন জেলে তাঁহাকে স্থানান্তরিত করা হইল। কিছুকালের মধ্যে ত্রৈলোক্যনাথ আবার মান্দালয় জেলে ফিরিয়া আসিলেন—আপন প্রয়োজনেই ব্রিটিশ সরকার তাঁহাকে

ফিরাইয়া আনিলেন। ল্যোমান সাহেবের আগমন উপলক্ষ্য করিয়া এই স্থানান্তর। ল্যোমান সাহেব বিপ্লবীদের মানসিকতার স্বরূপ নিরূপণ করিতে মান্দালয় কারাগারে আসিয়াছেন। তৎকালীন বিপ্লবী ভাবধারায় গতি প্রকৃতির সম্যক্ অনুধাবন করাই এই পরিভ্রমণের লক্ষ্য। ত্রৈলোক্যনাথের সহিত ল্যোমান আলাপে বসিলেন।

ত্রৈলোক্যনাথের প্রথম প্রশ্ন—"কোন্ অভিযোগে আমাকে আটক রাখা হইয়াছে ? আমার বিরুদ্ধে কীসের অভিযোগ ?"

ল্যোমান জবাব দেন—"আপনারা হিংসাত্মক কার্য করিতে না পারেন তাহার জন্যই আপনাদের আটক করিয়া রাখা হইয়াছে।" স্থির গম্ভীর ত্রৈলোক্যনাথ জানাইলেন, "বন্ধুরা বা আমি কেহই হিংসাত্মক কার্য্য করি নাই।"

ল্যোমান বলেন—"আমি বিবরণ পাইয়াছি আপনারা পরামর্শ আরম্ভ করিয়াছিলেন।"

ত্রৈলোক্যনাথ শ্লেষ মিশ্রিত স্বরে বলিলেন—"হিংসাত্মক কার্য্য-কলাপ এমন কোন কঠিন কাজ নয় যার জন্য পরামর্শ করতে হবে। আপনি কি মনে করেন আমরা ইচ্ছা করলে দু'চার দশটা ডাকাতি বা খুন কর্‌তে পারতাম না ?"

ল্যোমান জানান—"আপনাদের অতীত ইতিহাস যাহা তাহাতে আপনারা ইচ্ছা করিলে অনায়াসেই তাহা করিতে পারিতেন। পাছে তাহাই করেন—তাই আপনাদের সাবধান পরবশ আটক করিয়া রাখা হইয়াছে।"

যুবকদের মধ্যে যে হিংসাশ্রয়ী মনোভাবের উদ্ভব হইয়াছে তাহা নিরসনের উপায় সম্বন্ধে ল্যোমান সাহেব ত্রৈলোক্যনাথের মতামত জানিতে চাহিলেন।

ত্রৈলোক্যনাথ জানাইয়া দেন—"এ মনোভাব মোটেই হিংসাশ্রয়ী

নহে—ইহা শৃঙ্খলিত জননীকে মুক্ত করার অত্যুগ্র বাসনা। ইহার একমাত্র নিবৃত্তি দেশের স্বাধীনতায়। ইংরাজ ভারতবর্ষ ত্যাগ করিয়া যাক, দেশ শান্ত হইবে।”

ল্যোমান সগর্ব্বে কটাক্ষ করেন—“আমরা যদি ভারতবর্ষ ছাড়িয়া চলিয়া যাই—তবে কি দেশ রক্ষা করিতে পারিবেন? নিজেরা মারমারি কাটাকাটি করিয়া ধ্বংস হইবেন।” তাহার পর ইংরাজ ভারতবর্ষের কি কি উপকার করিয়াছে, ইংরাজ-রাজত্বে ভারতবর্ষ অন্ধকার হইতে কতখানি আলোকের পথে আসিয়াছে এবং কিরূপ ভাবে “হাঁটি হাঁটি-পা-পা” করিয়া ভারতবর্ষকে স্বাধীনতার দ্বার প্রান্তে হাত ধরিয়া আগাইয়া আনার নিরন্তর প্রয়াস চলিতেছে তাহার সুদীর্ঘ তালিকা পেশ করিতে থাকেন। মন্টেগু চেমস্‌ফোর্ডের সেই বহু বিতর্কিত ‘Progressive realisation of responsible Government’-এর ধ্বনি একনিষ্ঠ ইংরাজ রাজকর্ম্মচারীর বয়ানে প্রতিধ্বনিত হইতে থাকে।

ল্যোমান সাহেব কী বুঝিলেন তিনিই জানেন; তিনি চলিয়া গেলেন। কয়েক মাস পরে ইন্‌স্‌পেক্টর নরেশচন্দ্র দত্ত সর্ত্ত লইয়া উপস্থিত। তাঁহার বক্তব্য এই সর্ত্তগুলি মানিবার প্রতিশ্রুতি দিলে সরকার তাঁহাদের মুক্তি দিবার কথা বিবেচনা করিবেন।

ত্রৈলোক্যনাথ প্রতিসর্ত্ত আরোপ করেন।

(১) বিনা বিচারে আটক রাখিবার জন্য সরকারকে ক্ষমা প্রার্থনা করিতে হইবে।

(২) অবৈধ ভাবে আটক করিবার জন্য ক্ষতি পুরণ দিতে হইবে।

(৩) সরকারকে প্রতিশ্রুতি দিতে হইবে ভবিষ্যতে এইরূপ ভাবে আর কখনও বিরক্ত করা হইবে না।

বিভ্রান্ত দারোগা সাহেব ফিরিয়া গেলেন।

ত্রৈলোক্যনাথকে এইবার মিন্‌জান জেলে পাঠান হইল। সেখানেও সরকার স্বস্তি বোধ করিতে পারিলেন না কারণ ব্রহ্ম দেশের বিখ্যাত দস্যু নেতা সাম্‌ফের সঙ্গে সেখানে ত্রৈলোক্যনাথের হৃদ্যতা জন্মে এবং গোপনে ত্রৈলোক্যনাথ তাহার সহিত প্রায়ই আলাপ আলোচনা করিতেন। ইতিমধ্যে ত্রৈলোক্যনাথ ব্রহ্ম ভাষা শিখিয়াছেন, তাই দস্যুদলপতির মাতৃ-ভাষাতেই তাঁহার আলাপ চলে, প্রকাশের কোন বাধা হয় না। সরকার বাহাদুর ত্রৈলোক্যনাথকে আবার স্থানান্তরিত করিয়া ইন্‌সিন জেলে লইয়া আসিলেন।

অবশেষে ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে ত্রৈলোক্যনাথ ব্রহ্মদেশের জেল হইতে কলিকাতার কারাগারে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

ইংরাজ সরকার বুঝিতে পারিল ত্রৈলোক্যনাথকে কারা প্রাচীরের মধ্যে রাখাও নিরাপদ নহে। অগ্নিগর্ভ বিদ্রোহী আশে পাশের মানুষকে অগ্নিশুদ্ধ করিয়া তোলেন। এইবার স্থির হইল, দুর্গম গ্রাম-প্রান্তে গৃহ-বন্দী করিয়া রাখিতে হইবে। তাই কলিকাতা হইতে তাঁহাকে আনা হইল নোয়াখালী জেলায় হাতিয়া দ্বীপান্তর্গত কোন এক অখ্যাত গ্রামের এক সাধারণ গৃহে। জল কাদার দেশ তাহার উপর বর্ষাকাল। পথ বলিয়া কিছুই নাই। চারিদিকে জল আর কাদা। সেই দুর্গম কর্দ্দমাক্ত পথ ভাঙিয়া থানায় হাজিরা দিতে হয়। আহারাদির জন্য মাসিক ভাতাও অতি সামান্য। প্রায়ই অর্দ্ধাশনে দিন কাটাইতে হয়।

ত্রৈলোক্যনাথ এই সকল অসুবিধা জানাইয়া সরকারের নিকট দরখাস্ত করিলেন কিন্তু কোন উত্তর আসে না।

ত্রৈলোক্যনাথ ক্ষান্ত হইবার পাত্র নহেন, আবার দরখাস্ত করেন। এইবার জানাইয়া দিলেন—'আমাকে যদি রাখিতে হয় উপযুক্ত ব্যবস্থা করিতে হইবে নতুবা আমাকে আটক রাখিতে

পারিবে না এবং আমিও গভর্ণমেণ্টের আদেশ পালন করিতে বাধ্য থাকিব না। আমার যদি কষ্ট করিয়াই থাকিতে হয় তবে আমি অন্তরীণে আবদ্ধ থাকিয়া কষ্ট ভোগ করিব না, অন্য ভাবে কষ্ট ভোগ করিব। আপনারা হয়ত জেলের ভয় দেখাইবেন কিন্তু আমার সে ভয় নাই।”

ইহার পর আসিলেন ইন্‌স্‌পেক্টর প্রভাত বিশ্বাস—ইনিই একদিন ঢাকা হইতে আদিষ্ট হইয়া কলিকাতায় আসিয়াছিলেন গঙ্গাস্নানরত ত্রৈলোক্যনাথকে সনাক্ত করিয়া গ্রেপ্তারে সাহায্য করিতে।

তিনি ত্রৈলোক্যনাথকে ধৈর্য্য ধরিতে অনুরোধ জানাইয়া চলিয়া গেলেন। এইবার সরকার হইতে উত্তর আসিল।

ত্রৈলোক্যনাথকে আর থানায় হাজিরা দিবার প্রয়োজন হইবে না ও মাসিক ভাতা ৬০৲ টাকা বরাদ্দ করা হইল।

ইহার কিছুদিন পরে ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দের শেষ ভাগে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের কলিকাতা অধিবেশনের প্রাক্কালে ত্রৈলোক্যনাথ মুক্তি পাইলেন।

কলিকাতায় কংগ্রেস অধিবেশন বাঙলা দেশে আবার নূতন প্রেরণা ও উদ্দীপনার সঞ্চার করিল।



অন্তরীণমুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ হাতিয়া হইতে চট্টগ্রামে আসিলেন। কংগ্রেসের ঐতিহাসিক অধিবেশন আসন্ন। পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু সেই অধিবেশনের সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ও সুভাষচন্দ্র মান্দালয় জেল হইতে মুক্ত হইয়া স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর সর্ব্বাধিনায়কের দায়িত্ব ভার গ্রহণ করিয়াছেন। চিরক্ষত্রিয় সুভাষচন্দ্র স্থির করিলেন বাঙ্‌লার তারুণ্যকে সৈনিকের নিষ্ঠা, সংযম ও শৃঙ্খলায় উদ্বুদ্ধ করিতে হইবে। নন্‌-ম্যার্শাল বা অসামরিক 'বে-লড়িয়ে' জাতি বলিয়া ইংরাজ বাঙালীকে যে চির-লাঞ্ছনার কলঙ্ক তিলক ললাটে সাঁটিয়া দিয়াছে তাহা তাচ্ছিল্যের নয়, ভয় করিয়া ; বাঙালী যখন মরে তখন হিসাব করিয়া মরে না। হাসিমুখে মরিতে পারে বলিয়াই হাসিমুখে মারিতে পারে। স্বভাব-কোমল, নির্ব্বিকার, শান্তি-প্রিয়, ঘর-পিয়াসী বাঙালী যখন রুদ্র হয় তখন মহাকালের হিসাবে গরমিল লাগিয়া যায়।

রবীন্দ্র-ভাষায় তখন বাঙলার মরণ-পাগল যৌবন ঘোষণা করে—

"যৌবরাজ্যে বসিয়ে দেমা, লক্ষ্মীছাড়ার সিংহাসনে।
ভাঙা কুলোয় করুক পাখা তোমার যত ভৃত্যগণে।
দগ্ধভালে প্রলয়শিখা দিক্ মা এঁকে তোমার টীকা,
পরাও সজ্জা লজ্জাহারা—জীর্ণকন্থা, ছিন্নবাস।
হাস্যমুখে অদৃষ্টেরে করব মোরা পরিহাস॥"

সেই অনুপ্রেরণা সেই উন্মাদনাকে সর্ব্বাধিনায়ক অশ্বারূঢ় সুভাষচন্দ্র সৈনিক-শৃঙ্খলায় সুগঠিত করিতে বিপ্লবী সংস্থার সাহায্য লইলেন। তদানীন্তন সবকটী বিপ্লবী সংস্থাই সুভাষচন্দ্রের আহ্বানে আগাইয়া আসিল। অনুশীলন, যুগান্তর, বি. ভি. সকলদলের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা ও কর্ম্মীরা এই স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীকে সুসংহত করিয়া তুলিলেন। তাই সেইদিন সুভাষচন্দ্রের

সহযোগী হিসাবে আমরা দেখিলাম রবীন্দ্রমোহন সেন, পূর্ণচন্দ্র দাস, সত্যগুপ্ত, যতীনদাস প্রভৃতি আরও অনেক নামী ও আনামী বিপ্লবী নেতা ও কর্ম্মীকে। সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে সাগ্নিক বিপ্লবীরা আবার কংগ্রেসের সান্নিধ্যে আসিলেন।

যতীন্দ্রমোহন অর্থসংগ্রহে ও অভ্যর্থনা সমিতির সভ্য সংগ্রহে চট্টগ্রামে দূর হইতে দূরান্তরে ঘুরিতেছেন। ত্রৈলোক্যনাথও তাঁহার সহযোগী ও সহচর হইয়া সকল কার্য্যে সাহায্য করিতে লাগিলেন। ত্রৈলোক্যনাথ লিখিতেছেন—"তিনি স্থানীয় বড় বড় হিন্দু ও মুসলমান ব্যবসায়ী, উকীল, মোক্তার, জমিদার প্রভৃতি অনেককেই অভ্যর্থনা সমিতির সভ্য করিলেন। তিনি ছিলেন খুব অমায়িক। চট্টগ্রামে দেখিলাম তাঁহার অসাধারণ প্রতিপত্তি। হিন্দু, মুসলমান সকলেই তাঁহাকে ভক্তি করে। সেনগুপ্তের বাসায় তখন কংগ্রেস কর্ম্মী ও আমরা প্রায় ত্রিশ পয়ত্রিশ জন প্রত্যহ নিমন্ত্রণ খাইতাম—খাওয়ার ব্যবস্থাও থাকিত প্রচুর।"

বিপ্লবীরা জানিতেন অভিনন্দন তাঁহাদের জন্য নয়—বন্দুকের গুলি, সঙ্গীনের খোঁচা ও ফাঁসির দড়ি তাঁহাদের কর্ম্মের স্বীকৃতি। রাজশক্তি সন্ত্রাসবাদী বলিয়া ঘৃণা জাগায়, দেশের উঁচু তলার মানুষ বিপথগামী বলিয়া নাসিকা কুঞ্চন করে আর অপহৃত অবনত জনতার দল মনে মনে ভাল বাসিলেও ভয়ে ও ভাবনায় ছায়া দেখিলেও সরিয়া যায়। তাই যেদিন ত্রৈলোক্যনাথ শুনিলেন চট্টগ্রামে বিপ্লবীদের মানপত্র দেওয়া হইবে এবং সেই সম্বর্দ্ধনা সভার সভাপতি কংগ্রেসের উচ্চকোটির নেতা স্বয়ং যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত তখন তাঁহাদের কর্ম্মের স্বীকৃতিতে ত্রৈলোক্যনাথের মনে জাগিল অনাস্বাদিত এক পরমহর্ষ, হৃদয়ে প্রশান্ত তৃপ্তি আসিলেও কুণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন। তাঁহাদের বন্ধুর যাত্রায় অভিশাপই নিত্যসাথী, অভিনন্দন স্বপ্ন হইতেও অলীক। "আমার অবস্থা নববধূর শুভ পরিনয়ের সময় যেমন হয়,

মনে মনে আনন্দ কিন্তু লজ্জায় আনত বদন ঠিক সেই রকম্ হইয়াছিল।" কংগ্রেসের সর্ব্বভারতীয় নেতা ও অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি স্বয়ং যতীন্দ্রমোহন সভাপতিরূপে মান পত্র দিলেন। অন্যদিকে সুভাষচন্দ্রের অধিনায়কত্বে নেতৃবৃন্দ স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীতে নেতৃত্ব দিতেছেন। বাঙলার মানসে আবার নবচেতনা, নব অনুপ্রেরণা, নব উন্মাদনা।

চট্টগ্রাম জেলার অন্তর্গত নীলাপাহাড়ে বন্ধু মোহিনী ভট্টাচার্য্যের কৃষি-খামার। সেথায় যাইবার মনস্থ করিয়া ত্রৈলোক্যনাথ বন্ধুকে চিঠি দেন। চট্টগ্রাম হইতে নীলা ষ্টেশনে পৌঁছিয়া ত্রৈলোক্যনাথ দেখিলেন বন্ধু উপস্থিত নাই, হয়ত বা পত্র পান নাই। কি করেন ? এখান হইতে দশ-বার মাইলের পথ। সাত-আট মাইল নৌকায় ও বাকী অংশ পদব্রজে যাইতে হইবে। ত্রৈলোক্যনাথ চিন্তিত হইয়া পড়েন। এমন সময় দুইজন ভদ্রলোক তাহাদের নৌকায় আসিতে আহ্বান জানাইলেন। তাঁহারাও একই পথের যাত্রী—তাঁহাদের খামারবাড়ী মোহিনীবাবুর খামারবাড়ী হইতে মাত্র মাইল দুই দূরে অবস্থিত। ত্রৈলোক্যনাথ পরিচয়সূত্রে জানিতে পারিলেন, একজন দারোগা-পুত্র ও অপরজন দারোগা-ভ্রাতুষ্পুত্র। তাঁহাদের খামার বাড়ীতে পৌঁছিয়া ত্রৈলোক্যনাথ তাঁহাদের বাসায় আহারাদি সারিলেন ও পায়ে হাঁটিয়া রওনা দিলেন। সৌজন্যবশতঃ ভ্রাতৃদ্বয় সঙ্গে চলিলেন। মাঝপথে বনবিভাগের কার্যালয়। বনবিভাগের কর্তাবাবু তাঁহাদের ডাকিয়া নিজের বাংলোয় বসাইলেন। মোহিনীবাবুর বাসায় যাইতেছেন জানিয়া ফরেষ্টার ত্রৈলোক্যনাথকে বলিলেন "মোহিনীবাবু একসময় স্বদেশী দলে ছিলেন, বহু বৎসর জেল খাটিয়াছেন তবে এখন ওসব ছাড়িয়া দিয়াছেন ও বেশ অর্থ উপার্জ্জন করিতেছেন।"

তিনি আরও জানান, তাঁহার দাদা আদিত্য দত্ত স্বদেশী দলের

একজন পাণ্ডা ছিলেন ও বহু বৎসর তাঁহাকে কারাগারেও থাকিতে হইয়াছিল কিন্তু এখন আর স্বদেশীর নামও করেন না।

কথায় কথা বাড়ে। তিনি বলিয়া চলেন—"ত্রৈলোক্য চক্রবর্ত্তী নামে একজন খুব বড় স্বদেশী ছিল। আমার দাদার খুব বন্ধু। অনেকবার তাঁকে দাদার সঙ্গে দেখেছি এবং আমাকেও খুব স্নেহ করতেন।"

ত্রৈলোক্যনাথ মনে মনে হাসেন, প্রশ্ন করেন—"এখন ত্রৈলোক্য চক্রবর্ত্তী কি করে?" বনবিভাগের কর্ম্মচারী বিজ্ঞের মতন জবাব দেন, 'তাঁহারও এখন দাদার অবস্থা—স্বদেশী ছেড়েছেন।"

দারোগা-পুত্রও এই প্রসঙ্গে নিজের অভিজ্ঞতা জানায়—যে থানায় তাহার বাবা দারোগা ছিলেন সেই থানায় সে সময় অনেক রাজবন্দী ছিল। কিন্তু এখন সকলেই ঘর লইয়াছে।

চুপ করিয়া ত্রৈলোক্যনাথ সকলের কথা শোনেন আর বুঝিতে পারেন ইহাদের বক্তব্যের উপপাদ্য বাঙালী হুজুগপ্রিয় জাতি, তাই উত্তেজনার বুদ্বুদ অচিরেই মিলাইয়া যায়। ত্রৈলোক্যনাথ গন্তব্যস্থলে যাওয়ার জন্য উঠিতেছেন এমন সময় বনবিভাগের বাবুর খেয়াল হইল নিজেরাই কথা কহিয়াছেন, আগন্তুকের পরিচয় লওয়া হয় নাই।

তাই প্রশ্ন করেন—'আপনার বাড়ী কোথায়?'

ত্রৈলোক্যনাথ জানান—ময়মনসিংহ জেলায়।'

'আপনার নাম?'

"ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্ত্তী" হাসিতে হাসিতে ত্রৈলোক্যনাথ জবাব দিলেন। বনবিভাগের বাবু চেয়ার ছাড়িয়া লাফাইয়া উঠেন। দারোগা-পুত্র ও ভ্রাতুষ্পুত্র নির্ব্বাক; স্তম্ভিত; বিস্মৃত দৃষ্টিতে তাকাইয়া থাকিলেন।

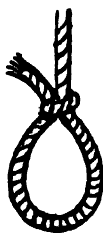
একটী ক্ষুদ্র পাহাড়ের উপর মোহিনী ভট্টাচার্য্যের বাসা।

অরণ্য সমাকীর্ণ এই পার্ব্বত্য পরিবেশ নয়নাভিরাম, জলবায়ু স্বাস্থ্যপ্রদ এবং আহার্য্য সুপ্রচুর ও সহজ লভ্য।

ত্রৈলোক্যনাথ সঙ্কল্প করিলেন, এই পরিবেশে একটী হাসপাতাল গড়িতে হইবে। বহু রাজনৈতিককর্ম্মী সুদীর্ঘ কারাবাসের পর ভগ্নস্বাস্থ্য লইয়া মুক্ত হয় কিন্তু তাহাদের চিকিৎসার কোন সুযোগ হয় না, উপায় থাকে না; তাহাদের বিশ্রামের কোন আস্তানা মিলে না।

প্রস্তাব শুনিয়া মোহিনী ভট্টাচার্য্য জমি দিতে সম্মত হইলেন। কুমিল্লার প্রসিদ্ধ দাতা মহেশ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নিকট ত্রৈলোক্যনাথ অর্থের আবেদন জানান। মহেশবাবু রাজী তবে একটী সর্ত্ত। এক বৎসর পর এমনই দিনে এমনই তারিখে এই স্থানে তিনি অর্থ দিবেন, হাসপাতালের নির্ম্মাণ ব্যয় বহন করিবেন। তাহার পূর্ব্বে এক বৎসর অপেক্ষা করিতে হইবে। ত্রৈলোক্যনাথের আগ্রহ যাচাই করিবার জন্যই হয়ত বা এই প্রস্তাব। কিন্তু দুর্ভাগ্য-বশতঃ বৎসর অতিক্রান্ত হইবার পূর্ব্বেই ত্রৈলোক্যনাথ আবার ধৃত হন এবং ভবিষ্যতেও তাঁহার সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভবপর হয় নাই।

তাই ত্রৈলোক্যনাথের বাসনা পূর্ণ হইল না। সঙ্কল্প বাস্তবরূপ গ্রহণ করিল না। অন্তরে অপূর্ণ কামনা রহিয়া গেল।



কলিকাতার কংগ্রেস অধিবেশন সমাপ্ত; জোয়ার স্তিমিত হইয়াছে। ত্রৈলোক্যনাথ কলিকাতাতেই আছেন।

মহাত্মা গান্ধী তখনও তাঁহার লবণ সত্যাগ্রহ সুরু করেন নাই। মহা সমুদ্রের মতই গান্ধীজী কখনও সবিকার কখনও নির্ব্বিকার। প্রভঞ্জন পরিচালিত উত্তাল তরঙ্গ কখনও সমুদ্রসৈকত গ্রাস করিবার জন্য তটভূমে আছড়াইয়া পড়িতেছে, মনে হয় তটভূমি বুঝিবা সমুদ্র গর্ভে বিলীন হইয়া গেল। কিন্তু সময়ের সাথে সে বিক্ষুব্ধ জলরাশি পশ্চাতে ফিরিয়া যায়, সমুদ্র শান্ত হইয়া পড়ে। তবে সমুদ্র-গর্ভের কিছু রত্নরাজি সমুদ্র-সৈকতে পড়িয়া থাকে, অভিযাত্রীর দল তাহাই কুড়াইয়া ফেরে। কখনও বা বীচিবিভঙ্গহারা নিস্তব্ধ জলরাশি; ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গ সংঘাতে মৃদু কল্লোল। উষার রক্ত-সূর্য্যের রক্তিমাভায় সে নিজেকে রাঙায়, জবাকুসুমের বর্ণপরশে মনোরম দেখায়। অস্তসূর্য্যের বৈরাগী আলোকে গৈরিক রঙের উত্তরীয়ে আপনাকে সর্ব্বলোকের সম্বন্ধহীন এক রহস্যময় সত্তায় উপস্থাপিত করে।

সত্যাগ্রহ আন্দোলন বেশ কিছুদিন শেষ হইয়া গিয়াছে। স্বায়ত্ত শাসন দাবীর প্রস্তাব যথারীতি কলিকাতা কংগ্রেস অধিবেশনে উত্থাপিত ও গৃহীত হইয়াছে। ভারত সাম্রাজ্যে স্বায়ত্তশাসন প্রবর্ত্তিত না হইলেও কলিকাতা পৌরসভায় বেশ কয়েক বৎসর স্বায়ত্তশাসন মিলিয়াছে। দেশবন্ধু প্রথম নগরপতি রূপে ও সুভাষচন্দ্র প্রথম অধিকর্ত্তা রূপে কয়েক বৎসর পূর্ব্বেই দায়িত্বভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। আজও কলিকাতা পৌরসভার পরিচালনা-ভার জাতীয় নেতৃবৃন্দের অধীনে। সেখানে বিদেশী শাসকের অধিকার নাই। কলিকাতাবাসীর ইচ্ছানুসারে নির্ব্বাচিত স্বদেশ-বাসীর দ্বারাই পৌরসভা পরিচালিত হইতেছে। পৌরসভার কর্ম্মচারীর দেহে খদ্দরের খাকী উর্দি ও পৌরসভার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আমাদেরই অভীষ্ট শিক্ষা প্রণালী নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

ত্রৈলোক্যনাথ আলীপুর কারাগারে লেখা তাঁহার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের উপযোগী পাণ্ডুলিপিগুলি সঙ্গে লইয়া ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম দিকে একদিন সুভাষচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া অনুরোধ জানাইলেন যদি পুস্তকগুলি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠ্যতালিকাভুক্ত করা যায় তবে জাতীয় চেতনায় বালকগণ উদ্বুদ্ধ হইবে ও সাথে সাথে ত্রৈলোক্যনাথেরও কিঞ্চিৎ আর্থিক সুবিধা হইবে।

ত্রৈলোক্যনাথ এযাবৎ বেশীর ভাগ সময় কারাগারে বা অন্তরীণাবদ্ধ অবস্থায় সরকার প্রদত্ত অন্ন গ্রহণ করিয়াছেন, নিজের জন্য কোন রোজগার করিবার সুযোগ পান নাই। তাই কারামুক্ত থাকাকালে তাহার বন্ধু বান্ধবেরাই তাঁহার ব্যয় ভার বহন করিয়া থাকেন। বাড়ীর সঙ্গেও ত্রৈলোক্যনাথের বিশেষ কোন সম্পর্ক নাই; তিনি কপর্দ্দকশূন্য রিক্ত পথিক, পরিক্রমাই তাঁহার ধর্ম্ম। থামিতে পারেন না, থামিয়া যাওয়া তাঁহার প্রকৃতি বিরুদ্ধ স্বভাব।

কেদারেশ্বর সেন মহাশয় বহুবাজারের একটী মেসে একটী পুরা ঘর লইয়া থাকেন। সেই ঘরই ত্রৈলোক্যনাথের ঠিকানা। বন্ধুই খাওয়া দাওয়ার খরচ জোগান। তাই কিছু আর্থিক সুবিধার আশায় সুভাষচন্দ্রকে অনুরোধ জানাইলেন। "আমার প্রস্তাব শুনিয়া সুভাষবাবু কর্পোরেশনের এডুকেশন অফিসারের নিকট একখানা ভাল সুপারিশ পত্র লিখিয়া দিয়া আমাকে তাঁহার বাসায় যাইয়া দেখা করিতে বলিলেন।"

নির্দ্দেশ মত ত্রৈলোক্যনাথ পরের দিন শিক্ষা-অধিকর্ত্তার সহিত সাক্ষাৎ করেন। সব কিছু শুনিয়া ও খাতাগুলি দেখিয়া তিনি সেগুলি রাখিয়া দিলেন ও পরে আর একদিন আসিয়া দেখা করিতে বলিলেন। সন্তুষ্ট-চিত্ত ত্রৈলোক্যনাথ চলিয়া যান।

"ইহার পর প্রায়ই তাহার বাসায় যাই, দুই তিন ঘণ্টা অপেক্ষার পর তিনি নীচে নামিয়া আসেন এবং আর একদিন আসিতে বলেন।"

ত্রৈলোক্যনাথ দিনের পর দিন উপস্থিত হ'ন—হাঁটিয়াই তাঁহাকে যাতায়াত করিতে হয়। ট্রাম বাসের চলার বিলাসিতা তিনি করেন না।

একদিন অফিসার জানাইলেন—"এক লোকের এতগুলি বই পাঠ্য তালিকাভুক্ত করিতে পারিব না। আমাদের কমিটি রাজী হইবে না এবং অন্যান্য গ্রন্থকারগণ হৈ চৈ করিবে। আমি দুই একখানা বই পাঠ্য তালিকাভুক্ত করিয়া দিব।"

আশুতোষ ত্রৈলোক্যনাথ আশ্বাসেই সন্তুষ্ট হইলেন। আর একদিন তিনি দু'একখানি বইয়ের দু'একটী জায়গায় পরিবর্ত্তন করিতে বলিলেন—ত্রৈলোক্যনাথ তাহাই করিয়া দিলেন।

ইহার পর ত্রৈলোক্যনাথ আবার একদিন ভদ্রলোকের গৃহে উপস্থিত হইলেন কিন্তু সেদিন সুদীর্ঘ অপেক্ষান্তেও তাঁহার সাক্ষাৎ মিলিল না, তিনি ব্যস্ত, দেখা করিতে অসমর্থ। বিরক্ত ত্রৈলোক্য-নাথ ফিরিয়া যান।

"আমি জানিতাম গ্রন্থকারদের বই পাঠ্যতালিকাভুক্ত করিতে বহু বেগ পাইতে হয়। কিন্তু আমার ধাত অন্য রকমের, দীর্ঘদিন পোষাইল না।"

তবু একদিন ত্রৈলোক্যনাথ আবার উপস্থিত হইলেন। সকাল সাতটা হইতে দশটা পর্য্যন্ত বসাইয়া রাখিবার পর তিনি উপর হইতে তাহার অফিসে গিয়া দেখা করিবার নির্দ্দেশ পাঠাইলেন। ক্ষুব্ধ ত্রৈলোক্যনাথ একটুক্‌রা কাগজে লিখিয়া পাঠাইলেন—"আমি বহুবাজার ষ্ট্রীট হইতে পায়ে হাঁটিয়া এতদূর রাস্তা আসিতে পারিলাম আর আপনি উপর হইতে নীচে নামিয়া আসিতে পারিলেন না। তিন ঘণ্টা আমাকে বসাইয়া রাখিলেন।" ত্রৈলোক্যনাথ পূর্ব্বেই সংবাদ পাইয়াছেন অফিসার সাহেব কোন কাজেই ব্যস্ত নহেন, গৃহ-সুখে নিমগ্ন আছেন। চিরকূট পাইয়া শিক্ষা অধিকর্ত্তা বীর

দর্পে নামিয়া আসিয়া ক্রুদ্ধ কণ্ঠে জানাইলেন। "কিছু হবে টবে না, ও কিছু হয় নাই, আপনি চলে যান।" খাতা ফেরৎ চাইলে অঁফিস হইতে লইবার নির্দ্দেশ দিলেন।

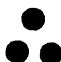
সাম্রাজ্যবাদী রাজশক্তির বিদেশী কর্ম্মচারী নন, আত্মনিয়ন্ত্রাধীন স্বায়ত্ত শাসিত, স্বাধীনতাকামী নেতৃবৃন্দ পরিচালিত কলিকাতা পৌরসভার দেশের ও দশের সেবায়-রত-প্রাণ দেশীয় কর্ম্মচারী। সেদিনের সহিত এ দিনের প্রভেদ শুধু রঙে—ঢং এক।

ত্রৈলোক্যনাথ ব্যথিত হন আর ভাবেন—"দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয়ের সহিত দেখা করিতে আমার কোন বেগ পাইতে হয় নাই। দেশপ্রিয় যতীন্দ্র মোহন সেনগুপ্ত, সুভাষ বাবুর সহিত দেখা করিতে এতক্ষণ বসিয়া থাকিতে হয় না আর একজন এডুকেশন অফিসারের সহিত দেখা করার জন্য এতক্ষণ বসিয়া থাকা অত্যন্ত অসহ্য ও অপমান কর।"

তিনি হয়ত স্মরণ করেন সেই আপ্ত বাণী।

> "তেজস্বীর তেজ সহে মনে কিছু হয় না
> তার তেজে যার তেজ তার তেজ সয়না।
> প্রচণ্ড রবির কর শিরে সহ্য হয়
> তার তাপে বালু তাতে পদে সহ্য নয়।"

ত্রৈল্যোক্যনাথ জীবনে হয়ত দেখিয়া গিয়াছেন এই মানসিকতার বীজ স্বাধীনতোত্তর উপমহাদেশে কী বিরাট মহীরুহে পরিণত হইয়াছে। গৃহে ফিরিয়া তিনি খাতাগুলি নষ্ট করিয়া ফেলিলেন। অনুগ্রহপ্রার্থী হইবার বিড়ম্বনা আর যেন তাঁহাকে সহিতে না হয়। পরে সুভাষচন্দ্রকে এই কথা জানাইলে তিনি বিশেষ ভাবে দুঃখিত হইয়াছিলেন।



আবার পুলিশ সক্রিয় হইয়া উঠিয়াছে। গুপ্তচর নিত্য পিছনে লাগিয়া আছে। পুলিশকে এড়াইতে ত্রৈলোক্যনাথ চট্টগ্রাম হইয়া রেঙ্গুন যাত্রা করিলেন। পুর্ব্বের যাত্রা পুলিশ প্রহরায় রাজবন্দী রূপে, এইবার চলিয়াছেন একাকী স্বাধীন ভাবে।

কলিকাতার মেছুয়া বাজারে বোমা বিস্ফোরণ উপলক্ষ্যে পুলিশ বোমার ফরমূলা, চিঠিপত্র ও কয়েকটী ঠিকানা ও কিছু অস্ত্রশস্ত্র হস্তগত করে। বহু বিপ্লবী গ্রেপ্তার ও অভিযুক্ত হন।

বহ্ম দেশ জুড়িয়া তখন ত্রৈলোক্যনাথের সহমর্ম্মী ও সহযাত্রীদের অবস্থিতি। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্যামাচরণ চক্রবর্ত্তী রেঙ্গুনেরেই বাসিন্দা। সেখানে না উঠিয়া তিনি উঠিলেন বিশ্বাস কোম্পানীর দীনেশ বিশ্বাসের লুই ষ্ট্রীটের বাসায়।

দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন তখন রেঙ্গুনে। তাঁহার সহিত ত্রৈলোক্য-নাথ সাক্ষাৎ করিলেন—আপনার সহযাত্রীদের সহিত দেশপ্রিয়ের পরিচয় করাইয়া দিলেন। পুলিশ সন্দেহ করিতেছে—আবার বিপ্লবীদের কর্ম্মতৎপরতা সুরু হইতে পারে। তাই কলিকাতায় পুলিশ নিরুদ্দিষ্ট ত্রৈলোক্যনাথের খোঁজ করিতে সুরু করিয়াছে। ব্রহ্ম দেশের পুলিশের কাছে নির্দ্দেশ আসে ত্বরায় অনুসন্ধান করিয়া রিপোর্ট দাখিল করিতে হইবে ত্রৈলোক্যনাথ আছেন কিনা, কারণ ব্রহ্ম দেশে ত্রৈলোক্যনাথের অবস্থিতি অসম্ভব নয়। ব্রহ্ম দেশের পুলিশ ত্রৈলোক্যনাথের সন্ধান করিয়া উঠিতে পারে না তাই কলিকাতাকে জানায়, অন্বেষিত ব্যক্তি ব্রহ্মদেশে নাই।

ত্রৈলোক্যনাথ ষ্টীমারে মান্দালয়ের পথে মাঝে মাঝে ছোট বড় ষ্টেশনে নামেন, পরিচিতদের সহিত সাক্ষাৎ করেন, আলাপ আলোচনা করেন আবার পাড়ি জমান। ইরাবতী নদী ধরিয়া ষ্টীমার উজানে চলিয়াছে। দু'ধারে পাহাড় ছবির মত; বক্ষে শ্যামায়িত অরণ্যের প্রশান্তি ও গাম্ভীর্য্য লইয়া আকাশ ও নদীর

দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকাইয়া আছে। চূড়ায় চূড়ায় মন্দির। দূর হইতে ত্রৈলোক্যনাথ ষ্টীমারে বসিয়া প্রকৃতির অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য দেখেন আর মাতোয়ারা হ'ন। মান্দালয়ে আসিয়া কারা-স্মৃতি আবার নূতন করিয়া জাগে। থিবোর প্রাসাদের আশে পাশে ঘোরাঘুরি করিতে সুরু করেন। মহারাষ্ট্র-কেশরী লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলকের স্মৃতিপুত এই কারাগারের দিকে ত্রৈলোক্য নাথ অপলক দৃষ্টিতে তাকাইয়া আছেন। ঐ তো সেই কাঠের দোতলা বাড়ী, সামনে প্রাঙ্গন, ঐখানেই তো ত্রৈলোক্যনাথ সুভাষচন্দ্রের সহিত নির্ব্বাসন-দণ্ড ভোগ করিয়া গিয়াছেন।

একদিন বন্ধু বান্ধবেরা পার্ব্বত্য নগরী মেইমো বেড়াইতে যাইতেছেন। মেইমো নাকি দার্জ্জিলিং হইতেও মনোরম ও চিত্তা-কর্ষক। ত্রৈলোক্যনাথ বিনা প্রয়োজনে কেবল মাত্র ভ্রমণের জন্য যাইতে রাজী নহেন। ব্যয়ভার বন্ধুরা দিতে উদ্‌গ্রীব কিন্তু ত্রৈলোক্যনাথের কথা—

"তোমাদের পয়সাই বা বৃথা খরচ করাইব কেন ?"

মান্দালয় হইতে ট্রেণে—টাঙ্গু।

কলিকাতার পুলিশ উৎকণ্ঠিত। ব্রহ্মদেশের পুলিশ নিশ্চিন্ত। হঠাৎ টাঙ্গু ষ্টেশনে গোয়েন্দাবিভাগের এক বাঙালী কর্ম্মচারী ত্রৈলোক্যনাথকে দেখিয়া সোৎসাহে প্রশ্ন করেন—কি ত্রৈলোক্যবাবু কেমন আছেন ? 'ভাল আছি' বলিয়া এড়াইয়া যাওয়া জবাব দেন কিন্তু মনে মনে অত্যন্ত বিচলিত হইয়া পড়েন। এই বুঝি মুক্তপক্ষ আবার গুটাইতে হয়—কারান্তরালে আবার বুঝি আবদ্ধ হইতে হয়।

নাছোড়বান্দা দারোগা ছাড়েন না, প্রশ্নর পর প্রশ্ন "কবে এলেন, কোথা থেকে ? হঠাৎ এখানে ?" পাশ কাটাইতে ইচ্ছুক —ত্রৈলোক্যনাথ এতগুলি প্রশ্নের একসঙ্গেই জবাব দেন—কাল



দিল্লীতে মহারাজের শবাধারের পাশে—ইন্দিরা গান্ধী, জগজীবন রাম, শরণ সিং, ভুপেশ গুপ্ত



দিল্লীতে মহারাজের মরদেহে রাষ্ট্রপতির পক্ষ থেকে এ, ডি, সি-র মাল্যদান

রেঙ্গুন থেকে এখানে এসেছি। সহর দেখব, পরিচিত কেউ নেই, এক হোটেলে উঠেছি, কোন বাসায় থাকার সুবিধা হয় কিনা তারই চেষ্টায় ঘুরছি।” পরিশেষে ত্রৈলোক্যনাথ দারোগাবাবুর শরণাপন্ন হইলেন—“আপনি কোন সাহায্য করতে পারেন কি ?”

পুলকিত গোয়েন্দা বিভাগের কর্ম্মচারী সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিলেন। মধ্যাহ্নে তাঁহার গৃহে যাইবার অঙ্গীকার করিয়া মধ্যাহ্ন ভোজনের পরই ত্রৈলোক্যনাথ পেগুর দিকে রওনা হইয়া যান। বেশীদিন ব্রহ্মদেশে থাকা যুক্তি সঙ্গত নয়, তাই দুই একদিন পরেই আবার চট্টগ্রামে আসিয়া উপস্থিত।

চট্টগ্রামের বাতাসে তখন আসন্ন বিপ্লবের পদধ্বনি। ত্রৈলোক্যনাথ কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেটা ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাস। তখন সাধারণ মানুষ জানেনা তারুণ্যের মহোল্লাস কী ভয়ঙ্করের বেশে চট্টলের গিরি-উপত্যকায় নামিয়া আসিতেছে।

“কলিকাতা পৌঁছাইয়াই সংবাদ পাইলাম আমার আগামী কল্যই রাজসাহী রওনা হইতে হইবে। আমি একটী কনফারেন্সে সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছি।” রাজসাহীতে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলন।

মহাত্মা গান্ধী দীর্ঘ দশ বৎসর পর সক্রিয় হইয়া আবার ভারত ব্যাপী সত্যাগ্রহ আন্দোলন সুরু করিয়াছেন। তিনি কয়েকজন অনুচরসহ দাণ্ডী অভিমুখে পদব্রজে গমন করিয়া ৬ই এপ্রিল ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে লবণ আইন ভঙ্গ করিলেন। সমুদ্রোপকূলে আপন হাতে লবণ প্রস্তুত করিলেন। সমুদ্রের তরঙ্গের মতই ভারতের জনসমুদ্র আবার উত্তাল হইয়া উঠিয়াছে। এই পটভূমিকায়—রাজসাহীতে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলনের মূল অধিবেশনের সঙ্গে যুব সম্মেলন, কর্ম্মী সম্মেলন ও শ্রমিক সম্মেলনও হয়।

মূল সভাপতি শ্রীবিপিন বিহারী গাঙ্গুলী। যুব সম্মেলনের সভাপতি শ্রীপ্রতুল চন্দ্র গাঙ্গুলী। কর্ম্মী সম্মেলনের সভাপতি শ্রীত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্ত্তী ও শ্রমিক সম্মেলনের সভাপতি শ্রীবঙ্কিম

"কন্‌ফারেন্সের পূর্ব্বদিন আমি রাজসাহী ষ্টেশনে পৌঁছি। আমার জন্য ফুলের মালা ও মোটর লইয়া অভ্যর্থনা সমিতির কর্ম্ম-কর্ত্তারা হাজির। আমি মহাবিপদে পড়িলাম। আমার অভিভাষণ লেখা হয় নাই, বক্তব্য মুখে বলিতে হইবে। আমি বক্তৃতা দিতে জানিনা, আমার ভয় হইতে লাগিল।"

ত্রৈলোক্যনাথ নিজে কর্ম্মী, কাজ করিতে পারেন, সভায় দাঁড়াইয়া বক্তৃতায় তিনি অভ্যস্ত নহেন। যে পথ তিনি জীবনে গ্রহণ করিয়াছেন তাহা 'এ্যকসনের' পথ, 'এ্যাজিটেশনের' পথ নহে। নানা চিন্তা লইয়া ত্রৈলোক্যনাথ রাত্রে শয়ন করিতে যান। প্রচণ্ড গরম, ঘুম আর আসে না। শেষরাত্রে সবেমাত্র তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থা, সংবাদ আসিল পুলিশ বাড়ী ঘিরিয়া ফেলিয়াছে। প্রাতে ত্রৈলোক্যনাথ সহ চারজন সভাপতিই গ্রেপ্তার হইলেন।

"আমাকে যখন গ্রেপ্তার করিল, সর্ব্বপ্রথম ইহাই মনে হইল যে বক্তৃতা দেওয়া হইতে রক্ষা পাইলাম।"

সমগ্র বাঙলা তথা ভারতবর্ষ নিশ্বাসরুদ্ধ করিয়া নির্ব্বাক বিস্ময়ে শুনিল, চট্টগ্রামে জীবন-মৃত্যু পায়ের ভৃত্য পন করিয়া একদল অগ্নিহোত্রী তরুণ মাষ্টারদা সূর্য্য সেনের অধিনায়কত্বে প্রহরী বেষ্টিত সুরক্ষিত অস্ত্রাগার লুণ্ঠন করিয়াছে; সাম্রাজ্যশক্তির পতাকা অবনত করিয়া ভারতের জাতীয় পতাকা সেই দণ্ডে উড়াইয়া দিয়াছে। সীমিত কালের জন্য সীমিত ভূখণ্ড হইলেও বাহুবলে তাহা অধিকার করিয়া মুক্ত করিয়াছে। সেদিন ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই এপ্রিল।

ভারতের পশ্চিম প্রান্তে সমুদ্রতীরে গান্ধীজী অটল সঙ্কল্পে লবণ আইন অমান্যে লিপ্ত আর পুর্ব্ব প্রান্তে গিরি সানুদেশে মরণমত্ত বাঙলার তরুণ শক্র সংহারে তুর্ম্মদ তুর্ব্বার।

বিদ্যুৎবেগে এ সংবাদ ভারতের প্রান্তে প্রান্তে ছুটিয়া চলে। ত্রৈলোক্যনাথরাও এ সংবাদ শুনিলেন।

"১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই এপ্রিল গুডফ্রাইডে রাত্রি ১০টার সময় বিপ্লবীরা সামরিক পোষাকে সজ্জিত হইয়া তুইটী অস্ত্রাগার আক্রমণ করেন, সঙ্গে সঙ্গে টেলিগ্রামের তার কাটিয়া দেওয়া হয় এবং রেল লাইনও নষ্ট করিয়া দেওয়া হয়। বিপ্লবীরা প্রহরীদিগকে হত্যা করিয়া অস্ত্রাগার দখল করেন। অতর্কিত আক্রমণে সহরে সরকারী মহলে ভীতির সঞ্চার হইল। জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট ও পুলিশ-সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ঘটনাস্থলে গিয়াছিলেন এবং বিপ্লবীদের উপর গুলি চালাইয়াছিলেন, বিপ্লবীরাও গুলি চালাইয়া প্রত্যুত্তর দেন। বে-গতিক দেখিয়া রণে ভঙ্গ দিয়া তাহারা পলায়ণ করেন। চট্টগ্রামের তরুণ বিদ্রোহীরা বীর শ্বেতাঙ্গ পুরুষদের মনে ত্রাস সঞ্চার করিতে সক্ষম হইয়াছিল। অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের পর সেই রাত্রেই চট্টগ্রাম সহরের শ্বেতাঙ্গের দল ভয়ে ভীত হইয়া স্ত্রী পুত্র পরিবারসহ জাহাজে উঠিয়া কর্ণফুলী নদীর মোহনায় অপেক্ষা করিতেছিলেন। থানায় পুলিশের দল আত্মসমর্পনের চিন্তা করিতেছিল। চট্টগ্রাম সহর তিন দিন অরক্ষিত অবস্থায় ছিল।"

তমসাচ্ছন্ন বন্ধুর পথে ক্ষণিক আলোকের বিচ্ছুরণ হইল। বুকের কথা মুখে প্রকাশ না পাইলেও চোখের দৃষ্টিতে ঝরিতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে সারা বাঙলা জুড়িয়া খানাতল্লাসী গ্রেপ্তার সুরু হইল। সেই সূত্রেই প্রাদেশিক সম্মেলন সুরু হইবার পূর্ব্বেই চারিজন সভাপতিই কারারুদ্ধ হইলেন।

"আমরা রাজসাহী সেণ্ট্রাল জেলে চলিলাম। আমাদের সাথে

বিরাট শোভাযাত্রা, পুলিশ বাহিনীও সঙ্গে আছে। পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট স্বয়ং আস্তে আস্তে মোটর চালাইয়া যাইতেছেন।"

আবাহনেই বিসর্জ্জন হইয়া গেল।

ত্রৈলোক্যনাথ শোভাযাত্রায় চলিয়াছেন আর মনে মনে ভাবিতেছেন।

"চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের পূর্ব্বে আমি চট্টগ্রামে ২।৩ দিন চারুবিকাশ দত্তের বাসায় ছিলাম। ঐ সময় দুই রাজনৈতিক দলের মধ্যে ঝগড়া চলিতেছিল। আমি বিবাদ্ মিটানোর জন্য—চারুবিকাশ দত্ত সহ গণেশ ঘোষের বাসায় যাই। সেখানে হাফ প্যাণ্ট, কোটবুট পরা ২৫-৩০টী ভলাণ্টিয়ার ছিল, সর্ব্বকনিষ্ট ছিল লোকনাথ বলের কনিষ্ঠ ভ্রাতা হৃষ্ট-পুষ্ট সুশ্রী যুবক হরিগোপাল বল (টেগ্‌রা) বিবাদ সহজেই মিটিয়া গেল। অবশেষে জলযোগের পর গণেশ আমাকে বলিয়াছিল 'আমাদের কিছু করার ইচ্ছা আছে; পূর্ব্বে আপনাকে জানাইব।' অবশ্যই জানাবার আর অবসর হয় নাই।"



সমুদ্র-মেখলা ভারতবর্ষে লবণ তৈয়ারীর অধিকার সর্ব্বজনের, ইংরাজের স্বার্থ-প্রণোদিত আইনের বাধা কেহ মানিবেনা। তাই গান্ধীজী নিজে আইন ভঙ্গ করিয়া দেশবাসীকে আইনভঙ্গ করিতে আহ্বান করিলেন। ক্ষীণতনু দৃঢ়সঙ্কল্প একক যাত্রীর দাণ্ডিযাত্রায়

ইংরাজের শাসককুল প্রথমে হয়ত হাসিয়াছিল কিন্তু ধীরে ধীরে ভারতব্যাপী যখন সেই আন্দোলন প্রচণ্ডরূপে দেখা দিল তখন পশুশক্তির দ্বারা ভারত সরকার তাহা দমন করিতে মনস্থ করিলেন।

"এইবার বাঙলাদেশে প্রায় চারিহাজার লোক বিনা বিচারে আটক হইল—বৈপ্লবিক মামলায় প্রায় একহাজার লোক দণ্ডিত হইল এবং আইন অমান্য করিয়া বাঙলাদেশের প্রায় পনের ষোল হাজার লোক জেলে গেল। অসহযোগ আন্দোলনের সময় সমস্ত ভারতবর্ষ হইতে মোট পঁচিশ হাজার লোক জেলে গিয়াছিল, কিন্তু আইন অমান্য আন্দোলনের সময় ভারতবর্ষ হইতে এক লক্ষ লোকের অধিক জেলে গেল।"

রাজসাহী কারাগারের সঞ্চালক শ্রীসুরেন গুপ্ত অতি বিচক্ষণ। কোন গণ্ডগোল নাই। আন্দোলন করিবার কোন হেতু তিনি দেন না। মেয়েদের ফাটক শূন্য থাকায় সেখানেও পুরুষবন্দী রাখা হইয়াছে। হঠাৎ একদল ইরানী মেয়ে গ্রেপ্তার হইয়া আসে। কারাসঞ্চালক বন্দীদের মেয়েদের ফাটক হইতে সরাইতে গেলে প্রতিবাদের ঝড় উঠিল। কর্তৃপক্ষের কথা শুনিতে কেহ রাজী নহে। সঞ্চালক গুরুগম্ভীর স্বরে জানান—সন্ধ্যার মধ্যে ফাটক খালি করাবই। বন্দীর দল উত্তেজনায় গর্জ্জিয়া উঠে। তাহারা মেয়েদের ফাটক ছাড়িবে না, সংঘর্ষ আসন্ন, সবাই প্রস্তুত। সন্ধ্যার প্রাক্কালে গ্রেপ্তার করা ইরানী মেয়ের দল কয়েকজন শিশুপুত্রসহ ফাটকে প্রবেশ করিল ও পুলিশের নির্দ্দেশে প্রাঙ্গণে জোড়ায় জোড়ায় বসিয়া রহিল। রাজবন্দীরা বেগতিক দেখিয়া আপনা হইতেই ফাটক ছাড়িয়া অন্যত্র নির্দ্দিষ্ট স্থানে চলিয়া গেল। সঞ্চালক আসিয়া শুধু হাসিয়া বলেন—কেমন ছাড়তে হ'ল ত।

পুলিশের অধ্যক্ষ একদিন ত্রৈলোক্যনাথের বিরুদ্ধে অস্ত্র আমদানী

করার অভিযোগ আনিলেন। লিখিতভাবে ত্রৈলোক্যনাথ লাট দরবারে পাল্টা অভিযোগ উথাপিত করিলেন।

"This morning the Supdt of Police, Rajsahi showed me some charges rediculous and farcical. These are meant to hoodwink the innocent public by a farcical show of trial by un-named judges, whose existence is open to serious doubts.

(1) I charge you Stanly Jackson with your successor Hugh Stephenson for conspiring with F.I. Lowman, Tegart, Me. Kenty, Colson, Nalini Mazumdar and others in Calcutta and other parts of the Province to Commit treasonable charges against Indian National Congress.

(2) I charge you Stanly Jackson and your subordinates for murdering innocent Indians in different Parts of Bengal.

(3) I charge you Stanly Jackson for arresting innocent people and illegally detaining them in Jail.

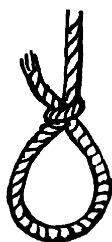
(4) I charge you Stanly Jackson for looting the properties of innocent people in the name of searches.

(5) I charge you Stanly Jackson for shooting innocent people in the name of quelling riots.

You are asked to answer the above charges. The charges along with your answers will be submitted before the National Tribunal."

১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই জুন লেখা এই অভিযোগ পত্র বাঙলার তদানীন্তন লাটসাহেবের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত অভিযোগ নহে। ইহা

মহাকালের দরবারে ইতিহাসের গোচরে পদাহত, পর্য্যুদস্ত, লুণ্ঠিত ভারতের চিরকালের প্রশ্ন। ব্রিটিশ শক্তি এ চিঠির কোন জবাব দেন নাই বটে—তবে ইতিহাস ইহার জবাব লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিবে।



ইংরাজ রাজ-কর্ম্মচারীরা প্রতিহিংসাপরায়ণ হইয়া উঠিয়াছে। একদিকে গান্ধীজীর নেতৃত্বে সত্যাগ্রহ আন্দোলন আকারে, বিস্তারে পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক বিপুল এবং অন্যদিকে সশস্ত্র অভ্যুত্থানে জীবন-পণ বিপ্লবীরা আবার সক্রিয় হইয়া উঠিয়াছে। চট্টগ্রামের লাঞ্ছনা শ্বেতাঙ্গেরা ভুলিতে পারিতেছে না। তাহাদের এই ব্যর্থতা ভারতবর্ষে ব্রিটিশ প্রভুত্বে কম্পন তুলিয়াছে। বিশেষ করিয়া বাঙলার— পুলিশের অধিকর্ত্তা ল্যোমান সাহেব, কারাধিকর্ত্তা মিঃ সিমসন ও কলিকাতার পুলিশ কমিশনার টেগার্ট সাহেব আহত ব্যাঘ্রের মত প্রতিশোধ স্পৃহায় ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। সাপের ক্রূরতার ও বরাহের ক্ষিপ্রতায় তাহারা যথেচ্ছ অত্যাচারে বিশেষ করিয়া বাঙলার যুব সমাজের জীবন ভয়াবহ ও ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে। স্থির হইল এই শ্বেতাঙ্গ অত্যাচারীদের সরাইতে হইবে।

প্রথম লক্ষ্য টেগার্ট সাহেব। তরুণ বিপ্লবী অনুজা সেন ২৫শে আগষ্ট ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে ডালহৌসী স্কোয়ারে চার্লস টেগার্টকে লক্ষ্য করিয়া বোমা নিক্ষেপ করিলেও তিনি অনাহত অবস্থায় পরিত্রান

পাইলেন কিন্তু বোমা নিক্ষেপকারী নিজের হাতে বোমা বিস্ফোরণে আহত হইয়া মৃত্যুবরণ করেন। ইতিপূর্ব্বে ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে টেগার্টকে হত্যা করিতে গিয়া গোপীনাথ সাহা কলিকাতায় চৌরঙ্গীতে মিঃ ডে নামক একজন ইংরাজকে ভুল ক্রমে গুলি বিদ্ধ করেন। এই বৎসরই এপ্রিল মাসে হ্যারিসন রোডে টেগার্টকে হত্যা করিতে গিয়া ক্রুম্‌কে হত্যার চেষ্টা হয়। বার বার টেগার্টকে সরাইবার চেষ্টা হয়—কিন্তু বার বার টেগার্ট পরিত্রাণ পান।

১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে আগষ্ট ঢাকায় পুলিশের অধ্যক্ষ হাড্‌সন সাহেবের সহিত বহু পুলিশ কর্ম্মচারী ও সশস্ত্র সিপাহী পরিবেষ্টিত পুলিশের অধিকর্ত্তা লোম্যান সাহেব ঢাকা মিটফোর্ড মেডিক্যাল স্কুলে অধ্যয়নরত বিনয় বসুর অতর্কিত গুলিতে নিহত এবং হাড্‌সন আহত হয়। বেঙ্গল ভলেন্টিয়ার্স দলের সভ্য বিনয় বসু আত্মগোপন করিলেন, পুলিশ সন্ধান পাইল না।

শাসক যত প্রতিহিংসায় উন্মত্ত হয়—বিপ্লবীদের প্রতিশোধ ততই ব্যাপক হইয়া উঠে। তাই বাংলার নানাস্থানে নানাভাবে পুলিশ ও গোয়েন্দা কর্ম্মচারীদের হত্যা করিবার চেষ্টা চলিতে লাগিল। এই বৎসর ১লা ডিসেম্বর—চাঁদপুর রেলওয়ে ষ্টেশনে নূতন পুলিশের অধিকর্ত্তার প্রাণনাশের প্রচেষ্টা হইল কিন্তু ভুলবশতঃ অন্য ব্যক্তি নিহত হইলেন।

অকস্মাৎ ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই ডিসেম্বর বাঙলা তথা ভারতের ইতিহাস রক্তরঞ্জিত স্বর্ণাক্ষরে লিখিত হইয়া গেল। এপ্রিলে রাজ-শক্তির অস্ত্রশালা ডিসেম্বরে সর্ব্বশক্তির কেন্দ্র কলিকাতার ঐতিহাসিক লালবাড়ী—রাইটার্স বিল্ডিং। ইংরাজ শাসনের প্রতিভূ। লোম্যানের হত্যাকারী আত্মগোপনরত বিনয় বসু—সহযোগী সুধীর গুপ্ত ও দীনেশ গুপ্তের সহিত সশস্ত্র শাস্ত্রী ও ইংরাজ পুলিশ কর্ম্মচারীদের চোখে ধূলা দিয়া সেই দুর্ভেদ্য দুর্গ-সদৃশ দপ্তরে শুধু প্রবেশ করিলেন

না, বাঙলার কারাগারসমূহে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের উপর যে অকথ্য অমানুষিক নির্য্যাতন চলিতেছে তাহার উপযুক্ত শিক্ষা দিতে কারাগারসমূহের অধিকর্ত্তা কর্ণেল সিমসনের খাস দপ্তরে প্রবেশ করিয়া তাহাকে গুলিবিদ্ধ করিলেন। সিমসন ঘটনাস্থলেই নিহত। তাহার পর বিভিন্ন শ্বেতাঙ্গ অফিসারদের উপরও আক্রমণ চলে। রাইটার্স বিল্ডিংয়ের অলিন্দ যুদ্ধ এক ঐতিহাসিক দলিল। তিন বিপ্লবী অকুতোভয়, মৃত্যুঞ্জয় হইয়া ব্রিটিশ শক্তির সহিত শেষ সংগ্রামে লিপ্ত। নিঃশেষিত-অস্ত্র সুধীর গুপ্ত আত্মহত্যা করেন, বিনয় বসু আপন মস্তকে গুলিবিদ্ধ করিয়া হাসপাতালে মারা যান ও দীনেশ গুপ্তের ফাঁসী হয়। ভারতের কণ্ঠ নিষ্পেষণকারী ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বজ্রমুষ্টি শিথিল হইয়া আসিতেছে। ভারতের আকাশে তখন দুর্য্যোগের ঘনঘটা, মাঝে মাঝে রূপালী মেঘের চমক আগামী দিনের আশার আলোক দেখাইতেছে।

ত্রৈলোক্যনাথ ও প্রতুলচন্দ্রকে বহরমপুর কারাগারে স্থানান্তরিত করা হইল। মোটরে আনিয়া নাটোর হইতে গাড়ীতে তুলিবার বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। বিপ্লবীদ্বয় বাঁকিয়া বসেন। তাঁহাদিগকে দ্বিতীয় শ্রেণীতে লইয়া যাইতে হইবে। হুকুম ইণ্টার ক্লাসের। দারোগা অক্ষমতা জানায়—বন্দীদ্বয় সত্যাগ্রহ করিয়া মাটি লন। নড়িবেন না। ইত্যবসরে ট্রেন প্ল্যাট্‌ফরমে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। গাড়ীর তৃতীয় শ্রেণীর কামরা হইতে আকাশ-ফাটান চীৎকার—'বন্দেমাতারম্'। মহাত্মা গান্ধীকী জয়। নিজেদের সঙ্কল্প ভুলিয়া বন্দীদ্বয় নির্দ্দিষ্ট কামরার দিকে ছুটিলেন। তৃতীয় শ্রেণীর কামরাটী আইন অমান্যকারী বন্দীতে পরিপূর্ণ—রঙ্গপুর কারাগার হইতে তাহাদের দমদম কারাগারে স্থানান্তরিত করা হইতেছে। ত্রৈলোক্যনাথ ও প্রতুলচন্দ্র তৃতীয় শ্রেণীতেই তাহাদের সহযাত্রী হইলেন। দারোগা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেন।

কিছুদিন পূর্ব্বেই বহরমপুর জেলে লাঠিচার্জ্জ হইয়া গিয়াছে। আবহাওয়া উত্তপ্ত। তাই আরও উত্তপ্ত করিতে ইংরাজ সরকার বেশী দিন দুইজন নবাগতকে বহরমপুর কারাগারে রাখা সমীচীন মনে করিলেন না। বক্সা বন্দীনিবাসে তাঁহাদের পাঠান হইল। ইহা একটী পুরাতন কেল্লা। "ভূটানের পাদদেশে, পাহাড়ের উপর অবস্থিত বক্সা দুর্গ, বাংলায় বিপ্লবীদিগকে আটক করিয়া রাখার একটী কেন্দ্রস্থল ছিল। এই দুর্গের চারিদিকে দেওয়াল ও কাঁটা তারের বেড়া ছিল, বন্দুকধারী সিপাহী—দিবারাত্র চব্বিশ ঘণ্টা পাহারা দিত। দুর্গের চারিদিকে ভীষণ জঙ্গল, জঙ্গলে বাঘ, ভাল্লুক, বন্য হস্তী ও বিষধর সর্প থাকিত। শীতকালে ভীষণ শীত। এই বন্দীনিবাসে প্রায় দেড়শ দেশপ্রেমিক বিনা বিচারে আটক ছিলেন।"

বাংলার বাহিরেও বিপ্লবী আন্দোলন বিস্তার লাভ করিতেছে। "১৯৩০ সালের ২৩শে ডিসেম্বর পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্ত্তন সভায় হরিকিষণ নামক এক যুবক পাঞ্জাবের গভর্ণরের উপর গুলী চালায়। ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে ২৩শে জুলাই বোম্বাই প্রদেশের গভর্ণর যখন পুণা ফার্গুসান কলেজে অভিভাষণ পাঠ করিতেছিলেন তখন বাসুদেব গোগাটী নামক একটী ১৯ বৎসরের যুবক তাহার প্রতি গুলি নিক্ষেপ করেন।"

১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে মার্চ্চ লাহোর সেণ্ট্রাল জেলে ভগৎসিংয়ের ফাঁসী হইয়া গেল। সারা ভারত সভা ও শোভাযাত্রায় উদ্বেল। পথ প্রান্তর ভগৎসিং জিন্দাবাদ ধ্বনিতে মুখরিত। ত্রৈলোক্যনাথও এখবর জানিলেন। তাঁহার মানস চক্ষে ভাসিয়া উঠে—পুরাতন স্মৃতি।

"১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা কংগ্রেসের সময় ভগৎ সিং কলিকাতা আসিয়া আমাদের সহিত দেখা করিয়াছিল। ঐ সময়ে তাহার নামে

ওয়ারেন্ট ছিল। ভগৎ সিংয়ের সহিত লাহোর ষড়যন্ত্র মামলায় দণ্ডিত রামশরণ দাসও ছিলেন। রামশরণ দাস আমার বন্ধু ছিলেন, আন্দামানে আমরা একত্র ছিলাম। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রমোহন সেন-এর আপার সার্কুলার রোডের বাসায় এক রাত্রে ভগৎ সিং, রামশরণ দাস ও আমাদের মধ্যে আলাপ আলোচনা হয়। ঐ আলোচনার সময় প্রতুলচন্দ্র গাঙ্গুলী মহাশয়ও উপস্থিত ছিলেন। ভগৎসিংয়ের ধারণা ছিল, পাঞ্জাব ঘুমাইয়া আছে, পাঞ্জাবকে জাগাইতে হইলে শক্ত আঘাত দিতে হইবে জমকালো (Sensational) কিছু করিতে হইবে। ভগৎ সিং আমাদের নিকট কিছু বোমা ও পিস্তল চাহিল। আমরা ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের পর হিংসাত্মক কর্ম্মানুষ্ঠান ছাড়িয়া দিয়াছি। আমাদের মতে দেশ জাগিয়াছে, এখন লোক দেখান কিছু করার প্রয়োজন নাই, এখন প্রয়োজন গণ-আন্দোলন মারফৎ জনগণের বৈপ্লবিক চেতনা জাগান। ব্যাপক সংগ্রামের জন্যই সংগঠন প্রয়োজন। দল সবল না হইলে, সন্ত্রাসবাদমূলক কাজ আরম্ভ করিলে, গভর্ণমেণ্টের দিক্ হইতে যে চাপ আসিবে, সেই চাপ দল সহ্য করিতে পারিবে না, অল্প দিনের মধ্যেই দল ভাঙ্গিয়া যাইবে। ভগৎ সিং বলিল, 'পাঞ্জাব অনেক পিছনে পড়িয়া আছে, পাঞ্জাবকে জাগাইতে হইবে, পাঞ্জাবের লোক ভাবপ্রবণ, জমকাল কোন কাজ দেখিলেই তাহারা লাফাইয়া উঠিবে, ঝাঁপাইয়া পড়িবে। আপনারা তো সন্ত্রাসমূলক কাজ করিয়াছেন। আমরা পাঞ্জাবে বিপ্লবী দল গঠনের চেষ্টা করিয়াছি কিন্তু কিছুই করিতে পারি নাই।' ভগৎসিং সন্ত্রাসবাদমূলক (Terrorism) কাজ আরম্ভ করার অনুমতি দেওয়ার জন্য আমাদের নিকট অনেক অনুনয়-বিনয় করিল, অনেক নজির দেখাইল। আমি বলিলাম, এখন কোন সন্ত্রাসবাদ-মূলক কাজ হইলে ধর-পাকড় সুরু হইবে, ষড়যন্ত্র মামলা হইবে, এপ্রুভারী হইবে, দল ভাঙ্গিয়া যাইবে—ইহা আমাদের পূর্ব্ব

অভিজ্ঞতা। ভগৎসিং বলিল, আমাদের এমন সব যুবক আছে, তাহাদিগকে কাটিয়া টুক্‌রা টুক্‌রা করিলেও 'টু' শব্দ করিবে না। আপনি আমার সঙ্গে চলুন, তাহাদিগকে পরীক্ষা করিয়া দেখুন। ভগৎ সিংয়ের কথার মধ্যে সরলতা ছিল আন্তরিকতা ছিল। অল্প বয়স্ক যুবক—তাহার কথায় এবং আন্তরিকতা দেখিয়া আমরা সকলেই মুগ্ধ হইয়াছিলাম। আমি রামশরণ বাবুকে বলিলাম, আগামী লাহোর কংগ্রেসের সময় আপনি কংগ্রেসে যোগদান করিয়া সুভাষবাবুর ভলান্টিয়ার বাহিনীর মত একটী কংগ্রেসের ভলান্টিয়ার বাহিনী গড়িয়া তুলন এবং ভগৎসিং যাহাতে ভলান্টিয়ার বাহিনীর চার্জে থাকিতে পারে—সে ব্যবস্থা করিবেন। আমি ভগৎ সিংকে বলিলাম, তুমি পাঞ্জাবের বিভিন্ন জিলা হইতে পাঁচ হাজার ভলান্টিয়ার সংগ্রহ করার চেষ্টা কর। এই দল হইবে তোমার ভাবী বিপ্লবের প্রধান সম্বল। আমরা ভগৎসিংকে খুসী করার জন্য কয়েকটা পিস্তল ও বোমা দিলাম। ভগৎ সিং প্রথমে দল গঠন করার চেষ্টা করিয়াছিল কিন্তু কোন সাড়া না পাইয়া নিরাশ হইয়া পড়িল। তখন তাহার এই ধারণাই বদ্ধমূল হইল, পাঞ্জাবকে জাগাইতে হইলে চমকপ্রদ কিছু করিতে হইবে নতুবা পাঞ্জাবের যুবকদের মোহ নিদ্রা ভাঙবে না। কিছুদিন পর দেখা গেল পাঞ্জাব এসেম্বলীতে বোমা পড়িয়াছে। ভগৎ সিং জানিত, এই বোমা নিক্ষেপ দ্বারা বা কতিপয় সাহেব খুন দ্বারা দেশের স্বাধীনতা আসিবে না। ভগৎ সিং বিশ্বাস করিত, ইহার দ্বারা দেশ এগিয়ে যাবে, দেশের যুবকদের মধ্যে আসিবে নব জাগরণ। দেশ প্রেমিক বীর ভগৎ সিং ফাঁসী কাষ্ঠে ঝুলিয়া দেশের যুবকদের মধ্যে নূতন প্রাণের সঞ্চার করিয়াছিল। ধন্য ভগৎ সিং।"

সাথে সাথে ভাসিয়া ওঠে আর একখানি অতিপরিচিত মুখ।—বাঙলার দধীচি তরুণ বিপ্লবী যতীন দাসের ৬৪ দিন অনশনে

থাকিবার পর—১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে ১৩ই সেপ্টেম্বর—লাহোর সেণ্টাল জেলে যতীন দাসের মৃত্যু হয়। হাওড়া ষ্টেশনে ট্রেনে শব আসিয়া পৌঁছাইলে লক্ষাধিক লোকের জনতা সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে সেই শবাধারকে অনুসরণ করিল। দেশবন্ধুর পর বাঙালী আর একবার উত্তাল হইয়া উঠিল।

শ্রীনলিনী কিশোর গুহ বলিতেছেন "যতীন দক্ষিণ কলিকাতার তরুণ বিপ্লবী কর্ম্মী। দক্ষিণ কলিকাতার অন্যতম বিপ্লবী কর্ম্মী সুশীল ব্যানার্জীর মাধ্যমে তিনি প্রতুল গাঙ্গুলী ও ত্রৈলোক্য চক্রবর্ত্তী (মহারাজের) সঙ্গে পরিচিত হন, এবং সংস্থাভুক্ত হন।" তৃতীয় লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার অন্যতম আসামী যতীন দাস অন্যান্যদের সহিত দাবী আদায়ের জন্য অনশন করিলেন কিন্তু কিছু প্রতিশ্রুতি প্রাপ্তির পর ও নেতাদের অনুরোধে আর সবাই অনশন ভঙ্গ করিলেও পূর্ণ দাবীর পরিপূরণ না হইলে যতীন দাস অনশন ভঙ্গে রাজী হইলেন না। সঙ্কল্পে স্থির নিষ্ঠায় অচল যতীন দাসের অন্তরে সেদিন ইস্পাত-কঠিন মনোবল, মুখে স্বর্গীয় দীপ্তি, চেতনায় মৃত্যুঞ্জয়ের মহামন্ত্র। কবিগুরুর বাণীকে তিনি অর্থ দিলেন—

"নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান
ক্ষয় নাই তার ক্ষয় নাই।"



মহারাজ ত্রৈলোক্যনাথ

মেদিনীপুরের ইতিহাস মহাভারতের মতই পুরাতন। পৌরাণিক যুগ হইতেই মেদিনীপুর নানা নামে নানা পরিচয়ে অখণ্ড ভারতের সহিত আপন খণ্ড সত্ত্বাকে মিলাইয়া দিয়াছে। ভারতের শৌর্য্যে বীর্য্যে উত্থান পতনে মেদিনীপুর চিরদিন মহাভারতের সহিত একাত্ম। তাই সত্যাগ্রহ আন্দোলনে আরব সাগরের উপকূলে যে উন্মাদনা প্রকাশিত হইল তাহাই বঙ্গোপসাগরের উপকূলে মহিষাদলে ও কাঁথিতে উৎসারিত হইয়া—পুণ্য কীর্তি লাভ করিল। সত্যাগ্রহীরা আইন অমান্য করিয়া লবন তৈয়ারী করিতেছে ; মাটির পাত্রে সমুদ্রের জল ফুটিতেছে। পুলিশ পাত্র ভাঙিতে চায়, সত্যাগ্রহী উপুড় হইয়া পৃষ্টদেশ দিয়া সে পাত্র রক্ষা করিতেছে। লাঠির প্রহারে বুটের আঘাতে দেহ ক্ষত বিক্ষত, মস্তক হইতে রক্তক্ষরণ হইতেছে—সত্যাগ্রহীর ভ্রূক্ষেপ নাই ; পাত্র দিবে না। কখনও বা ফুটন্ত লবনাক্ত জল সারা দেহে ছড়াইয়া পড়িতেছে। জ্বলন্ত ফোস্‌কায় দেহ-চর্ম্মে অসহ্য যন্ত্রনা, সাথে লবনের জ্বালা। তবু সত্যাগ্রহী অচল অটল। সঙ্কল্প-কঠিন। অহিংস। অত্যাচারে অত্যাচারে মেদিনীপুর জর্জ্জরিত, উদ্‌ভ্রান্ত। আবালবৃদ্ধবণিতা উৎপীড়িত, দিবারাত্র উৎকণ্ঠিত।

অহিংস সংগ্রামীরা হিংসার কথা না ভাবিলেও সহিংস বিপ্লবীরা চুপ করিয়া থাকিতে রাজী নহে। প্রজাপীড়ক শাসককে উচিত শিক্ষা দিতে বদ্ধপরিকর। বিপ্লবী নেতৃত্ব স্থির করিলেন, সাম্রাজ্যবাদী শাসনের প্রতিভূ জেলাশাসকের মৃত্যুই ইহার প্রতিশোধ। ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই এপ্রিল সরকারী স্কুল প্রাঙ্গণে এক শিক্ষা প্রদর্শনীর উদ্বোধনের সময় বিমল দাশগুপ্ত ও জ্যোতি জীবন ঘোষ জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট পেডি সাহেবকে গুলি করিয়া হত্যা করে। জনতার আর্ত্ত আকুলতা বিপ্লবীর গুলির মুখে কথাকহিয়া উঠিল।

মেদিনীপুরের অন্তর্গত খড়্গপুরের অনতিদূরে—লোকালয়হীন

হিজলীর জঙ্গল-সমাকীর্ণ রিক্ত প্রান্তর। সেখানেও বন্দীদের আটক রাখা হইয়াছে। নাম হিজলী ক্যাম্প। কর্তৃপক্ষের নিয়ত দুর্ব্যবহারে বন্দীর দল উত্যক্ত, কোন অভাবের পূরণ হয় না, কোন অভিযোগের প্রতিকার নাই। দিন দিন অসন্তোষ ধূমায়িত হইতে থাকে।

শ্রীনলিনী কিশোর গুহের জবানীতে—"১৯৩১ অক্টোবরে হিজলী বন্দী শিবিরে আটক রাজবন্দীদের প্রায় ১০০ জন পুলিশ সহসা আক্রমণ করে—বন্দীদের উপর লাঠি বেয়নেট গুলী চালায় নিরস্ত্র বন্দীরা অনেকে আহত হন। সন্তোষ মিত্র ও তারকেশ্বর সেন গুলীবিদ্ধ হইয়া মৃত্যুবরণ করেন। সন্তোষ দোতলায় ও তারকেশ্বর একতালায় দাঁড়াইয়া কিসের জন্য গোলমাল জানিতে চাহিয়াছিল।

কোন কোন রাজবন্দীর সঙ্গে সিপাহী দুই একজনের কলহ হয়। তাহারই প্রতিশোধ নেওয়া হয় যদৃচ্ছ আক্রমণ ও গুলী চালাইয়া।

নিরস্ত্র রাজবন্দীদের আক্রমণ করার সময় সিপাহীদের চীৎকার ছিল—হুকুম মিল গিয়া, শালা লোককো মারো—আর রামজীকা জয়।" ফলশ্রুতি দুই জন নিহত ও প্রায় একশত আহত। সমগ্র দেশ রাগে দুঃখে উত্তেজনায় নির্ব্বাক। প্রতিশোধ লইবার সাধ থাকিলেও সাধ্য নাই। রবীন্দ্রনাথ আবার নির্ব্বাক জনতার হইয়া বাঙ্ময় হইলেন।

"আমি যে দেখেছি গোপন হিংসা কপট রাত্রি-ছায়ে
হেনেছে নিঃসহায়ে।
আমি যে দেখেছি প্রতিকারহীন, শক্তের অপরাধে
বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে।"

মানবতার পতাকাবাহী ইতিহাসের নিকট প্রশ্ন রাখিলেন—

"যাহারা তোমার বিষাইছে বায়ু, নিভাইছে তব আলো,
তুমি কি তাদের ক্ষমা করিয়াছ, তুমি কি বেসেছ ভালো।"

মহারাজ ত্রৈলোক্যনাথ

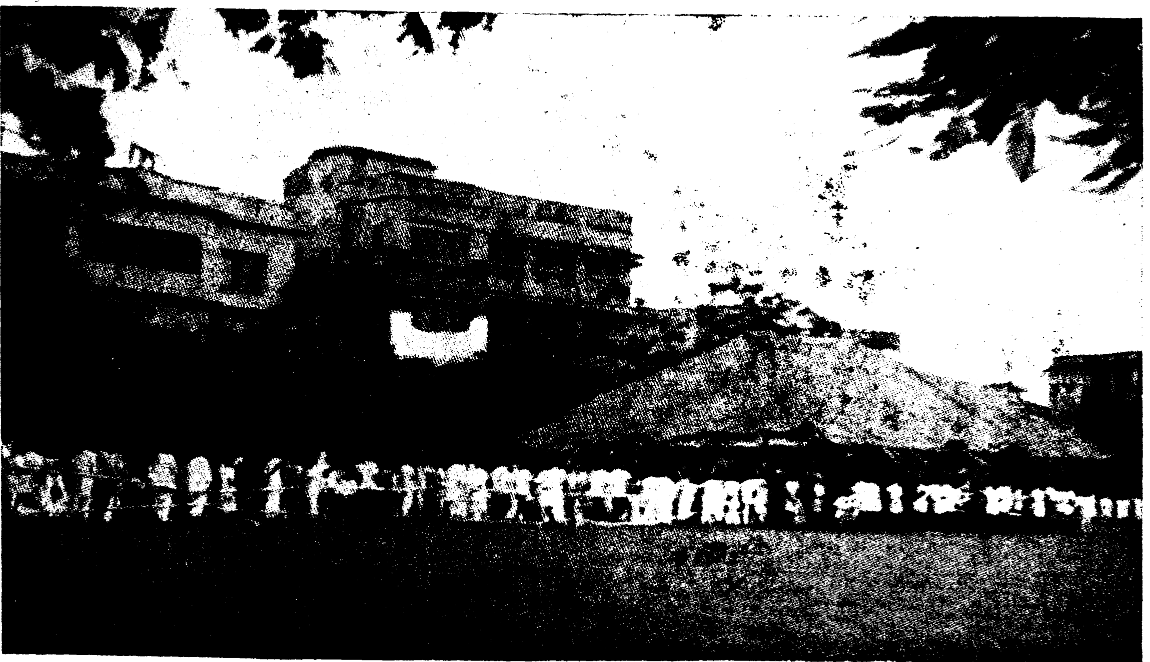
১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই অক্টোবর ময়দানে বিরাট সমাবেশ। শোকক্ষুব্ধ জনতা নিজের অব্যক্ত হৃদয়াবেগকে বাণীরূপে আপন শ্রবণে শুনিতে চাহে।

সত্তরোত্তর রবীন্দ্রনাথ স্থির থাকিতে পারিলেন না, আহ্বানে সাড়া দিলেন—সভায় উপস্থিত হইয়া তাঁহার মর্ম্মবেদনা প্রকাশ করিলেন।

শাসকের কাপুরুষতায় ও পশুত্বে বিস্ময়াহত রবীন্দ্রনাথ জানাইলেন যে এত বড় জনসভায় যোগদান করা তাঁহার শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর ও মনের পক্ষে উদ্‌ভ্রান্তিজনক হইলেও তিনি আসিয়াছেন অবমানিত মনুষ্যত্বের দিকে তাকাইয়া। তিনি শোনাইলেন—

"ডাক এলো সেই পীড়িতদের কাছ থেকে রক্ষক নামধারীরা যাদের কণ্ঠস্বরকে নরঘাতন নিষ্ঠুরতার দ্বারা চিরদিনের মত নীরব করে দিয়েছে। যখন দেখা যায় জনতাকে অবজ্ঞার সঙ্গে উপেক্ষা করে এত অনায়াসে বিভীষিকার বিস্তার সম্ভবপর হয়, ধরে নিতেই হবে ভারতে ব্রিটিশ শাসনের চরিত্র বিকৃত দুর্দ্দম দৌরাত্ম্য উত্তরোত্তর বেড়ে চলবার আশঙ্কা ঘটলো, যেখানে নির্বিবেক অপমান ও অপঘাতে পীড়িত হওয়া দেশের লোকের পক্ষে এত সহজ অথচ যেখানে যথোচিত বিচারের ও অন্যায় প্রতিশোধের আশা এতো বাধাগ্রস্ত, সেখানে প্রজা রক্ষার দায়িত্ব যাদের পরে সেই সব শাসনকর্ত্তার এবং তাঁদেরই আত্মীয় কুটুম্বদের শ্রেয়বুদ্ধি কলুষিত হবে এবং সেখানে ভদ্রজাতীয় রাষ্ট্রবিধির ভিত্তিজীর্ণ না হয়ে থাক্‌তে পারে না।"

তিনি দেশবাসীর হয়ে রাজপুরুষদের সতর্ক করেন—"বিদেশী-রাজ যত পরাক্রমশালী হোক্ না কেন, আত্মসম্মান হারানো তার পক্ষে সকলের চেয়ে দুর্ব্বলতার কারণ। এই আত্মসম্মানের প্রতিষ্ঠা



দেশপ্রিয় পার্কে দর্শনার্থী জনতা



কলিকাতার দেশপ্রিয় পার্কে মহারাজের মরদেহের পাশে অজয় মুখোপাধ্যায়, ভুপতি মজুমদার প্রমুখ—

—ক্ষোভের কারণ সত্ত্বেও অবিচলিত নিষ্ঠায়, প্রজাকে পীড়ন স্বীকার করে নিতে বাধ্য করা রাজার পক্ষে কঠিন নাহতে পারে, কিন্তু বিধিদত্ত অধিকার নিয়ে প্রজার মন যখন স্বয়ং রাজাকে বিচার করে তখন তাকে নিরস্ত করতে পারে কোন শক্তি? একথা ভুললে চল্‌বে না যে, প্রজাদের অনুকূল বিচার ও আন্তরিক সমর্থনের পরেই অবশেষে বিদেশী শাসনের স্থায়িত্ব নির্ভর করে।"

তিনি জনগণকে মনে রাখতে অনুরোধ জানালেন—

"ঘটনাটা স্বতঃই আপন কলঙ্ক লাঞ্ছিত নিন্দার পতাকা যে উচ্চে ধরে আছে তত ঊর্দ্ধে আমাদের ধিক্কারবাক্য পূর্ণবেগে পৌঁছিতেই পারবে না।"

উপসংহারে তিনি আহ্বান জানালেন—

"আমাদের নির্য্যাতিত ভ্রাতাদের কঠোর দুঃখ স্বীকারের প্রত্যুত্তরে আমরাও কঠিন দুঃখ ও ত্যাগের জন্য প্রস্তুত হতে পারি।" কবির সেদিনের মর্ম্মস্পর্শী ভাষণে জনতা আপনার মর্ম্মের স্পর্শ পাইল।

হিজলীতে অমানুষিক অত্যাচারের পরিপ্রেক্ষিতে বকসা বন্দীশিবিরে অনশন ধর্ম্মঘট সুরু হইল।

"আমাদের যুবকদের জীবনীশক্তি যে কত কমিয়া গিয়াছে এই অনশনের সময় তাহা দেখিতে পাইলাম। আমরা যাহারা বয়স্ক ছিলাম সপ্তম দিনেও ঘুরিয়া ফিরিয়া সকলের সংবাদ লইয়াছি, কিন্তু যুবকের দল সকলেই প্রায় শয্যাশায়ী হইয়া পড়িয়াছিল।"

দীর্ঘ দশ বৎসর পর ত্রৈলোক্যনাথের আবার সেই মর্ম্মান্তিক হাঁপানী রোগ দেখা দিল। তিনমাস শয্যাশায়ী থাকিবার পর কিছুটা সুস্থ হইলেন।

গোল টেবিল বৈঠকের আগে দেশপ্রিয় বক্‌সা বন্দীশিবিরে আসিলেন, উদ্দেশ্য ইংরাজ সরকারের সহিত বিপ্লবীদের সম্‌ঝোতা

স্থাপন। উভয়পক্ষে দুচারখানি পত্র বিনিময় হইয়াছিল কিন্তু কোন বোঝাপড়া হইল না।

গত ২৭শে জুলাই রামকৃষ্ণ বিশ্বাস ও দীনেশ গুপ্তকে প্রাণদণ্ডের আদেশ দেওয়ায় আলিপুরের জেলা ও দায়রা জজ গার্লিক সাহেবকে বি, ভি দলের সভ্য কানাই ভট্টাচার্য্য হত্যা করিয়াছে।

বিপ্লবী নেতাদের নির্দ্দেশ অনুসারে বিভিন্ন কারাগার হইতে কিছু বিপ্লবীরা পলাইয়া বাহিরে যাইতে সচেষ্ট হইয়া উঠে। ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দের শেষদিকে বকসা বন্দীশিবির হইতে যখন দুইজন বিপ্লবী অন্তর্হিত হইল তখন সেখানে দারুণ উত্তেজনা। উদ্‌ভ্রান্ত কর্ম্মচারীর দল নানাপ্রকার অত্যাচার স্নুরু করিল। কর্ত্তৃপক্ষ স্থির করিলেন ত্রৈলোক্যনাথ ও প্রতুলচন্দ্রকে আর এখানে রাখা সমীচীন নহে। তাই তাঁহাদের মাদ্রাজের ভেল্লুর কারাগারে স্থানান্তরিত করা হইল। উত্তর হইতে এইবার সুদূর দক্ষিণে।

এইখানেই মালাবার বিদ্রোহের নেতা নারায়ণ মেননের সহিত ত্রৈলোক্যনাথের পরিচয়। যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত এই বিদ্রোহী নেতা অত্যন্ত অমায়িক ও সুকোমল চিত্ত। প্রত্যক্ষ ভাবে ত্রৈলোক্যনাথ এই ঐতিহাসিক বিদ্রোহের সকল তথ্য বিদ্রোহের পুরোধার মুখ হইতে দিনের পর দিন শুনিয়া যান। আবার হুকুম আসে, "হেথা নয়, হেথা নয় অন্য কোনখানে" তাই এইবার চলিলেন কন্নুর কারাগারে।

ইতিমধ্যে ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই ফেব্রুয়ারী কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সমাবর্ত্তন উৎসবে শ্রীমতী বীণা দাস বাংলার গভর্ণর স্যার ষ্টানলি জ্যাকসনকে গুলি করেন। লাটসাহেব অনাহত থাকিয়া যান।

যখনই ত্রৈলোক্যনাথ প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্য দিয়া

যান তখনই পারিপার্শ্বিক শোভার দিকে মুগ্ধনেত্রে তাকাইয়া থাকেন। ট্রেন হইতে মালাবারের নৈসর্গিক দৃশ্য দেখিয়া তন্ময় হইয়া পড়েন। দেশকে তিনি অন্তর দিয়া ভালবাসিয়াছেন বলিয়াই শুধু দেশের মানুষকেই নয় দেশের অরণ্য, পর্ব্বত, নদী, প্রান্তর তাঁহাকে সমান ভাবে উদ্বেলিত করে; দেশের আচার আচরণ, ভাব ও ভাষা তাঁহাকে আকর্ষণ করে; দেশের সঙ্গীত দেশের সাধনা তাঁহাকে সমাহিত করে, দেশের ঐতিহ্য তাঁহাকে চলার পথ দেখায়, ইতিহাস তাঁহাকে চলার শক্তি দেয়। মন্দিরের সন্ধ্যারতির শঙ্খঘণ্টার মন্দ্রিতনিনাদ মস্‌জিদের, প্রভাতী আজানের সুদূরপ্রসারিত বিলম্বিত সুর তাঁহাকে ভাবগম্ভীর করিয়া তোলে। পথের বাঁকে দিগন্ত-রেখায় অজ্ঞাত, অবজ্ঞাত গ্রামের ছবি মনকে নাড়া দেয়। দেশকে সার্ব্বিক রূপে ভালবাসেন বলিয়াই মাটির দিকে সতৃষ্ণ নয়নে তাকাইয়া থাকেন।

কন্নুর কারা আইন-অমান্যকারী বন্দীতে পরিপূর্ণ, কর্নাটকের নেতা সদাশিবরাও এবং মালাবারের নেতা রামন মেননের সহিত সবিশেষ সখ্যতা জন্মিল। ইতিমধ্যে দুইবার লাঠিচার্জ্জ হইয়া গেল। ত্রৈলোক্যনাথকে সরকার এমনিই ভাল চক্ষে দেখেন না। কারাগারে তাঁহার আসার পর হইতেই নানারূপ উৎপাত সুরু হইয়াছে। তাই তাঁহার উপর নির্য্যাতন চলে।

"জেল কর্ত্তৃপক্ষ নির্বুদ্ধিতাবশতঃ সঞ্জীবনী পত্রিকা দেওয়া বন্ধ করিলেন, যদিও ইহা গভর্ণমেণ্টের দ্বারা অনুমোদিত ছিল। এখন সুযোগ ঘটিল, সঞ্জীবনী পত্রিকা বন্ধ করার জন্য এবং জেলখানায় আইন অমান্যকারীদের উপর যে সমস্ত অত্যাচার হইয়াছে তাহা উল্লেখ করিয়া গভর্ণমেণ্টের নিকট একখানা দরখাস্ত করিলাম।"

সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের ঘরে ডাক পড়ে। সাহেব বসিতে চেয়ার না দিয়া মুখ বিকৃত করিয়া উদ্ধত স্বরে দরখাস্তের জন্য ত্রৈলোক্যনাথকে

তিরস্কার সুরু করিলে পাল্টা ধমক দিয়া ত্রৈলোক্যনাথ জানাইয়া দিলেন—তিনি তিন আইনের বন্দী, সাধারণ কয়েদী নহেন—তাই বসিবার চেয়ার দেওয়া সাহেবের মর্জ্জি নহে আইনতঃ বাধ্য একথাটা কথা আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে মনে রাখিতে হইবে। পরে চেয়ার দিলে ত্রৈলোক্যনাথ না বসিয়া ও কোন কথার জবাব না দিয়া চলিয়া গেলেন।

নিজ চত্বরে ফিরিয়া দরখাস্ত মারফৎ ভারত সরকারকে জানাইয়া দিলেন, জেল কর্ত্তৃপক্ষের নানা অত্যাচারের প্রতিবাদে তিনি অনশন আরম্ভ করিতেছেন। চৌষট্টি দিনের অনশনে যতীন দাসের দেহান্ত হইয়াছে। সরকার আজকাল অনশনকে মনে মনে ভয় করেন। তারপর অনশনব্রতী স্বয়ং ত্রৈলোক্যনাথ। জেল কর্ত্তৃপক্ষের অনুরোধ বিফল হইল, বেসরকারী জেল পরিদর্শক রাও সাহেব আসিলেন। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট স্বকীয় অপরাধ স্খালনের জন্য মিথ্যার আশ্রয় লইলেন। ত্রৈলোক্যনাথ নাকি ছাতা খুলিয়া সাহেবের দোতলায় আফিস ঘরে প্রবেশ করেন এবং তাঁহাকে ছাতা বাহিরে রাখিয়া আসিতে বলিলে তিনি রাজী হন না ও কটূক্তি করেন। ইহাই সাহেবের অভিযোগ। ত্রৈলোক্যনাথ তীব্র ভাষায় আপত্তি জানান।

ইহার পর আসিলেন জজ্জ সাহেব; তাহার পর আসেন ম্যাজিষ্ট্রেট্। একই অভিযোগ। সরকার আপন কর্ম্মচারীর কথা বিশ্বাস করিলেন। সবাই অনুসন্ধান করিলেন, বক্তব্য শুনিলেন কিন্তু রিপোর্ট দিলেন ত্রৈলোক্যনাথ দোষী। সরকারের বিশ্বাস রাজদ্রোহীরাই মিথ্যা কথা বলে। তাহার উপর রাজকর্ম্মচারীরা তাঁহাদের স্বদেশ-সম্ভূত—বিলাতী সাহেব। মিথ্যা ভাষণ! তোবা-তোবা অসম্ভব। তাই অণৃত-ভাষণ চামড়ার গুণে সত্যে পরিণত হয়।

ত্রৈলোক্যনাথের বক্তব্য—"গভর্ণমেণ্ট যদি প্রকৃত ঘটনা জানার চেষ্টা করিতেন এবং অপরাধী সরকারী কর্ম্মচারীকে শাস্তি দিতেন, তবে গভর্ণমেণ্টের কোন ক্ষতি হইত না পরন্তু বিদ্বেষ-বহ্নিও দেশে এতটা প্রবল হইত না।"

১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে গ্রেপ্তারের পর ল্যোমান সাহেবকে কথা প্রসঙ্গে ত্রৈলোক্যনাথ বলিয়াছিলেন "দেশে অশান্তির সৃষ্টি আপনারাই করাইতেছেন। সরকারী কর্ম্মচারী মিথ্যা মামলা সাজাইয়া, নিরীহ লোকের উপর অত্যাচার করিয়া দেশে অশান্তির বীজ ছড়াইতেছে।"

অনশনব্রতী ত্রৈলোক্যনাথ প্রথম প্রথম শুধু কয়েক গ্লাস জল পান করিতেছেন। শেষের দিকে জল পানের ইচ্ছা প্রশমিত হইয়া আসে। এই ভাবেই পক্ষকাল কাটিয়া গেল। সরকারের নির্দ্দেশ, অজ্ঞান না হওয়া পর্য্যন্ত যেন জোর পূর্ব্বক খাওয়ান না হয়। দ্বিতীয়বার ভুল করিতে ইংরাজ সরকার আর রাজী নহে। শ্বেতাঙ্গ অফিসার অনশন ভঙ্গের সর্ত্ত জানিতে চাহেন। ত্রৈলোক্য-নাথের সর্ত্ত—"কংগ্রেসী বন্দীদের উপর যদি অত্যাচার বন্ধ হয় এবং তাহাদের খাওয়ার ব্যবস্থা ভাল হয়—অর্থাৎ কারা-কর্ত্তৃপক্ষ যদি বেশী চুরি না করে—তবেই আমি অনশন ভঙ্গ করিতে পারি।"

অচিরে তিরুচিরপল্লী কারাগারে ত্রৈলোক্যনাথকে যাইতে হইল। রবীন্দ্রমোহন সেন ও রমেশ আচার্য্য মাদ্রাজ হইতে সেখানে আসিলেন, প্রতুলচন্দ্র গাঙ্গুলী সেই স্থানেই ছিলেন। চারিজন আবার একত্রিত হইলেন। দুই বৎসর অবস্থানের পর পুনরায় ভেল্লুর কারাগারে পাঠান হইল। দক্ষিণ ভারত অপেক্ষাকৃত শান্ত থাকায় ইংরাজ সরকার বাংলার বিপ্লবী নেতাদের দক্ষিণ ভারতে প্রেরণ করেন, কিন্তু সাগ্নিক বিপ্লবী ত্রৈলোক্যনাথ যে অগ্নি নিজের অন্তরে বহন করিয়া চলেন তাহার স্পর্শে আশে পাশের মানুষ অগ্নি-শুদ্ধ হইয়া উঠে।

১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই ডিসেম্বর বিপ্লবী নারী শান্তি ঘোষ ও সুনীতি চৌধুরী কুমিল্লার জেলা-শাসক মিঃ স্টীভেন্সকে গুলি করিয়া হত্যা করিলেন। রাজপুরুষদের উপর আক্রমণ অব্যাহত থাকে।

মাদ্রাজে বিভিন্ন বৈপ্লবিক কর্ম্ম প্রচেষ্টার পরিপ্রেক্ষিতে বিলাতের পার্লামেন্টে আর্ল উইনটারটন প্রশ্ন করেন—বাঙ্গালী বিপ্লবীদের মাদ্রাজের জেলে পাঠান হয় কেন? মাদ্রাজ বৈপ্লবিক আন্দোলন হইতে মুক্ত ছিল। মাদ্রাজ ষড়যন্ত্র মামলার আসামী তাহার সাক্ষ্যে বলিয়াছে—সেখানকার কারাগারে ত্রৈলোক্যনাথ ও প্রতুলচন্দ্র তাহাকে বিপ্লবী দলভুক্ত করেন।

আইন অমান্যকারী বন্দীদের সবাই মুক্ত। কংগ্রেস ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে বিভিন্ন প্রদেশে মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করিয়াছে। মাদ্রাজ প্রদেশে-ও কংগ্রেসী সরকার—চক্রবর্ত্তী রাজা গোপালাচারী তদানীন্তন প্রাদেশিক প্রধান মন্ত্রী। কন্নমুর কারাগারে সহবন্দী মালাবার নেতা শ্রীরামন মেননও কংগ্রেস সরকারের একজন মন্ত্রী, কারা ও আদালত সমূহ তাঁহার অধীন। ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে তিনি ভেল্লুর কারাগার পরিদর্শনে আসিলেন। জেলা শাসক, পুলিশ-অধিকর্ত্তা পথ দেখাইয়া লইয়া আসিতেছেন। কিছুদিন পূর্ব্বেও যিনি এখানে বন্দী ছিলেন। আজ উচ্চপদাসীন রাজ কর্ম্মচারীর দল তাঁহাকে সেলাম করিতেছে। ত্রৈলোক্যনাথ ইতিহাসের রসিকতায় মনে মনে হাসেন। তখন ত্রৈলোক্যনাথের সর্ব্বসাকুল্যে চব্বিশ বৎসর কারাবাস হইয়া গিয়াছে। বাঙলা, মাদ্রাজ ও ব্রহ্মদেশের বিভিন্ন কারার সহিত পরিচয় ঘটিয়াছে। সাধারণ কয়েদী হিসাবে, বিশেষ শ্রেণীর কয়েদী-রূপে, আটকবন্দী, রাজবন্দী ও অন্তরীণাবদ্ধ বন্দী হিসাবে সকল অভিজ্ঞতাই সঞ্চয় করিয়াছেন। বেত ছাড়া কারার সব

সাজাই ভোগ করিয়াছেন। কারাধ্যক্ষ হইতে সাধারণ কয়েদী পর্য্যন্ত সকলের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিশিয়াছেন। কারাগারে কি ভাবে কি হয় সবই জানেন। ত্রৈলোক্যনাথ ভারতীয় কারা-জীবনের অভিজ্ঞতার মূর্ত্ত প্রতীক। তাই স্থির করিলেন, কারা-সংস্কার সম্বন্ধে লিখিবেন। প্রাদেশিক শাসন কংগ্রেসের হাতে—কারা সংস্কারের প্রশ্ন উঠিতে পারে। কারার উৎপত্তি ও বিকাশ হইতে সুরু করিয়া লোকে কেন অপরাধ করে, কারার সাধারণ অবস্থা, কারা-কর্ম্মচারীরা কিভাবে চুরি করে, কয়েদীদের উপর কিভাবে কি জন্য নির্যাতন করে, গভর্ণমেণ্ট কিরূপে সংবাদ পান, কারাগারে যুবক বালক ও মেয়ে কয়েদীদের অবস্থা কিরূপ সকল তথ্যই ত্রৈলোক্যনাথ সন্নিবেশিত করিলেন। উপসংহারে কিভাবে কারা-সংস্কার বাঞ্ছনীয় তাহাও মন্তব্য করিলেন। বড় বড় কমিশন বসাইয়া সরকার যে কাজ করিবার মনস্থ করেন এবং উপর হইতে শুনিয়া ও দেখিয়া রিপোর্ট পড়িয়া যে সুপারিশ নথিভুক্ত হয় ত্রৈলোক্যনাথ তাহাই আপন অভিজ্ঞতার আলোকে একক প্রচেষ্টায় বিশদভাবে উপস্থাপিত করিলেন। প্রবাসীতে ছাপিবার জন্য রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় রিপোর্টটী লইয়াছিলেন ও ত্রৈলোক্যনাথকে বিজ্ঞানসম্মত ধারায় সেগুলি সাজাইয়া দিতে অনুরোধ জানাইলেন। ত্রৈলোক্যনাথের সময় মিলিল না, উপরন্তু কয়েক মাস পরেই আবার ধৃত হইলেন। কারাগারে থাকিতেই রামানন্দবাবুর মৃত্যু হইল। লেখা আর ছাপা হইল না, ত্রৈলোক্যনাথও সে লেখার আর সন্ধান করিয়া উঠিতে পারিলেন না। ইতিহাসের চাকা বড় দ্রুতগতিতে ঘুরিয়া গেল।

অন্যান্যদের সহিত ত্রৈলোক্যনাথও হিজলী বন্দীনিবাসে স্থানান্তরিত হইলেন। ষোলজন রাজবন্দী ভারতের বিভিন্ন কারাগার হইতে হিজলীতে একত্রিত হইলেন। মৃত্যু-নীরব হিজলী মুখর

হইল। দক্ষিণ ভারতে ত্রৈলোক্যনাথ বন্দী থাকাকালে, বাঙলায় অচিন্তনীয় ঘটনা ঘটিয়া চলে।

জেলা বোর্ডের মিটিঙে সভাপতিত্ব করিবার সময় মেদিনীপুরের দ্বিতীয় শ্বেতাঙ্গ জেলাশাসক মিঃ ড্যাগ্‌লাস ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে এপ্রিল প্রদ্যোৎ ভট্টাচার্য্য ও প্রভাংশু শেখর পালের হাতে নিহত হইলেন। এত অত্যাচার সত্ত্বেও বিপ্লবীদের মেরুদণ্ড ভাঙিল না। এত সর্তকতা সত্ত্বেও বিপ্লবীরা জেলার সর্ব্বোচ্চ শাসকের সম্মুখে আসিল। পুলিশ উদ্‌ভ্রান্ত।

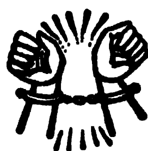
পরের বৎসর আবার সেই মেদিনীপুরেই ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দের ২রা সেপ্টেম্বর ফুটবল খেলার মাঠে তৃতীয় শ্বেতাঙ্গ জেলাশাসক মিঃ বার্জকে কয়েকজন বন্ধুসহ অনাথবন্ধু পাঁজা ও মৃগেন্দ্রনাথ দত্ত আক্রমণ করিলে বার্জ সাহেব নিহত হইলেন। পরপর তিন বার। সমগ্র দেশ বিপ্লবীদের সাহস ও সংগঠনে অন্তরে উৎফুল্ল। ইংরাজ রাজশক্তি বিমূঢ় ও বিস্মিত ; শ্বেতাঙ্গ রাজকর্ম্মচারীর দল সন্ত্রস্ত ও ভয় বিহ্বল।

বাঙলায়ও তখন প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন। কৃষক প্রজা দলের প্রধান শের-ই-বাঙ্গাল জনাব ফজলুল হক তখন প্রধান মন্ত্রী। মুসলিম লীগের বাঙলার অধিনায়ক স্যার নাজিমুদ্দীন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী। অর্থমন্ত্রী নলিনীরঞ্জন সরকার মহাশয় একদিন বহুফল, সন্দেশ, নানারূপ শাকসব্জী ও মাছ লইয়া বিপ্লবীদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন। মন্ত্রী ও বিপ্লবীরা একত্রে ভোজন সমাধা করিলেন। সারাদিন নানা আলোচনা হইল। তাহার পর আসিলেন স্বয়ং নাজিমুদ্দীন সাহেব।

সারাদিন একসঙ্গে কাটাইয়া বিপ্লবীদের সহিত মধ্যাহ্ন ভোজন সমাপন করিয়া দিনান্তে কলিকাতা প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। তাহার পর ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়, সরোজিনী নাইডু ও কিরণশঙ্কর রায় একে

একে আসিলেন। সর্ব্বশেষে আসিলেন, মহাত্মা গান্ধী। দুই ঘণ্টার মধ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেও প্রতিশ্রুতি দিলেন আবার আসিবেন ও তিন দিন অবস্থান করিবেন। বিপ্লবীরা হিংসার রাজনীতি পরিত্যাগ করিয়া অহিংসায় বিশ্বাস করে কিনা তাহাই জানিতে চাহিলেন। তিনি স্পষ্ট করিয়াই জানাইলেন—"If Bengal pledges non-violence, I shall dig my grave in the soil of Bengal." অঙ্গীকারানুযায়ী গান্ধীজী হিজলী আসিতে না পারিলেও তাঁহার সহিত দ্বিতীয়বার সাক্ষাতের আয়োজন হইল কলিকাতার প্রেসিডেন্সী জেলে। বিপ্লবীরা কলিকাতায় আনীত হইলেন। মহাত্মাজীকে বিপ্লবীরা শ্রদ্ধার সহিত জানাইলেন—তিনি যেন আমাদের মুক্তির জন্য চেষ্টা না করিয়া যাঁহারা দণ্ডিত হইয়াছেন তাঁহাদের মুক্তির জন্য চেষ্টা করেন।

আবার হিজলী জেলে প্রত্যাবর্ত্তনের পর ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে বিনা বিচারে আটক সকল বন্দীই মুক্তিলাভ করিলেন। ত্রৈলোক্যনাথও কারাগার হইতে বাহিরে আসিলেন।



হরিপুরা কংগ্রেসের সভাপতি সুভাষচন্দ্র আসন্ন ত্রিপুরী কংগ্রেসের সভাপতিপদে পুনর্নির্ব্বাচিত হইবার জন্য মহাত্মাগান্ধী ও তাঁহার অনুসরণকারীগণের সমর্থন পাইলেন না।

সুভাষচন্দ্রের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী ও মানসিকতা ও গান্ধীজীর

মানসিকতা ও দৃষ্টিভঙ্গীতে বৈপরীত্য প্রকটিত হইয়া উঠিয়াছে। ক্ষাত্রবৃত্তি সম্পন্ন সুভাষচন্দ্র বাস্তবধর্ম্মী রাজনীতিতে বিশ্বাসী, তাই শত্রুর শত্রুকে মিত্র বলিয়া গ্রহণ করিতে সমুদ্যত আর বিশ্বাস করেন শত্রুর দুঃসময়ই আপন কার্য্য সমাধানের পরম লগ্ন, পরন্তু সেই শত্রু যদি শক্তিধর ও পরপীড়ক হয় তবে এটাই হইবে চরম আঘাত হানার উপযুক্ত সুযোগ।

ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্র এই শিক্ষাই দিয়াছে। সর্ব্বমতাদর্শের সারাৎসার ভারতীয় ঐতিহ্যের শাশ্বত ধারক-গীতার উদ্গাতা পার্থসারথি কৃষ্ণও যুদ্ধকালে রথচক্রগ্রস্ত নিরস্ত্র কর্ণের উপর অস্ত্র প্রয়োগ করিতেই অর্জ্জুনকে শুধু উদ্বুদ্ধ করেন নাই পরন্তু জানাইয়া দিলেন এটাই চরম লগ্ন—হয় মার, নয় মর; সুযোগ বারবার আসে না।

তাই সুভাষচন্দ্র য়ুরোপের ঘনায়মান অন্ধকারের পরিপ্রেক্ষিতে, অবশ্যম্ভাবী দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সংঘটনের পটভূমিকায় ব্রিটিশ রাজ-শক্তিকে চরম পত্রদানের একান্ত পক্ষপাতী।

নবজাগ্রত বহুবলধারী একনায়ক-নিয়ন্ত্রিত জার্ম্মাণ রাষ্ট্রশক্তির সম্মুখীন হইতে হইলে ভারতবর্ষকে শান্ত রাখিতে হইবে; ভারতের লোকবল ও অর্থবল না পাইলে যুদ্ধজয়ের সম্ভাবনাই শুধু সুদূর পরাহত নহে আত্মবিলুপ্তিও অস্বাভাবিক নয়।

কিন্তু গান্ধীজীর মানসিকতা ও দৃষ্টিভঙ্গী বিপরীত। শত্রুর দুঃসময়ে তিনি আপন অভীষ্ট সাধনের সুযোগ লইতে কুণ্ঠিত। তাঁহার নিকট গন্তব্যস্থল পথ হইতে প্রেয় নয়। একটী লক্ষ্য অপরটী উপলক্ষ্য নহে—দুইটীই সমান সাধ্য। 'মারি অরি পারি যে কৌশলে' এই নীতি তাঁহার নিকট সর্ব্বতোভাবে পরিত্যজ্য। তাই পথ-পরিবর্ত্তনে তিনি নিস্পৃহ। সুভাষচন্দ্রের রাজনৈতিক চেতনাকে সর্ব্বব্যাপ্ত না হইতে দিতে গান্ধীজী বদ্ধপরিকর হইয়া

ডাঃ পট্টভি সীতারামিয়াকে সভাপতি পদের জন্য মনোনয়ন দিলেন। ডাঃ সীতরামিয়ার পরাজয়ে তিনি অকপটে স্বীকার করিলেন—'তাঁহার পরাজয়ে আমারই পরাজয়'।

অটল সুভাষচন্দ্র গান্ধীজীর বিরূপতা ও গান্ধী-মতানুবর্ত্তী তদানীন্তন সর্ব্বভারতীয় কংগ্রেস নেতাদের বিরুদ্ধতা সত্ত্বেও সভাপতি পদের জন্য নিজেকে প্রতিষ্ঠিত রাখিলেন। ভারতব্যাপী বিপুল উত্তেজনা। আবার প্রবীন ও নবীনে সংঘাত জাগিল। আসমুদ্র হিমাচলের জাগ্রত চেতনা উদ্বেল হইয়া পড়িল। বাঙলা তথা ভারতের বিপ্লবী সত্তা সুভাষচন্দ্রের মধ্যে আপন সত্তার প্রতিচ্ছবি দেখিল। সুভাষচন্দ্রের সমর্থনে আগাইয়া আসিল।

মহারাজের ভাষায়—"স্থির হইল সুভাষবাবুর নেতৃত্বে ভারতে বিপ্লবের ব্যবস্থা হইবে।……কংগ্রেস নেতারা ভাবিলেন, প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ইংরাজের সহিত সহযোগিতার দ্বারা কিছু পাওয়া যায় নাই, এ যাত্রা একটু শক্ত হইবেন, কিছু চাপ দিবেন। আগে কিছু না দিলে সহযোগিতা করিবেন না।"

রক্তস্নানে আত্মশুদ্ধি না করিলে প্রকৃত স্বাধীনতা আসে না—এ সত্য সুভাষচন্দ্র ও বিপ্লবীরা ধ্রুব সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। "তাঁহারা জানিতেন আপোষে দেশের স্বাধীনতা আসে না, সংগ্রাম দ্বারাই স্বাধীনতা অর্জ্জন করিতে হয়।"

এই অবস্থায় সর্ব্বভারতীয় বিপ্লবী চেতনা ও তারুণ্য প্রদীপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করিল, আপোষ নয়—অধিকার প্রতিষ্ঠা ও সংগ্রামই হইবে ভারতের আগামী দিনের রাজনীতি। আপোষ-বিরোধী আন্দোলন সুরু হইল। পুরোধা সভাপতি সুভাষচন্দ্র। বিপ্লবীরাও আগাইয়া আসেন।

"তাই কংগ্রেস নেতারা তাঁহাকে সহ্য করিতে পারিলেন না। দেশব্যাপী সুভাষবাবুর জনপ্রিয়তা থাকা সত্ত্বেও কংগ্রেস

নেতাদের অপকৌশলের ফলে সুভাষবাবু পদত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন।"

সেদিনের মানসিকতা ত্রৈলোক্যনাথ তাঁহার আত্মজীবনীতে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন—"অনুশীলন সমিতির নেতারা ভাবিয়াছিলেন দেশব্যাপী গণ-আন্দোলন সুরু করিতে পারিলে সময়ে ইহাকেই সশস্ত্র বিপ্লব-আন্দোলনে পরিণত করা যাইবে। অনুশীলন সমিতির মধ্যে এরূপ কোন নেতা ছিলেন না যিনি সমগ্র ভারতবর্ষে পরিচিত। সমগ্র ভারতব্যাপী খ্যাতি না থাকিলে সমগ্র ভারতবর্ষে বিপ্লবের নেতৃত্ব চলে না। সুভাষবাবুর সেই খ্যাতি ছিল, তাই অনুশীলন সমিতির নেতারা সুভাষবাবুকে সম্মুখে রাখিয়া ভারতব্যাপী বিপ্লবের আয়োজন করিতে লাগিল। সুভাষবাবু কংগ্রেস হইতে বিতাড়িত হইয়া ফরোয়ার্ড ব্লক নামে নূতন দল করিলেন এবং সমস্ত বিপ্লবীদল ও কর্ম্মীদিগকে একত্র করার চেষ্টা করিলেন। ···স্থির হইল রামগড়ে আপোষ-বিরোধী কন্‌ফারেন্স হইবে। রামগড় কন্‌ফারেন্সে বিভিন্ন প্রদেশের বিপ্লবী নেতাদিগকে একত্র করা হইবে স্থির হইল।"

সমগ্র ভারত জুড়িয়া এই আপোষ-বিরোধী মনোভাব জাগ্রত করিতে সুভাষচন্দ্র ভারত পরিক্রমায় বাহির হইলেন। পাঞ্জাব ও উত্তর প্রদেশ পরিভ্রমণে ত্রৈলোক্যনাথ সুভাষচন্দ্রের সহচর।

১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম পাদে দিল্লী ছাত্র কন্‌ফারেন্সের সভাপতিত্ব করিতে সুভাষচন্দ্র দিল্লীতে উপস্থিত। ত্রৈলোক্যনাথ সুভাষচন্দ্রের আমন্ত্রণে দিল্লীর পথে পা বাড়াইলেন। গুপ্তচর অনুসরণ করিল। কাশীতে যাত্রা ভঙ্গ করিলেন কিন্তু গুপ্তচর সঙ্গ ছাড়ে না। লক্ষ্ণৌ যাইবার সময় ফৈজাবাদ ষ্টেশনে গুপ্তচর ত্রৈলোক্যনাথের গতিপথ হারাইয়া ফেলে।

দৃষ্টিমুক্ত হইয়া ত্রৈলোক্যনাথ অগ্রসর হইয়া যান।

শঙ্কর দয়ালের গৃহে ফরোয়ার্ড ব্লকের কমিটি মিটিং। পাঞ্জাবের ডাঃ সত্য পাল, সীমান্ত প্রদেশের নেতা আকবর শাহ প্রভৃতি অনেকে উপস্থিত।

"সুভাষবাবু যাহাদের বিপ্লব দলে টানা যাইতে পারে মনে করিতেন, তিনি আমার উচ্চ প্রশংসা করিয়া আমার সহিত তাঁহাদের পরিচয় করাইয়া দিতেন এবং একান্তে বলিতেন, ইহার সহিত খুব ভাব করিয়া লউন। সীমান্ত প্রদেশের নেতা আকবর শাহ সম্বন্ধে বলিলেন, ইনি খুব ভাল লোক, আপনি এঁকে দলে টানিয়া আনুন।"

সুভাষবাবুর ইঙ্গিতে শঙ্করলালের গৃহে একই কক্ষে আকবর শাহের সহিত ত্রৈলোক্যনাথের থাকিবার স্থান নির্দ্দিষ্ট হইল।

সরল, স্বদেশ প্রেমিক ও নির্ভীক এবং সর্ব্বোপরি সুভাষচন্দ্রের অন্ধভক্ত আকবর শাহের সহিত অচিরে ত্রৈলোক্যনাথের হৃদ্যতা জন্মিল। বিপ্লবীরা স্থির করিলেন প্রথম বিশ্বযুদ্ধের মত সৈন্যদের হাত করিবার প্রয়াস না করিয়া সমাগত বিশ্বযুদ্ধে দেশব্যাপী পুলিশী শক্তির সহিত যোগাযোগ স্থাপন করিতে হইবে। আকবরশাহের সহিত বর্ত্তমান পরিস্থিতি ও ভবিষ্যৎ কর্ম্মপন্থা লইয়া নানা আলোচনা হয়। কথায় কথায় ত্রৈলোক্যনাথ জানিতে চাহেন—যদি কোন লোক আফগানিস্থানের ভিতর দিয়া ভারতের বাহিরে যাইতে চান ত তিনি সে ব্যবস্থা করিয়া দিতে পারেন কিনা?

আকবরশাহের উত্তর--দোভাষীর সাহায্যে সে ব্যবস্থা করা যাইতে পারিবে। তিনি আরও জানান—পায়ে হাঁটা খুবই কষ্টকর, সময়ও লাগে অনেক; ঘোড়া থাকিলে সহজ হইবে তবে টাকা কিছু বেশী খরচ হইবে। সুভাষচন্দ্রের নির্দ্দেশে এ প্রশ্ন ভবিষ্যতের জন্য তথ্য সংগ্রহ না ত্রৈলোক্যনাথের নিজের মনোবাঞ্ছা, তাহা অজ্ঞাতই রহিয়া গেল।

গুপ্তচরের নজরমুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ পাঞ্জাব ও উত্তর প্রদেশ ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। বহু পুরাতন বিপ্লবীদের সহিত যোগাযোগ করিতেছেন। স্থির হইল রামগড় কনফারেন্সের পর বৈপ্লবিক কার্য্য পরিচালনার সময় আত্মগোপন করিলে ধনী ব্যবসায়ী চৌধুরী বেগ্‌গামল ত্রৈলোক্যনাথের নিরাপদ আশ্রয়ের ব্যবস্থা করিয়া দিবেন। চৌধুরীজী একজন মার্শাল ল কেসের দণ্ডিত আসামী ও আন্দামান ফেরত।

রাসবিহারী বসু ও শচীন্দ্রনাথ সান্যালের সহকর্ম্মী, লাহোর ষড়যন্ত্র মামলায় যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরে দণ্ডিত, আন্দামান কারাগারে ত্রৈলোক্যনাথের পরম সুহৃৎ, বর্ত্তমানে পাঞ্জাব শাসন পরিষদের সদস্য বাবারুর সিংয়ের সহিত আলোচনাকালে ত্রৈলোক্যনাথ জানাইলেন, "সুভাষবাবুর সহিত স্থির হইয়াছে, এখন সশস্ত্র বিপ্লবের ব্যবস্থা করিতে হইবে। এখন সুভাষবাবুই আমাদের নেতা। আপনার এখন শিখ সৈন্যদিগকে দলভুক্ত করিতে হইবে।"

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সমর আমেরিকা-প্রত্যাগত "কোমাগাটামারু" জাহাজের বিশিষ্ট বীর, রাসবিহারীর সহকর্ম্মী, সশস্ত্র বিপ্লবের অন্যতম উদ্যোক্তা, আন্দামান কারাজীবনে বহু অত্যাচার ও নির্য্যাতনের শিকার পণ্ডিত পরমানন্দের সহিত মিলিত হইতে ত্রৈলোক্যনাথ লাহোর ছাড়িয়া হামিরপুর জেলার রথ গ্রামে উপস্থিত। দুজনেই দুজনকে দেখিয়া পরিতৃপ্ত। ত্রৈলোক্যনাথ বর্ত্তমান পরিস্থিতি ও আসন্ন কর্ম্মপন্থা লইয়া বিশদ আলোচনান্তে জানাইলেন, 'এখন পূর্ব্ব-অভিজ্ঞতা লইয়া কাজে লাগিয়া যাও, রাজপুত ও অন্যান্য রেজিমেণ্ট হাত করার ব্যবস্থা কর।"

সেখান হইতে নাগপুর। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা ও অধিনায়ক শ্রীকেশব হেডগেওয়ার ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায়

ন্যাশানাল মেডিকেল কলেজে অধ্যয়ন কালে সতীর্থ শ্রীনলিনী কিশোর গুহের সংস্পর্শে আসেন ও অনুশীলন সমিতির সভ্য মনোনীত হন। পলাতক অবস্থায় ত্রৈলোক্যনাথ তাঁহাদের ছাত্রাবাসে বারকয়েক আত্মগোপন করিয়াছিলেন। নাগপুরে তাঁহার গৃহে হঠাৎ উপস্থিত হইয়া ত্রৈলোক্যনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন 'কালীচরণদার কথা মনে আছে ?' বিস্ময়ের ভাব কাটিয়া গেলে উৎফুল্ল হেড্‌গেওয়ার ত্রৈলোক্যনাথকে জড়াইয়া ধরিলেন।

ত্রৈলোক্যনাথের প্রশ্ন—"আপনার ভলেন্টিয়ার বাহিনীর সভ্য সংখ্যা কত ?"

উত্তর—"ষাট হাজার"।

"এই ষাট হাজার স্বয়ং সেবক বাহিনী লইয়া আপনাকে আসন্ন বিপ্লবে ঝাঁপাইয়া পড়িতে হইবে।"

হেড্‌ গেওয়ার জবাবে জানান—"এই ষাট হাজার ভলেন্টিয়ারের মধ্যে বহু অল্প বয়সী ছেলে আছে, বিশেষত আমি সেভাবে তাঁহাদের গড়িয়া তুলি নাই। আপনারা এতদিন আমার কোন খোঁজ-খবর লন নাই, আজ হঠাৎ বলিলেন, ঝাঁপাইয়া পড়িতে হইবে, ইহা কিরূপে সম্ভব।"

ত্রৈলোক্যনাথ বর্ত্তমান পরিস্থিতি সবিশেষ বর্ণনা করেন ও সুভাষচন্দ্রের সকল কথাই আলোচনা করেন। পরিশেষে আহ্বান জানান—"এরূপ সুবর্ণ সুযোগ আর আমাদের জীবনে আসিবে না, এই মহাযুদ্ধের সুযোগ আমাদের গ্রহণ করিতে হইবে।" নাগপুরে হেড্‌গেওয়ারের আর একটী গৃহে ত্রৈলোক্যনাথ অতিথি হইয়া রহিলেন।

হিন্দুমহাসভার অন্যতম নেতা ও বীর সভারকারের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা গণেশ দামোদর সভারকার তখন কাশীবাসী। আন্দামানে দুজনেই একসঙ্গে ছিলেন এবং বর্ষীয়ান নেতাকে 'গণেশদা' বলিয়া ডাকিতেন।

গণেশদাকে আসন্ন রূপরেখা বর্ণনা করিয়া ত্রৈলোক্যনাথ হিন্দু মহাসভার সহযোগিতা কামনা করিলেন।

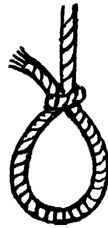
গনেশ দামোদর বলেন, "গাড়ী ছাড়িয়া দিয়াছে, এখন গাড়ীর পিছনে খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে দৌড়িয়া কোন লাভ আছে কি? সময় চলিয়া গিয়াছে এখন বৃথা চেষ্টা করিয়া কোন লাভ নাই!" শচীন্দ্রনাথের সহিত সাক্ষাৎ। আসন্ন বিপ্লবের আহ্বানে তিনি গৃহত্যাগ করিতে প্রস্তুত একথা জানাইয়া দিলেন।

ত্রৈলোক্যনাথ লিখিতেছেন—"অনুশীলন সমিতির নেতারা প্রধান কর্ম্মীদিগকে নির্দ্দেশ দিলেন, বন্দুক পিস্তল যেখানে যাহা পাওয়া যায় দাম যাহা হউক সংগ্রহ করিতে হইবে। আমি যখন দিল্লী ছিলাম সুভাষবাবুও তখন দিল্লী ছিলেন, দিল্লীতে আমাদের ভার প্রাপ্ত কর্ম্মী সুশীল ভট্টাচার্য্য আমাকে বলিলেন, দিল্লী ফোর্ট হইতে বন্দুক পিস্তল সংগ্রহ করা যায়, যদি কিছু অর্থ ব্যয় করিতে পারেন। আমি সুভাষবাবুকে এই সংবাদ দিলাম এবং জিজ্ঞাসা করিলাম, কত টাকা দিতে পারবেন? সুভাষবাবু বলিলেন, এখন দশ হাজার টাকা দিতে পারিব পরে আরও দিব। আমি স্থির করিলাম আমি দিল্লীতে থাকিয়া এই মাল সংগ্রহের ব্যবস্থা করিব। সুশীল একটী বাট্‌-পাড়ের পাল্লায় পড়িয়াছিল, তাই এই প্রয়াস সফল হয় নাই।"

উত্তর প্রদেশ ও পাঞ্জাব পরিভ্রমণান্তে ত্রৈলোক্যনাথ কলিকাতা আসিয়া সুভাষচন্দ্রকে সফরের সকল তথ্য জানাইলেন। পুলিশের সন্দেহ মুক্ত থাকিতে ত্রৈলোক্যনাথ কলিকাতা ও হাওড়ার কয়েকটী আপোষ-বিরোধী জনসভায় সভাপতিত্ব করিলেন। তাহার পর চট্টগ্রামের বন্দর, পর্ব্বত ও অরণ্যের গতি প্রকৃতি এবং বিভিন্ন পথ ও প্রান্তর সরজমিনে জানিবার জন্য ত্রৈলোক্যনাথ চট্টগ্রাম রওনা হইয়া যান।

আপন অভীষ্ট কর্ম্ম-পন্থা গোপন রাখিবার প্রয়াসে অন্তরালে

না থাকিয়া এখানেও প্রকাশ্য সভা ও সম্মেলনে উপস্থিত হন। জনসভার আবরণে বিভিন্ন স্থানে ঘুরিয়া বেড়ান। এতকাল উপেক্ষা করিলেও এইবার পুলিশ নিষ্ক্রিয় রহিল না। বে-আইনি জনসভায় অংশ গ্রহণকারী বলিয়া গ্রেপ্তার করিল। ত্রৈলোক্যনাথ ধৃত হইলেও বৈপ্লবিক কর্ম্মপ্রচেষ্টা ব্যাহত হইল না। সর্দ্দার নিরঞ্জন সিং তালিবের মাধ্যমে একটী শিখবাহিনীর প্রতিনিধি দল উৎসাহী হইয়া শ্রীরবীন্দ্রমোহন সেনের মারফৎ সুভাষচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করেন ও বিপ্লবী কর্ম্মধারার সহিত পরিচিত হন। ব্রিটীশ সরকারের সন্দেহ উদ্রিক্ত হওয়ায় অচিরে এই বাহিনীকে কলিকাতা হইতে স্থানান্তরিত করা হইল। কিছুদিনের মধ্যেই সুভাষচন্দ্র গ্রেপ্তার হইলেন। একে একে সকল বিপ্লবী নেতা ও কর্ম্মীরা ধৃত হইয়া কারান্তরালে প্রেরিত হইলেন। বৈপ্লবিক সংগঠনে ছেদ পড়িল।



ত্রৈলোক্যনাথ ও অপরাপর নেতৃবৃন্দের গ্রেপ্তারের পর চট্টগ্রামে সভা-সমিতি ও মিছিল নিষিদ্ধ এবং বে-আইনি ঘোষিত হইল। কঠোর হস্তে আইন-লঙ্ঘনকারীদের নির্য্যাতন চলিল। উদ্ধত যৌবন কোন বাধাই মানিতে রাজী নহে। দিনের পর দিন মিছিলের

উপর লাঠি চলে, সভাসমিতি পুলিশ ভাঙিয়া দেয়, লাঠি চালনায় বহু লোক হতাহত হয় তবুও উদ্দামতায় বাধা পড়ে না, দুর্ব্বার স্রোত স্তিমিত হয় না। যাহারা প্রয়োজন হইলে বন্দুক, বোমা ও পিস্তলের মাধ্যমে শত্রুর মোকাবিলায় কুণ্ঠিত নয়, প্রাণ লইয়া যাহারা প্রাণ দিতে অভ্যস্ত সেই বিপ্লবী তরুণের দল আজ একাগ্র নিষ্ঠায় নীরবে লাঠির আঘাত সহ্য করিয়া পথে পথে আগাইয়া চলে। অন্তরে অন্তরে ধূমায়মান বহ্নি প্রদীপ্ত হইয়া জ্বলিতে থাকে।

'করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে'র পূর্ব্বাভাষ চট্টগ্রামের পার্ব্বত্য প্রান্তরে, অরণ্যের মর্ম্মরে গুঞ্জরিত হইতে থাকে।

এক বৎসর বিনাশ্রম কারাবাসের পর ত্রৈলোক্যনাথ নিরাপত্তা বন্দীরূপে হিজলী বন্দীনিবাসে আসিলেন। রামগড় কন্‌ফারেন্সে উপস্থিত থাকিবার জন্য জামিনের আবেদন অগ্রাহ্য হইয়া গেল। কারা প্রাচীরের অন্তরালে দেহ থাকিলেও মন সেদিন রামগড়ে পড়িয়াছিল।

"১৯৪০ সালে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় নিরাপত্তা রক্ষার্থে যখন ব্যাপকভাবে দেশসেবকদের গ্রেপ্তার করিয়া সিকিউরিটী বন্দী হিসাবে জেলে পাঠাইয়া দেওয়া হয় তখন তাহাদের উপর সাধারণ কয়েদীদের মত ব্যবহার করা হইয়াছিল, পরে তাহাদিগকে দ্বিতীয় শ্রেণীর কয়েদীর অধিকার দেওয়া হয়। সিকিউরিটী বন্দীগণ ইহার প্রতিবাদস্বরূপ ১৯৪০ সালে নভেম্বর মাসে সুভাষবাবুর নেতৃত্বে প্রেসীডেন্সি জেলে অনশনব্রত অবলম্বন করেন। এই অনশন ব্রতের ফলে সিকিউরিটী বন্দীদের অবস্থার কিছু উন্নতি হয়।"

হিজলী বন্দীনিবাস হইতে ত্রৈলোক্যনাথ ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে স্থানান্তরিত হইলেন। এই সময় হইতে ধ্যানমগ্ন মহাকালের ধ্যানভঙ্গ হইল। ধ্যানস্তিমিত নয়ন, যত বেশী প্রখর ও রুদ্র হয় বিশ্ব-ইতিহাস তত বেশী সক্রিয় হইয়া উঠে। দিনের পর

দিন বিস্ময় ও বিমূঢ়তা বিশ্বমানবের অন্তর আশা নিরাশায় কাহাদের ও দোলায় আবার কাহাদেরও বা শঙ্কায় ত্রাসে সন্ত্রস্ত ও ভীতি-বিহ্বল করিয়া তুলে।

১৯৪১ সালের জানুয়ারী মাসে সুভাষচন্দ্র সদাসতর্ক অতন্দ্র ব্রিটিশ শক্তিকে ফাঁকি দিয়া আফগানিস্থানের পথে ভারত ত্যাগ করিয়া ইউরোপে পাড়ি দিলেন। প্রায় সমগ্র ইউরোপ তখন হিটলার বাহিনীর পদানত।

জাপান যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়া ইংরাজ ও অন্যান্য ইউরোপীয় অধিকৃত দক্ষিণপুর্ব্ব এশিয়ার দেশগুলি একে একে তড়িৎগতিতে অধিকার করিয়া লইল। আমেরিকাও বিশ্বরঙ্গমঞ্চে যুদ্ধের শরিক হইতে বাধ্য হইয়াছে। অনাক্রমণ চুক্তি লঙ্ঘন করিয়া জার্ম্মাণ-ক্ষাত্রশক্তি রাশিয়ার উপয় অতর্কিতে ঝাঁপাইয়া পড়িল। আফ্রিকার মরুপ্রান্তরে জার্ম্মাণ সমরাস্ত্রের ঘূর্ণাবর্ত্তে বালুর ঝড় উঠিল। দিকে দিকে সেদিন অক্ষশক্তির রণভেরী ইংরাজ রাজশক্তিকে আকুল ও আর্ত্ত করিয়া তুলিল। আকাশ যুদ্ধে পর্য্যুদস্ত ব্রিটীশ জাতি দিন ও রাত্রে সমভাবে মরণবিধ্বংসী বোমা ও পরিশেষে রকেটের নির্ভুল নিশানার মুখে নিরুপায় হইয়া মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করিয়া চলে।

সুভাষচন্দ্র নেতাজীরূপে দক্ষিণপূর্ব্ব এশিয়ায় বন্দিত হইলেন। সর্ব্বাধিনায়করূপে আজাদ হিন্দ ফৌজের কর্ত্তৃত্বভার লইয়া দিল্লীর পথে ভারতের মাটিতে পা রাখিলেন।

প্রতীক্ষারত রাসবিহারী যোগ্যপাত্রে ভার অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। কোহিমার সন্নিকটে ব্রিটীশ শক্তির সহিত নব-আদর্শে উদ্বুদ্ধ নূতন ভারতীয় বাহিনীর সংঘর্ষ ঘটিল।

'দিল্লী চলো'র বিদ্যুৎ বহ্নিতে সুপ্ত চেতনায় প্রাণ সঞ্চারিত হইল।

১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই আগষ্ট সমগ্র ভারতবর্ষ একই সঙ্গে বজ্র-নির্ঘোষে ঘোষণা করিল 'করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে'।

আজ বক্তৃতা নয়, প্রস্তাব নয়—ভারতবাসী উদ্ধত ভঙ্গিমায় যাহা কিছু শাসনের রূপরেখা, যাহা কিছু শোষণের প্রতীক সব কিছু ভাঙিয়া ফেলিবার আকুলতায় উদ্বেল হইয়া উঠিল। সহস্র সহস্র কণ্ঠে আসমুদ্র হিমাচল গর্জ্জিয়া উঠিল 'ভারত ছাড়'।

বিশ্ব যুদ্ধে লাঞ্ছিত বৃটিশ রাজশক্তি ভারতবর্ষে পৈশাচিক প্রগলভতায় নির্ম্মম হইয়া উঠিল। লাঠি চলে—মাথা ফাটে, গুলি চলে—তাজা প্রাণ বলি হয়। গ্রামের পর গ্রাম আগুনে পোড়াইয়া দেয়। দোষী নির্দ্দোষ বাছবিচার নাই, সন্দেহ জাগিলেই গ্রেপ্তার করে। নেতৃত্বহীন জনতা বিহ্বল হয় না, পরাজয় স্বীকার করে না। ষ্টেশন পোষ্টাফিস পুড়িতে থাকে। রেল লাইন উৎপাটিত হয়। টেলিফোনের লাইন বিকল, টেলিগ্রাফের তার কাটা পড়িয়া থাকে। লাইনচ্যুত মালগাড়ী পথের পাশে উলটাইয়া থাকে। ভারতের অভ্যন্তরে যখন এই অবস্থা তখন ভারতের বাহিরে সাইগাঁও হইতে আজাদ হিন্দ-বেতার মারফৎ নেতাজীর আহ্বান ধ্বনিত হইতে থাকে।

ভিতরে ও বাহিরে যুগপৎ আঘাতের ডাক।

"আগষ্ট বিপ্লবের সময় ভারতবাসী অসীম বীরত্ব, আত্মত্যাগ ও নির্য্যাতন ভোগের পরিচয় দিয়াছে, তাহারা সঙ্ঘবদ্ধভাবে সংগ্রাম করিয়াছে। একটি সুসভ্য জাতি অপর জাতির স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা দমন করিবার জন্য কতটা নিষ্ঠুর হইতে পারে দমননীতির মধ্য দিয়া তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। ভারতের ঘটনাবলী প্রকাশ হইলে জার্ম্মান বর্ব্বরতা, জাপানী বর্ব্বরতা তাহার নিকট ম্লান হইয়া পড়িবে।"

বাঙলার উপর ইংরাজ রাজশক্তির আক্রোশ সবার চেয়ে অধিক। তাই মনুষ্য-সৃষ্ট দুর্ভিক্ষে সেদিন অনধিক পঞ্চাশ লক্ষ লোকের জীবনাবসান ঘটিল। পথে পথে মৃত দেহ পড়িয়া আছে। অন্ন নাই,

বস্ত্র নাই। খালবিল নদ-নদীর দেশ বাঙলায় ছোট বড় সকল নৌকাই সরকার বাজেয়াপ্ত করিয়াছেন। পূর্ব্ব বাঙলায় গ্রামে গ্রামে সাইকেলও রেহাই পায় নাই। বাঙলার বুকে সেদিন ইংরাজ ও তার মিত্র শক্তির নানাবর্ণের, নানা ধর্ম্মের, নানা চরিত্রের, নানা বিন্যাসের সামরিক বাহিনীর উদ্ধত পদধ্বনি নিয়ত মথিত করিয়া চলিয়াছে। আপন দেশে পরবাসী হইয়া বঙ্গবাসী নীরবে নত মুখে অপমানহত হইয়া সকল অনাচার, অত্যাচার ও ব্যাভিচার সহ্য করিতেছে। সহজে স্বচ্ছন্দে যাতায়াত করিবার উপায় নাই। মানুষ মন খুলিয়া কথা কহিতে পারে না। নির্ব্বাক বিস্ময়ে ইতিহাসের পদধ্বনি শোনে। কখনও আশায় কখনও নিরাশায় দুলিতে থাকে। মুখের কথা নির্বাক, শুধু চোখের কথায় মনের অভিব্যক্তি জাগে।

১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দ আসিয়া যায়। জার্ম্মান জাতি আত্মসমর্পণ করিল—কয়েক মাস পরেই জাপানও মিত্র শক্তির সহিত সন্ধি স্থাপন করিল। আজাদ হিন্দ ফৌজের সমগ্র বাহিনী বন্দী হইয়া ভারতে আনীত হইয়াছে। আপাত দৃষ্টিতে প্রতীয়মান হইল সব বুঝি শেষ হইয়া গেল, কিন্তু সেই সর্ব্বরিক্ততার মধ্যে হঠাৎ পূর্ণতার প্রাদুর্ভাব।

লালকেল্লায় বিচার চলিতেছে। শাহনাওয়াজ, ধীলন ও সাইগলের বিচারকে অবলম্বন করিয়া সেদিনের অবিভক্ত চল্লিশ কোটী ভারতবাসী গর্ব্বোন্নত শিরে শুনিল নেতাজীর নেতৃত্বে সেই অজ্ঞাত দিনের গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়ের কথা, যাহার ব্যঞ্জনা প্রতিটি ভারতবাসীর অন্তরে পৌরাণিক গাথার মতই মধুর, গৌরবদীপ্ত, ভাস্বর, শক্তিসঞ্চারক অথচ বেদনাবিক্ষুব্ধ।

একই সঙ্গে আসমুদ্র হিমাচল গর্জ্জিয়া উঠে—

If Shah Nawaz Dhillon and Shegal die
Four hundred millions will ask WHY ?

প্রাণদণ্ডের পরিবর্তে সেদিন তাহাদের মুক্তি দেওয়া ব্যতীত গত্যন্তর ছিল না। প্রাণদণ্ডের আদেশের সহিত ক্ষমাপ্রদর্শনের রাজকীয় ঘোষণাটী একই সঙ্গে প্রকাশ করিয়া ইংরাজ রাজশক্তি মুখ রাখিবার প্রচেষ্টায় মুখই শুধু পোড়াইল না নিজের মানসিকতা প্রকট করিয়া তুলিল।

"এই যুদ্ধে ইংলণ্ড জয়ী হইয়াছে সত্য কিন্তু ব্রিটীশ সিংহের কোমর ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, ইংলণ্ড এখন খুব দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে, ইংলণ্ডের আত্মরক্ষা করাই কঠিন। ভারতবাসীর মন বিদ্বেষে ভরপুর, পরাধীনতা ও অত্যাচারের জ্বালা অসহনীয় হইয়া উঠিয়াছে। নেতাজী সুভাষচন্দ্রের ভারত ত্যাগ, দিল্লী চলো আহ্বান ও আজাদ হিন্দ ফৌজের আত্মত্যাগে ভারতীয় সৈন্যবাহিনী বিদ্রোহ ভাবাপন্ন হইয়া উঠিয়াছে, পুলিশ বাহিনীতে অসন্তোষ, শ্রমিক অসন্তোষ, ডাক বিভাগে স্ট্রাইক, বিমান বাহিনীতে স্ট্রাইক। নৌ-বিদ্রোহ সুরু হইল। ভারতের আকাশ ঘোর মেঘাচ্ছন্ন।"

ত্রৈলোক্যনাথ বিপ্লবের নানা পথে বহু কণ্ঠে বারবার বহুগীত কবির সেই প্রত্যয়ভরা কল্পনাকে আজ বাস্তবায়িত দেখিলেন—কবিবাণী কণ্ঠে মুদ্রিত হইয়া উঠিল।

"ঘণ্টা যখন উঠবে বেজে—
আসবে সবাই আপনি সেজে—
এক সঙ্গে সব যাত্রী যত
একই রাস্তা লবেই লবে।"

এতদিন ভারতীয় সৈন্যবাহিনী ভারতবাসীর কাছে অনাত্মীয় ছিল; ব্রিটীশ রাজ-শক্তির প্রতিভূ হিসাবে তাহারা শুধু দূরের

মানুষই ছিল না, ঘৃণার পাত্র ছিল। হঠাৎ পরম আপন হইয়া উঠিল। ভারতবর্ষে কালো ও ধলা সৈন্যবাহিনীতে বিরুদ্ধ মানসিকতা প্রকট হইয়া পড়িল। ব্রিটীশ রাজশক্তি শুষ্ক বারুদের স্তূপে সমাসীন হইয়া রহিল। দুর্গে দুর্গে, ছাউনীতে শ্বেতাঙ্গ সৈন্য ভয়ে ও ভাবনায় দিন কাটায়।

"ইংলাণ্ডের এখন দুর্দ্দিন, শিল্প অঞ্চলগুলি ধ্বংস হইয়া গিয়াছে, ইংলাণ্ড ঋণ জালে জড়িত। এখন ইংলাণ্ডকে যদি বাঁচিতে হয় তবে তাহার বাহিরের সমস্ত শক্তি (Reserve) ইংলাণ্ডে পুঞ্জীভূত করিতে হইবে। ইংলাণ্ডের বাজার নষ্ট হইয়া গিয়াছে, ভারতবর্ষ বিদ্রোহভাবাপন্ন থাকিলে ইংলাণ্ডের মাল সেখানে বিক্রী হইবে না। ভারতবর্ষকে অধীনতাপাশে আবদ্ধ রাখিতে হইলে ইংলাণ্ডের স্বাধীনতা বিপন্ন হইবে।"

তাই সুচতুর ইংরাজ শাসকগোষ্ঠী সখ্যতার পথে পা বাড়াইল। আশা, মিত্রতার ভিতর দিয়া যোগসূত্র থাকিলে হয়ত বা পরোক্ষে ফিরিয়া আসা চলিবে।

তাই বন্দীমুক্তি সুরু হইল। আলাপ-আলোচনার সূত্রপাত হইল। ক্ষমতা হস্তান্তরের সদিচ্ছা কানাকানি হইতে লাগিল।

এমনই পরিবেশে ২৩শে মে ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে বেলা ১২টার সময় ত্রৈলোক্যনাথ দমদম সেণ্ট্রাল জেল হইতে মুক্তি পাইলেন।

"ফিরিয়া দেখি দেশের চেহারা ইতিমধ্যে বদলাইয়া গিয়াছে, যেন এই কয় বৎসরেই স্বাধীনতার পথে অনেক পা আগাইয়া গিয়াছে"—ভারতের পাণ্ডুর মুখে রক্তের ছোপ পড়িয়াছে।

বনত্রাস পশুরাজ সিংহ নখদন্ত উৎপাটিত হইয়া হয়ত চীৎকার করিয়া আপন পুরাতন মহিমা প্রচার করিতে সচেষ্ট হইতে পারে কিন্তু সদর্পে ও স্বমহিমায় অরণ্য প্রান্তরে ঘুরিয়া বেড়াইতে পারে না।

আপন শক্তিতে তাহার দিনান্তের আহার আহরণের শক্তি নাই, কেহ যদি পূর্ব্বকথা ও আভিজাত্য স্মরণ করিয়া সম্মুখে কিছু আনিয়া দেয় কিম্বা দয়া পরবশ হইয়া কিছু দিয়া যায় তবেই তাহা দ্বারা উদর পূর্ত্তি সম্ভব, নচেৎ তিলে তিলে মৃত্যুই অবশ্যম্ভাবী ফল।

ঘটনাচক্রের আবর্ত্তে ব্রিটিশ রাজশক্তি বিজয়ী হইয়া পরাজয়ের গ্লানি হইতে মুক্তি পাইয়াছে কিন্তু পরাজিতের দুর্ভাগ্য হইতে নিষ্কৃতি পায় নাই।

কাঁচামালের দেশ ও উৎপাদিত পণ্যের একচেটিয়া বাজার কামধেনুসদৃশ ভারতবর্ষ আজ বিদ্বেষে উগ্র; বহুদিনের সুপ্তি ভাঙিয়া সে আপন শক্তি উপলব্ধি করিয়াছে তাই আত্মবিশ্বাসে উদ্বুদ্ধ। শক্তির শাসন আর চলিবে না, কথার চাতুরীতে ফল ফলিবে না। অথচ ভারতবর্ষ যদি হাতছাড়া হয় তবে ব্রিটিশ জাতির ভবিষ্যৎ ইতিহাস ঘোর অন্ধকার। ইংরাজ তাই দ্বিধাগ্রস্ত। রাখাও চলে না, ছাড়াও চলে না। কয়েক বৎসর আগের মদগর্ব্বী চার্চ্চিলের উদ্ধত কণ্ঠস্বর এখনও হারাইয়া যায় নাই— 'I have not become the Prime Minister to preside over the liquidation of His Majesty's empire.' তবুও আজ ইংরাজ ভারতবর্ষকে আপন শাসনজালে বাঁধিতে পারিতেছে না, ভবিষ্যতেও পারিবে না।

বাঁচিবার একমাত্র উপায়, ভারতবর্ষের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের অন্তরে বিদ্বেষের আগুন জ্বালাইয়া তোলা, ধর্ম্মের নামে উন্মত্ততা সৃষ্টি করা, ক্ষমতাপ্রাপ্তির আশু লালসায় নামী অনামী অগণিত দল ও উপদলের বিভিন্ন নেতৃত্ব ও চরিত্রকে উদ্‌ভ্রান্ত করা। আত্মঘাতের পথ প্রশস্ত করিতে ব্রিটিশ শক্তি শেষবারের মত চেষ্টা করিয়া চোরা পথে পা বাড়াইল, আগুন লইয়া খেলা সুরু করিল।

১৯৩৭ সালের প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের মাধ্যমে পৃথক

নির্ব্বাচনের সুড়ঙ্গপথে ভারতের রাজনৈতিক জীবনে যে বিষের বীজ ছড়ানো হইয়া গিয়াছে এখন শুধু তাহাকে ফলপ্রসূ করিয়া তুলিতে হইবে। ইংরাজ-চাতুরী প্রচার করিয়া চলে, তাহারা এখনই ভারতবাসীকে স্বাধীনতা দিয়া ভারত ছাড়িতে প্রস্তুত, কিন্তু এই চল্লিশকোটীর জনতার মুখপাত্র কে বা কাহারা, কাহার হাতে দায়িত্ব তুলিয়া তাহারা মুক্ত হইবে। বাঙলার প্রবাদ "শঠের ছলের অভাব হয় না"—সেদিন আর একবার বাস্তব ক্ষেত্রে প্রমাণিত হইল।

তাহাদের বক্তব্য—কংগ্রেস! সে তো হিন্দুর প্রতিনিধি, তাও সকল হিন্দুর নহে। মুসলিম-জনমনে সুচতুরভাবে কংগ্রেস-ভীতি জাগাইয়া তোলা চলে। ইংরাজ চলিয়া গেলে হিন্দুর দাসত্ব অবধারিত। নিরক্ষর মুসলমান জনতা আতঙ্কিত হইয়া উঠে।

ইংরাজের সুরে সঙ্গত করিবার ব্যক্তি বা দলের অভাব ঘটিল না। নানা আবর্ত্ত রচিত হইল। জনসাধারণের অন্তরে সর্ব্বগ্রাসী ক্রোধ ও ঘৃণা জাগাইয়া তুলিতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা নীরবে ও অলক্ষ্যে পরিকল্পিত হইতে লাগিল।

ত্রৈলোক্যনাথ দুঃখ করিয়া লিখিতেছেন—"সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় ক্ষতিগ্রস্ত হয় সাধারণ লোক। তাহারাই মৃত্যুবরণ করে, তাহারাই উপবাসী থাকে। তাহাদেরই জেল হয়, মামলা চালাইতে তাহাদের বাড়ী ঘর বিক্রয় করিতে হয়। যাহারা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাঁধায় তাহারা লাভবান হয়। আর লাভবান হয় গুণ্ডা শ্রেণীর লোক। যাহারা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাঁধায় তাহারা এবং গুণ্ডা শ্রেণীর লোক কেহই মরে না, সাধারণ লোক যে কিছুই জানে না, কোন অপরাধ করে নাই এই শ্রেণীর লোকেরাই প্রাণ হারায়।"

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের পর হইতেই সাম্রাজ্যবাদী শক্তি দুই একটী

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা মাঝে মাঝে সৃষ্টি করিলেও তাহা স্থানীয় পরিবেশে সীমিত ছিল ও উত্তেজনা ছিল সাময়িক। জনসাধারণের মনে বিশেষ কোন রেখাপাত করিতে পারিত না। উত্তেজনা প্রশমিত হইলে সবই স্বাভাবিক হইত। যেদিন ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের একনিষ্ঠ সাধনায় উদ্বুদ্ধ আজাদ হিন্দ ফৌজের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের অপূর্ব্ব প্রীতি, একতা, বিশ্বাস ও আত্মত্যাগের দৃষ্টান্তে ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের অন্তরে নবচেতনার প্লাবন আনিল সেদিন ইংরাজ শক্তি দিশাহারা ও বিভ্রান্ত হইয়া পড়িল। এই একতা ভাঙিতে হইলে গভীরভাবে সাম্প্রদায়িকতার বিষে সমাজদেহ জর্জ্জর করিয়া তুলিতে হইবে। বিপুলভাবে ধর্ম্মীয় উগ্র-মানসিকতাকে জাগ্রত করিতে হইবে। পরধর্ম্মভয়াবহতা ও পরধর্ম্মবিদ্বেষ-বৃদ্ধিতে ইন্ধন জোগাইতে হইবে। অবিশ্বাসের ক্রমবর্দ্ধমান কালোছায়ায় সমাজের মানবিক চেতনা ও সত্তাকে আচ্ছন্ন করিতে হইবে।

তাই এতদিনের যাহারা সহকর্ম্মী, সমমর্ম্মী, সহযোগী নিমেষে তাহারা শত্রু হইয়া উঠিল। শতাব্দীর প্রতিবেশী একদণ্ডে পর হইয়া পড়িল। কারণ ধর্ম্মীয় আচার অনুষ্ঠানে ভিন্ন পথের পথিক। একজনের নিকট ম্লেচ্ছ অন্যজনের নিকট কাফের। প্রাকৃত জনগণের বিশ্লেষণ অপেক্ষা উত্তেজনার ভাবই প্রবল। উগ্র উত্তেজক বিষ ছড়ান হইল।

সমাজদেহে গভীর ফাটল ধরিল, অখণ্ড সমষ্টি জীবন খণ্ডিত হইয়া পড়িল।

ইতিমধ্যে সংবাদ আসে শ্রীহট্টের নওগাঁয় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হইয়াছে। সেখানে আসিয়া ত্রৈলোক্যনাথ দেখেন কত তুচ্ছ উপলক্ষ্যে কত বিপুল পাশবিকতার প্ররোচনা। দুই সম্প্রদায়ের সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত বিবাদ গ্রাম্য বিবাদে পরিণত হইল। গ্রাম্যবিবাদের

সূত্রে কৈবর্ত্তেরা একটা মুসলমান পাড়ায় আগুন লাগায়, দুচারখানি কুটীর ভস্মীভূত হইয়া গেল। অতিরঞ্জিত এই খবর গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে কানে হাটিয়া চলে। যত চলে তত অতিরঞ্জন, তত উত্তেজনা। উত্তেজিত মুসলমান জনতা প্রতিশোধ স্পৃহায় দলে দলে নৌকা বোঝাই হইয়া নওগাঁ দখল করিতে আগাইয়া আসে।

অপরদিকে কৈবর্ত্তরাও প্রস্তুত—উপযুক্ত জবাব দিতে হইবে। নওগাঁ গ্রামটী দ্বীপের মত চারদিকে জল। পাড়ে পাড়ে বাঁশ পুতিয়া ব্যূহ রচনা হইল। প্রহরীদের হাতের শঙ্খ বাজিয়া উঠে। কয়েক হাজার আক্রমণকারী প্রায় একশত নৌকায় তীরের নিকট আসিবার চেষ্টা করিতেছিল আর গ্রামের পুরুষের দল বৃক্ষের আড়ালে থাকিয়া কুঠার বল্লম ইঁটের টুক্‌রা প্রভৃতি তাহাদের উপর নিক্ষেপ করিতে লাগিল। নৌকায় দলবদ্ধ হইয়া থাকায় আক্রমণকারীরা আঁটিয়া উঠিতে পারিতেছিল না, প্রবল বাধা পাইতেছিল, আহত হইতেছিল। ক্ষুধায় সবাই কাতর। অবশেষে রণে ভঙ্গ দিয়া নৌকার সারি পলাইতে লাগিল। পলাইবার সময় পথের কয়েকটী গ্রাম জ্বালাইয়া দিয়া যায়। এত বড় যে দাঙ্গা তাহার উৎস কি এবং কত তুচ্ছ কেহ তাহা নির্ণয় করিবার চেষ্টা করিল না, স্থির মস্তিষ্কে বিচার করিল না। উত্তেজনায় সবাই উন্মাদ, আত্মঘাতে ব্রতী। বিদ্বেষ ও প্রতিশোধ স্পৃহা নানাস্থানের দাঙ্গায় গহ্বরকে আরও গভীর ও বিরাট করিল।

১৯৪৬ সালের ১৬ই আগষ্ট। সমগ্র কলিকাতা জুড়িয়া যে বীভৎসতা যে অহেতুক জিঘাংসা তিনদিন তিন রাত্রি ধরিয়া অবাধে ও উদ্দামভাবে প্রেতনৃত্য সুরু করিল, মনে হইল বুঝিবা মানুষের মৃত্যু হইয়াছে—সমাজ, সংসার, জীবন বুঝিবা অলীক স্বপ্ন। কেন মারিতেছে জানে না, মারিতে হইবে কারণ সে বিধর্ম্মী। সমগ্র সমাজ-চেতনা কী করিয়া যে সেদিন মরণমহোৎসবে মাতিয়া

ছিল তাহা বুঝিবার ও অনুধাবনের শক্তি সাধারণ মানুষের ছিল না। তাহারা হয় মারে, নয় মরে।

ত্রৈলোক্যনাথ কলিকাতায় বসিয়া এই নারকীয় পরিস্থিতি দেখেন আর ইতিহাসের গতি নির্ণয়ে সচেষ্ট হন। বৎসরকালও গত হয় নাই আজাদ হিন্দ ফৌজের বিচারকে অবলম্বন করিয়া সে কী প্রীতি, কী একতা, কী সমমর্ম্মীতা—আর আজ এ কোন রহস্যে দুই সম্প্রদায় পরস্পর হত্যায় লিপ্ত।

তাহার পরই আসিল নোয়াখালীর বীভৎস হত্যাকাণ্ড। পুরুষানুক্রমে সংখ্যালঘু হিন্দুর দল প্রতিবেশী সংখ্যাগুরু মুসলমানের সহিত সুখদুঃখের সমব্যাথী ও অংশীদার হইয়া বসবাস করিয়া আসিতেছিল। একই জীবন বিন্যাস, একই জীবনচর্য্যা, একই জীবনধারণ। এক ভাষা, একই চিন্তা, একই পেশা। আকস্মিক সেই চিরদিনের প্রতিবেশী অতি পরিচিতের দল সকল মানবিক চেতনাকে পদদলিত করিয়া প্রতিবেশীর উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল।

সেই জিঘাংসায় সংখ্যালঘুর দল হয় মৃত্যুবরণ করিল, নয়ত প্রাণ ভয়ে ভস্মীভূত ঘর দুয়ার ক্ষেত খামার পরিত্যাগ করিয়া গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে প্রাণভয়ে ছুটিল। গ্রামের পর গ্রাম জনশূন্য, লুণ্ঠিত, দগ্ধ ও অর্দ্ধ দগ্ধ। চারিদিকে শ্মশানের ভয়াবহ নিস্তব্ধতা বিরাজ করিতেছিল।

সমগ্র বাঙলা তথা ভারতবর্ষ সেই সংবাদে স্তম্ভিত হইয়া পড়ে। ধূমায়িত বহ্নি এতদিনে সর্ব্বগ্রাসী দাবানলে রূপান্তরিত হইয়া বাঙলা তথা ভারতবর্ষের সমাজ-জীবনকে গ্রাস করতে সমুদ্যত। তখন ইংরাজ শাসক রজ্জু ধরিয়া থাকিলেও তবুও সে পাবক প্রান্ত হইতে প্রান্তে ছুটিয়া চলে। ইংরাজ রাজশক্তির কাম্য—বীভৎসতার বিকাশ, প্রতিহিংসার প্রসার, আত্মঘাতী দাঙ্গার দাবানল—তাই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা দমিত হয় না।

অবশ্যম্ভাবী ফল ফলিল; নোয়াখালীর প্রতিশোধে বিহার গর্জ্জিয়া উঠিল। সেই দুর্নিবার সাম্প্রদায়িক হলাহলে আজাদ হিন্দ ফৌজের সম্মোহিনী শক্তি অবলুপ্ত হইয়া গেল।

ত্রৈলোক্যনাথ তাঁহার দীর্ঘ সংগ্রামের অভিজ্ঞতায় বুঝিতে পারিলেন ইংরাজ-রাজশক্তি ভারত ত্যাগের পূর্ব্বে তাহার তূণীরের শেষ অস্ত্র প্রয়োগ করিবে, ভারতবর্ষকে চিরকালের জন্য আত্মঘাতের উদগ্র নেশায় জর্জ্জরিত করিয়া যাইবে। বিপ্লবী সহকর্ম্মী, সহযাত্রী ও অনুগামীদের এই দাবানল নির্ব্বাপিত করিবার আহ্বান জানাইলেন। ব্যাথিত ও বিস্মৃত ত্রৈলোক্যনাথ কলিকাতা হইতে নোয়াখালী উদ্দেশ্যে রওনা হইয়া দত্ত পাড়ায় দেওয়ানজী বাড়ীতে অনুশীলন সমিতির সভ্য কেদারেশ্বর গুহের গৃহে উপস্থিত হইলেন। দাঙ্গা থামিয়াছে কিন্তু আতঙ্ক কাটে নাই। স্বাভাবিকতা দূরের কথা, হিন্দু-অধ্যুষিত গ্রামগুলি প্রায় সবই দগ্ধ ও জনশূন্য। স্থানে স্থানে বাস্তুহারা শিবির—সেখানে আশ্রয়প্রার্থীর দল শঙ্কাতুর চিত্তে দিন কাটাইতেছে।

এমন সময় মহাত্মাগান্ধী সদল বলে দত্তপাড়ায় উপস্থিত। সেদিন গান্ধীজী এই ক্রমবর্দ্ধমান সাম্প্রদায়িক দানবের পদধ্বনিতে যে ভয়াবহতার আভাষ পাইয়াছিলেন তাহারই প্রতিরোধে সকলের নিষেধ না মানিয়া, সকল ভয় তুচ্ছ করিয়া নোয়াখালীর বুকে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। সত্যাগ্রহ কি এবং কতখানি নৈতিক বল ও ভয়শূন্য চিত্ত থাকিলে তাহা অনুশীলন করা চলে তাহাই আপন দেশবাসী, অনুচর, সহযাত্রীদিগকে দেখাইলেন। সঙ্গে নাতনী মনু গান্ধী, নাতবৌ আভা গান্ধী,--প্যারেলাল, জীবন সিং, মহাদেব দেশাই—বিভিন্ন সংবাদপত্রের দেশী বিদেশী সাংবাদিকগণ ও আরও অনেক অনুরক্ত ভক্তের দল। তদানীন্তন অবিভক্ত বাঙলার প্রধানমন্ত্রী সুরাবর্দ্দী সাহেব বিশেষভাবে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত, গান্ধীজীর

জীবনসংশয় হইলে সেদিনের পটভূমিতে ভারতের মাটিতে যে আগুন জ্বলিবে তাহা কোন ক্রমেই নির্ব্বাপিত হইবে না। সে ছবি কল্পনা করা অতি বড় ভবিষ্যৎদ্রষ্টার পক্ষেও অসম্ভব। সশস্ত্র পুলিশের দল ও গুপ্তচর সংস্থা তাই গান্ধীজীকে ঘিরিয়া থাকে। সংশয়াকুল আতঙ্কিত সংখ্যালঘু জনসাধারণ কিছুটা সাহস পায়।

গান্ধীজী প্রতিদিন একটী করিয়া বিধ্বস্ত গ্রাম পরিদর্শনে চলেন। সেই গ্রামেই রাত্রিযাপন করেন। আটাত্তর বয়সের বৃদ্ধ শীতের প্রকোপ উপেক্ষা করিয়া নগ্ন গাত্রে ও নগ্নপদে প্রত্যহ প্রাতে যাত্রা করিয়া প্রতিদিন এক এক গ্রামে উপস্থিত হ'ন। পথে পথে তাঁহার পরিক্রমা চলে—বিশ্বাসহারা মানুষ ধীরে ধীরে বিশ্বাস ফিরিয়া পাইতে থাকে। মানুষের অবিনাশী চিত্তবল দানবীয় বীভৎসতাকে সঙ্কুচিত করিয়া আনে।

ত্রৈলোক্যনাথের প্রধান কার্য্যালয় জয়াগ আর কংগ্রেসের প্রধান কেন্দ্র চৌমুহনী।

গান্ধীজীর সেই অকুতোভয় গ্রাম পরিক্রমায় ভয়বিহ্বল সংখ্যা-লঘুর দল আবার স্বগ্রামে ও স্বগৃহে ফিরিতে সুরু করিল। গান্ধীজী সাহসে উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য এক একটী ভস্মীভূত গৃহে এক একজনকে একক ভাবে রাত্রিবাস করিতে নির্দ্দেশ দিলেন। পৌত্রী, পৌত্র-বধূ তাঁহারও এই অজ্ঞাত অপরিচিত বিধ্বস্ত গ্রামে সঙ্গীবিহীন এক এক গৃহে রাত্রি যাপন করেন। ভয়ও সংক্রামক, সাহসও সংক্রামক। ভয়-বিহ্বল অন্তরে সাহস স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা করে। অন্ধহিংসাকবলিত গ্রামগুলিতে বিদ্যালয়, চিকিৎসা কেন্দ্র কিছুই অবশেষ ছিল না। ত্রৈলোক্যনাথ তাঁহার চারটী কেন্দ্রে বিদ্যালয় এবং হোমিওপ্যাথী ডাক্তারখানা পুনরায় চালু করিলেন।

সানুচর গান্ধীজী পরিক্রমায় চলিয়াছেন—সঙ্গে প্রায় দু'শ জনের জনতা। চলমান মানুষের কণ্ঠে শাশ্বত জীবনের গান, বুকে অন্ধকার

উত্তরণের দুর্জ্জয় আশা, বাতাস সেই সুরে কলুষমুক্ত হইতে থাকে। দুর্বৃত্তের দল আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া আত্মগোপন করিতে সুরু করিয়াছে।

চলার পথে গান্ধীজী একদিন ত্রৈলোক্যনাথের কর্ম্মকেন্দ্র জয়াগ গ্রামে উপস্থিত। ত্রৈলোক্যনাথ বাঙলার মাটির নিজস্ব গান কীর্ত্তনের সুরে ও ভাষায় গান্ধীজীকে অভ্যর্থনা করিলেন। গ্রাম্য মহিলারা শ্রীখোলে বাঙলার আত্মভোলা সুরটি বোলে বোলে প্রকাশ করিতে লাগিলেন, নৃত্যের ছন্দে বুকের কথা মুখে ব্যক্ত করিলেন। গান্ধীজী সেই সুরে সেই মূর্চ্ছনায় আপনাকে সম্পুর্ণরূপে হারাইয়া ভাবাবিষ্ট হইয়া দাঁড়াইয়া থাকেন।



আবার দ্যূতক্রীড়া বসিয়াছে। এবার হস্তিনাপুরের রাজ-প্রাসাদের প্রমোদকক্ষ নয়, নয়াদিল্লীর ব্রিটীশ রাজচক্রবর্ত্তীর প্রতিভূর প্রাসাদের মন্ত্রণা-কক্ষ।

মহাভারতের দুইটী সম্প্রদায় আজ বিদ্বেষে জর্জ্জর, হিংসা ও প্রতিহিংসায় উন্মত্ত, কেহ কাহাকেও বিশ্বাস করে না। অখণ্ড ভারতের জনগণ ভারত বিভাগের পূর্ব্বেই মানসিকতায় দুই মেরুর যাত্রী—দ্বিধাবিভক্ত। এই দুই পক্ষ মিলিত হইয়াছেন। দুই বিভিন্ন ধারার নেতৃবৃন্দ আজ পাশার পর পাশায় দান ফেলিয়া চলিয়াছেন। এক দিকে কংগ্রেস, অন্য দিকে মুসলিম্ লীগ। পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু, সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেল ও মৌলানা আজাদ কংগ্রেস

প্রতিভূ হিসাবে একদিকে, আর মহম্মদআলি জিন্না, নবাব লিয়াকৎ আলি ও সর্দ্দার আব্দুর রব নিস্তার মুসলিম লীগের প্রতিভূ হিসাবে অন্যদিকে।

সভাকক্ষ উত্তেজনা, উষ্মা ও উৎকণ্ঠায় নিয়ত থরথর কাঁপিতেছে ও কণ্টকিত হইতেছে।

এবার শকুনি দ্যূতক্রীড়াবিদদের আত্মীয় নহেন—ভিন্ন দেশী; ভিন্ন মতলবে দুপক্ষের হাতে তাঁহার মন্ত্রপূতঃ পাশা তুলিয়া দিতেছেন। আজিকার শকুনি আপন পিতা ও আত্মীয়ের মৃত্যুর প্রতিহিংসায় উদ্দীপ্ত নহে, আজিকার শকুনি আপন দেশ ও দেশবাসীকে অবশ্যম্ভাবী অবলুপ্তির পথ হইতে বাঁচাইবার আপ্রাণ প্রচেষ্টায় স্থির, ধীর, একলক্ষ্য, অনন্যনিষ্ঠ।

দুই পক্ষের অনমনীয় মনোভাবে ও নিষ্পত্তিহীন সূত্রে আপন অভিভাবকত্বের পথ সুগম করিতেছেন। আপন সহচর, অনুচর ও প্রিয়গোত্রদের প্রতি মোহাসক্ত কংগ্রেসের ভাগ্যাধিপতি—অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র সব বুঝিয়া সব দেখিয়া সব কিছু হৃদয়ঙ্গম করিয়াও নীরব নিষ্পন্দ। বজ্রকণ্ঠ মৌন, সত্য-ঝঙ্কার অবলুপ্ত। চেতনা শুধু বেদনায় ভরা। শাসনের ভাষা অনুচ্চারিত; তিরস্কার নীরবতায় আশীর্ব্বাদ বলিয়া প্রচারিত হইল।

৩রা জুন ১৯৪৭। বড়লাট বাহাদুর লর্ড মাউন্টব্যাটেন ঘোষণা করিলেন—১৫ই আগষ্ট ১৯৪৭ ইংরাজ ভারতবর্ষের রাজকীয় ক্ষমতা হস্তান্তরিত করিবে। স্বেচ্ছায় সে চলিয়া যাইবে তবে একক কোন সংগঠন বা সঙ্ঘের হাতে এই ক্ষমতা দেওয়া হইবে না—অখণ্ড ভারত ত্রিধা বিভক্ত হইবে। হিন্দু ভারত, মুসলিম ভারত ও সামন্ত ভারত।

পশ্চিমের মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ পাঞ্জাবের অংশ, সিন্ধু, বেলুচিস্তান ও গণভোটে স্থিরীকৃত উত্তরপশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ লইয়া গঠিত



দেশপ্রিয় পার্ক হতে কেওড়াতলা মহাশ্মশানের দিকে



ফণী মজুমদার, তাজউদ্দিন আমেদ, অতীন্দ্রমোহন রায়, স্বদেশ নাগ
প্রমুখ মহারাজের চিতাভস্মসহ বুড়ীগঙ্গা অভিমুখে

হইবে পশ্চিম পাকিস্তান ও মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙলার অংশ ও গণভোটে স্থিরীকৃত আসামের অন্তর্গত শ্রীহট্ট লইয়া প্রতিষ্ঠিত হইবে পূর্ব্ব পাকিস্তান। অভিন্ন পাকিস্তানের বিভিন্ন দুইপ্রান্ত ভারতের কণ্ঠ বেড়িয়া প্রতিষ্ঠিত থাকিবে। তদানীন্তন ব্রিটিশ ভারতের অবশিষ্টাংশ ভারত নামে কংগ্রেসের হাতে অর্পিত হইবে। আর অখণ্ড ভারতের এক তৃতীয়াংশ ছোট বড় প্রায় ছয় শত সামন্ত-রাজন্যবর্গ কর্তৃক শাসিত যে অংশ তাহা ইচ্ছানুযায়ী যে কোন অংশে যুক্ত হইতে পারিবে। হয় ভারত নয় পাকিস্তান। বাধ্য-বাধকতার যোগ-সূত্রটি ছিন্ন থাকিল। রাজচক্রবর্ত্তীত্বের বিলোপ হইল, সামন্ত-নৃপতিদের মনে স্ব স্ব প্রাধান্যের বাসনা। রাতারাতি ভারতবর্ষ ভারসাম্য হারাইয়া আত্মকলহে নিমগ্ন হইবে। ইংরাজ প্রত্যক্ষে সরিয়া গিয়া পরোক্ষে অবস্থান করিবে।

মুসলিম লীগ ভারত না বলিয়া হিন্দুস্থান বলিল। দ্বি-জাতি তত্ত্বের সাফল্যে উল্লম্ফন নৃত্য সুরু হইল। দেশ-ভাগ, অর্থ-সম্পদ ভাগ, শক্তি ভাগ, যোগাযোগ ব্যবস্থা ভাগ—ফলে স্থিতিশীলতা ভাগ হইল। তাই সেনাবাহিনী ভাঙিল, আর্থিক সংস্থা বিভক্ত হইল, সহায় সম্পদ ভাগ হইল, রেল ভাঙিল, পথ ভাঙিল, ধর্ম্মের নিরিখে এক প্রান্তের মানুষ অন্য প্রান্তে ছুটিল। সুসংবদ্ধ লৌকিক ও অর্থ-নৈতিক সমাজ হঠাৎ ওলটপালট হইয়া পড়িল। তাই জমিদার রাতারাতি ফকির হয়, মহাজন সাধারণজনে রূপান্তরিত হয়। রাস্তার গুণ্ডা রাতারাতি ধনী হইয়া উঠে।

অকস্মাৎ দেশ জুড়িয়া বিপুল শূন্যতা, রাষ্ট্রিক জীবনে বিরাট ফাটল। পরিণাম ভয়াল ঝঞ্ঝা ও বিধ্বংসী ঢল। সাধারণ মানুষ খড়কুটার মত ভাসিয়া চলে।

অমরেন্দ্র ঘোষ তাঁহার "ভাঙছে শুধু ভাঙছে" উপন্যাসে ইহার প্রতিচ্ছবি আঁকিয়াছেন।

"এসেছে অবিস্মরণীয় ইংরাজের রোয়েদাদ্—ইস্পাতের করাতের শাণিত বক্র দাঁতের মত। ছড়াচ্ছে অদ্ভুত দ্যুতি।

মাটিতে ফাটল ধরে নি, চিড় খায়নি কোন খাড়ি নদীর পার; জগৎ জোড়া ভূমিকম্প নয়, খণ্ড প্রলয় নয় বিহারের, তবু ধ্বসে ধ্বসে পড়ছে…

ভাঙছে গুঁড়িয়ে যাচ্ছে এক প্রাচীন সভ্যতা, হিন্দু-মুসলিম মিলিত সংস্কৃতির ঐতিহ্য—মিলন-গ্রন্থি শিথিল হচ্ছে মন্দির ও মসজিদের।

ভেঙে উজাড় হয়ে যাচ্ছে—হাট, বাট, গঞ্জ, সহর, গ্রাম।…

নেতারা স্বাধীনতার স্বপ্নে বিভোর—জনসাধারণ বলির ছাগের মত দাঁড়িয়ে কাঁপছে।"

পূর্ব্ব-নির্দ্ধারিত ব্যবস্থানুযায়ী পাকিস্তানে ১৪ই আগষ্ট ও ভারতে ১৫ই আগষ্ট রাজকীয় ক্ষমতা হস্তান্তরিত হইল।

ইউনিয়ন জ্যাক্ পতাকা দণ্ড হইতে অপসারিত—একপ্রান্তে চাঁদ-তারা-সমন্বিত সবুজ পতাকা, অন্য প্রান্তে অশোকচক্র লাঞ্ছিত ত্রিবর্ণ বা তেরঙ্গা পতাকা সেই দণ্ডে উত্তোলিত হইল।

জনসাধারণ উত্তেজনায় ও উল্লাসে সব দুঃখকষ্ট, অসুবিধা ভুলিয়া নৃত্যপাগল হইয়া উঠে। দুই দেশের রথী মহারথীর দল সুদূর-প্রসারী কল্পনায় ও ভাবগম্ভীর ব্যঞ্জনায় সে উদ্দামতায় আরও গতিদান করিলেন।

ত্রৈলোক্যনাথ তখন নোয়াখালীতে; যেদিন পাকিস্তানে স্বাধীনতা উৎসব সেদিন তিনি জয়াগ গ্রামে আপন কর্ম্মকেন্দ্রে দিনটি নীরবে অতিবাহিত করিতেছেন। সম্মুখে দৃষ্টিপাত করিলেও বারবার তাহা পশ্চাৎ দিকে ফিরিয়া যায়। সেই বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের অগ্নিক্ষরা দিন, বিভক্ত বাঙলা এক করিবার দুর্নিবার পণ। কী সে বিদ্যুৎসম অনুপ্রেরণা গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে ছুটিয়া চলিয়াছে।

ঘরে ঘরে তার উত্তাপ, মনে মনে তার শিহরণ, মুখে মুখে বিপদ-তারণ দীপ্তি। আজ বাঙলার মানুষ কীসের মোহে, কীসের উত্তেজনায় কোন পরমার্থের প্রসাদ-অভিলাষে অখণ্ড বাঙলাকে খণ্ড করিয়া এত প্রগল্‌ভ হইয়া উঠিল। মহাকালের আননের রেখা বোধগম্য হয় না। আকাশ-বিদারী জয়োল্লাসের সাথে গ্রামের শান্ত প্রকৃতি আলোড়িত করিয়া চাপা মর্ম্ম বেদনা গুমরিয়া উঠে। বাঙালীর আত্মহনন সেদিন পূর্ণ হইল।

ত্রৈলোক্যনাথের চির-দুর্জ্জয় নয়ন সজল হইয়া উঠে। মনে মনে ভাবেন যে স্বাধীনতার জন্য তাঁহারা জীবন উৎসর্গ করিলেন, কত বন্ধুর পথ, কত তিমির রাত্রি অমিত তেজে, অনমনীয় মনোবলে অদম্য প্রেরণায় অতিক্রম করিলেন, সেই স্বাধীনতা আজ আসিল, কিন্তু সে আসিল চোরাপথে। রাজবেশে তাহার আগমন নয় সিংহদ্বারে দিনের আলোয়—সে আসিল রাতের অন্ধকারে, পশ্চাতের দুয়ার খুলিয়া অতি সন্তর্পণে আপনাকে আবৃত করিয়া।

রাজনৈতিক নেতার অধিকাংশ পশ্চিম বাঙলায় ছুটিলেন, স্বাধীনতার প্রাপ্যফল হইতে যাহাতে বঞ্চিত না হ'ন। জমিদার প্রমাদ গণিলেন। এতদিন শোষণ করিয়া শাসন করিয়াছেন আর চলিবে না; মুসলমান প্রজা হিন্দুজমিদারের উপর প্রতিশোধ লইবে। বাস্তব ভয় অপেক্ষা অহেতুক ভয় আসিয়া চিত্ত অধিকার করিল। তাঁহারাও গ্রাম ছাড়িলেন। ছোট বড় নানা হিন্দু ব্যবসায়ী ও মহাজনের দল বুঝিলেন কালচক্র হঠাৎ গতি পাল্টাইয়াছে। জীবন না গেলেও ধন মান লইয়া বসবাস মুস্কিল হইবে। তাই গঞ্জ বাজার আড়ৎ বন্ধ হইল। জনতার স্রোত পদ্মা ছাড়িয়া গঙ্গার দিকে চলিতে সুরু করে। এ বাঁধ ভাঙা জনস্রোতকে রুখিবার কেহ নাই। সমাজ জীবনে যে প্রচণ্ড ঢল নামিয়াছে তাহাকে আপন শিরে ধারণ করিবার নীলকণ্ঠ সর্ব্বত্যাগী মানুষ কোথায়! শেষ কোথায়—কেহ



জানে না ; এ মহাভাঙনের পালা কবে শেষ হইবে কেহ বলিতে পারে না।

ইতিমধ্যে পাঞ্জাবের উভয়খণ্ডে দানবীয় উন্মত্ততায় দুই সম্প্রদায়ের রুধির স্রোত পঞ্চনদীর জলকে আরক্ত করিয়া তুলিয়াছে। উভয় সম্প্রদায়ের নারীই সমভাবে নিগৃহীতা ; শিশু ও বৃদ্ধ সমভাবে নিহত। বালক বালিকা, কিশোর কিশোরী ও যুবক যুবতীর মৃত দেহ পথে পথে লুটাইতেছে। পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে ট্রেন ছুটিয়াছে মুসলমানদের লইয়া, আর পশ্চিম হইতে পূর্ব্বে বহন করিতেছে হিন্দু ও শিখদের। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই উভয় দিকেই জীবন্ত মানুষ ট্রেন হইতে অবতরণ করে না—রক্তাক্ত মৃতদেহের স্তূপ নামান হয়। বিদায়ী সাম্রাজ্যবাদীর পাশার চালে মহাভারত সেদিন বিহ্বল, বিভ্রান্ত ও বিদীর্ণ।

দিল্লীও জ্বলিয়া উঠিল। বীভৎসতায় ও উন্মত্ততায় রাজধানীও ভয়াল। মহাভারতের ইতিহাসে সেদিনের প্রতিটি দিন কেবলমাত্র হাহাকার, হত্যা, আর্ত্তনাদ, উত্তেজনা ও উন্মাদনায় ঠাসা। মানুষ মানবিকতার যা কিছু সুন্দর, সত্য ও সার্থক তাহার সবই হারাইয়া উদগ্র জিঘাংসার ক্রীড়নক হইয়াছে।

১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে জানুয়ারী—ত্রৈলোক্যনাথ জয়াগ কেন্দ্রে বসিয়া আছেন। উৎকণ্ঠিত চিত্তে প্রতিদিন বেতারে কান পাতিয়া থাকেন—ঢাকা কলিকাতা হইতে কি সংবাদ প্রচারিত হয়। কোথায় কখন কি ঘটিতেছে! অকস্মাৎ গোধূলির বিষন্ন আলোকের সাথে সুর মিলাইয়া আকাশবাণী ঘোষণা করিল, মহাত্মা গান্ধী অপরাহ্নে প্রার্থনান্তে ভাষণ দানের পর আততায়ীর গুলিতে দিল্লীর বিড়লা ভবনের প্রাঙ্গণে নিহত। ত্রৈলোক্যনাথ হতচকিত, বিমূঢ়, বাক্‌রুদ্ধ।

বিদ্যুৎগতিতে এ সংবাদ আশে পাশের গ্রামে প্রচারিত হইয়া

যায়। সতীশচন্দ্র দাশগুপ্তের সহিত সাক্ষাৎ করিতে ত্রৈলোক্যনাথ কাজিরখিল গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গ্রাম গ্রামান্তর হইতে উভয় সম্প্রদায়ের সাধারণ মানুষের দল কী এক গভীর বেদনায় বিহ্বল হইয়া ছুটিয়া আসিতেছে। নীরবে আসিয়া সবাই দাঁড়াইয়া আছে। সকলেরই সজল আঁখি। গান্ধীজী যে তাহাদেরই লোক। কিছুদিন আগেও তাঁহার সান্নিধ্য পাইয়াছে। শীতের সন্ধ্যায় সেদিন প্রশান্ত প্রকৃতি মানুষের নিবিড় নীরবতায় ও মৌনবেদনায় আপনাকে ঘন কুয়াশায় হারাইয়া ফেলিল। শিশির পাতের শব্দও সেদিন রূঢ় শোনাইল।

ত্রৈলোক্যনাথ মানুষের অন্তরের উত্তাপ পাইলেন। আজিকার বিয়োগ-বেদনাবিধুর মিলন-সন্ধ্যায় হিন্দু ও মুসলমানের ভেদাভেদ বুদ্ধি লোপ পাইল।



পূর্ব্ববঙ্গের সাধারণ হিন্দুজনতা বিহ্বল ও আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে। ধীরে ধীরে পায়ের মাটি সরিয়া যাইতেছে। ত্রৈলোক্যনাথ ভাবেন—সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায় কেন মন ও প্রাণ খুলিয়া স্বাধীনতার অংশীদার হইতে পারিতেছে না। সেও ত দেশের একজন, সেও স্বাধীন। কে বলিয়াছে সে দ্বিতীয় শ্রেণীর রাষ্ট্রিক। কেন এত ভয়, কেন এত বিষাদ?

ত্রৈলোক্যনাথ তাই উন্মনা, নিজের জন্য নহে পুর্ব্ব পাকিস্তানের সংখ্যালঘু সাধারণ মানুষের জন্যই তাঁহার এই উৎকণ্ঠা।

তিনি একথাও জানেন—এখানে আর ভরসা নাই, ভালবাসা নাই, তাই কীসের আশায় আপন বলিয়া মানুষ আর নিজের বাসভূমি আঁকড়িয়া পড়িয়া থাকিবে। 'সপ্তপুরুষ যেথায় মানুষ সে মাটি সোনার বাড়া' হইলেও রাত্রির ব্যবধানে তাহা পরবাসে রূপান্তরিত হইয়া গিয়াছে।

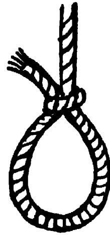
ত্রৈলোক্যনাথ সঙ্কল্প করিলেন—"আমি দেশত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইব না, আমি পাকিস্তানে থাকিব; পাকিস্তানের জনগণের সুখ দুঃখের অংশ গ্রহণ করিয়া থাকিব। এই দেশ পূর্ব্ববঙ্গ আমার দেশ, আমি এই দেশ কেন ত্যাগ করিয়া যাইব। আমাদের ব্যক্তিগতভাবে চিন্তা করিলে চলিবে না, সমষ্টিগতভাবে চিন্তা করিতে হইবে। দেশত্যাগ সমস্যার সমাধান নয়, দেশে বসিয়াই সমস্যার সমাধান করিতে হইবে। আমি যদি দেশ ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাই তবে আমি যাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলাম তাহাদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা হইবে।"

কিন্তু যাঁহারা বিশ্বাস উদ্রেক করিবেন, দুঃখের তামসী রজনীতে যাঁহারা প্রদীপের আলো দেখাইবেন, আতঙ্কের লগ্নে যাঁহারা শঙ্কাহরণ করিবেন, যাঁহাদের অবলম্বন করিয়া চাষী, মজুর, জেলে, তাঁতী, নাপিত, নমঃশূদ্রের দল সমাজের চাকাকে সচল রাখিবে, মুচি, মেথর, গ্রাম্যপুরোহিত, পাঠশালার শিক্ষক প্রভৃতি নানা বৃত্তির নানাস্তরের মানুষ গ্রাম্যজীবনকে গতিশীল ও প্রাণবন্ত রাখিবেন—তাঁহারই আজ সর্ব্বাগ্রে দেশান্তরী হইলেন, পুরুষানুক্রমিক বাসভূমি ভয়ে ও ভাবনায় পিছনে ফেলিয়া নিরুদ্দেশের পানে ছুটিয়া চলিলেন। ত্রৈলোক্যনাথের স্থির সিদ্ধান্ত কোন কারণেই তিনি দেশত্যাগ করিবেন না। তিনি ভাল করিয়াই জানেন পাকিস্তানের যাঁহারা

কর্ণধার তাঁহারা ত্রৈলোক্যনাথকে ভাল চোখে দেখিবেন না, জীবন তাঁহার ওষ্ঠাগত করিয়া তুলিবে, পদে পদে বিপত্তি আসিবে তবু বিপ্লবী সত্তা তাঁহার কানে কানে শেষ কথাটি কহিয়া গেল—

"তোর ডাক শুনে যদি কেউ না আসে
তবে একলা চল, একলা চল, একলা চল রে।"

ত্রৈলোক্যনাথ একলা চলার শপথ লইয়া নিজের গ্রামে ফিরিলেন। বিদেশী শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামের দিন শেষ হইয়াছে। এইবার সামাজিক কুসংস্কার, মানুষের অবমাননা, অর্থনৈতিক দুর্গতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম সুরু করা মনস্থ করিলেন।



সতীশচন্দ্র দাশগুপ্তের হাতে তাঁহার কেন্দ্র চতুষ্টয়ের সব দায় দায়িত্ব বুঝাইয়া ও ভার দিয়া ত্রৈলোক্যনাথ স্বগ্রামে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

ইত্যবসরে ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে বরিশাল সহরে সমাজবাদী দলের সম্মেলন আহূত হইল। দেশ বিভাগের পূর্ব্বে ত্রৈলোক্যনাথ সর্ব্বভারতীয় সমাজবাদী দলের সদস্য ছিলেন। দেশ বিভাগের পর পাকিস্তান সমাজবাদী দল নামে ভারতের সম্পর্ক শূন্য নূতন

দলের আবির্ভাব হইল। সভাপতি ত্রৈলোক্যনাথ স্বয়ং ও সম্পাদকদ্বয় মোবারক সাগর (করাচী) ও প্রফেসর পুলিন দে (চট্টগ্রাম)

"পাকিস্তান সোসালিষ্ট পার্টির ভবিষ্যৎ মন্দ ছিল না, কিন্তু অবস্থার চাপে অগ্রসর হইতে পারে নাই। যেখানে সাম্প্রদায়িকতা ও দুর্নীতি সেখানে সমাজতন্ত্রবাদ চলিতে পারে না। সমাজতন্ত্র-বাদের জন্য প্রয়োজন সমাজতান্ত্রিক আবহাওয়া তৈয়ার করা। পাকিস্তান সমাজতান্ত্রিক নেতারা সে আবহাওয়া তৈয়ার করিতে পারেন নাই।" রাজশক্তি করায়ত্ত হওয়ায় দেশের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ক্ষমতার লিপ্সায় উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছে। দুর্নীতি সংক্রামক ব্যাধির মত সমাজ-জীবনের স্তরে স্তরে পরিব্যপ্ত হইয়া চলে, সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তির মাদকতায় জনসাধারণকে আচ্ছন্ন রাখিবার প্রয়াস চলিল, নচেৎ তাহাদের চোখ ফুটিবে। উচ্ছৃঙ্খলতার মহোৎসবে দেশের যুব শক্তিকে উদ্দাম করার প্রচেষ্টা চলিল।

সমাজ-তান্ত্রিক পরিবেশ গঠনের জন্য প্রয়োজন শিক্ষার। যাহাতে মানসিক প্রসারতা আসে, সবাই 'প্রত্যেকে আমরা পরের তরে' এই ভাবনা পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি করিতে পারে তাহারই শিক্ষা দেওয়া দরকার। সবার প্রতি মমত্ববোধ ও সকলের সহিত একাত্মবোধ না জাগিলে সমাজতন্ত্রের বুলি আওড়ান নিরর্থক। সৌখীন মজদুরী চলিতে পারে, কৃষাণ মজুরের আন্তরিকতা মেলে না। আইন করিয়া এই মনোভাব প্রবর্ত্তন করা চলে না, কথার মালা গাঁথিয়া বক্তৃতার বন্যায় এ মনোবৃত্তি ফুটাইয়া তোলা যায় না।

রেঙ্গুনে এশিয়া সমাজবাদী সম্মেলন আহূত হইয়াছে। সভাপতি ত্রৈলোক্যনাথ বহু চেষ্টা করিয়াও ছাড়পত্র পাইলেন না। সম্মেলনে যোগ দেওয়া হয় নাই। তাঁহার টেলিগ্রাম পঠিত হইল।

১৯০৮—'৪৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই সুদীর্ঘ চল্লিশ বৎসর ত্রৈলোক্য-

নাথ গৃহছাড়া। এই দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে আপন গ্রামে আসিয়া বসবাস সুরু করিলেন। গঠনমূলক কাজে আত্মনিয়োগ আরম্ভ হইল। এইবারের সংগ্রাম দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে, কুসংস্কারের বিরুদ্ধে, সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে। দীর্ঘ চল্লিশ বৎসর রাজনৈতিক বিপ্লবের সাধনা করিয়া স্বাধীনতা লাভের অব্যবহিত পরেই ত্রৈলোক্যনাথ বুঝিতে পারিলেন এইবার সামাজিক বিপ্লব ও সাংস্কৃতিক বিপ্লব না ঘটাইলে রাজনৈতিক স্বাধীনতার কোন মূল্য থাকিবে না।

স্বাধীনতা অর্জ্জনে আসে নাই, অর্পণে আসিয়াছে, তাই তাহার স্থায়িত্ব নির্ভর করিবে জাতির চরিত্রের উপর। প্রকৃত জনদরদী নেতা ও সরকারের কর্ণধারগণের প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য জাতীয় চরিত্র সুদৃঢ় করা, জনতাকে সবল, সুস্থ ও সুদৃঢ় করিয়া গড়িয়া তোলা।

"আমি স্থির করিলাম আমার গ্রাম এবং আমার অঞ্চলকে আদর্শ গ্রামে পরিণত করিব। আমার অঞ্চলে কেহ অশিক্ষিত থাকিবে না, বেকার থাকিবে না, অনাহারে অচিকিৎসায় কাহারও মৃত্যু হইবে না, মামলা মোকদ্দমা আপোষে নিষ্পত্তি হইবে।"

আলো আলো করিয়া বক্তৃতা না করিয়া ত্রৈলোক্যনাথ দিয়াশলাই কাঠি জ্বালাইতে সচেষ্ট হইলেন। সীমিত হইলেও আলোর বিচ্ছুরণ হইবে।

গ্রামে বাঁশের চরকা প্রস্তুতের কেন্দ্র স্থাপিত হইল, বালিকা বিদ্যালয়ের পত্তন হইল, দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠিত হইল, ছোট একটি গ্রন্থাগারও গড়িয়া উঠিল। গ্রামের ঘরে ঘরে বাঁশের চরকা চালু করা হইল; তুলা জোগাড় করিয়া জোগান দেওয়া চলিল। উৎসাহী গ্রাম্য কিশোরী ও বধূরা এমন কি প্রৌঢ়া ও বৃদ্ধারাও পরম উৎসাহে সুতা কাটা আরম্ভ করিলেন। মজুরীর বিনিময়ে তাহাদের হাতে কাটা সুতা সংগ্রহ করিয়া নূতন বসান তাঁতে নিয়মিত কাপড় বোনা

চলিতে লাগিল। স্বয়ম্ভরতার আস্বাদে ঘরে ঘরে স্পন্দন জাগে, গ্রাম জুড়িয়া কর্ম্মযজ্ঞের চেতনা সঞ্চারিত হয়।

মাঝে মাঝে আলোচনা সভা বসে। কর্ম্মীরা ও গ্রামের জনগণ একত্র হইয়া গ্রামের রাস্তা ঘাট, পানীয় জল ও মাঠের ফসল লইয়া আলোচনা করে। চরকা বিভাগ, শিক্ষা বিভাগ, স্বাস্থ্য বিভাগের কাজের খতিয়ান লওয়া হয়। ধীরে ধীরে সবাই গ্রামের সুখ দুঃখের সহিত জড়িত হইয়া পড়ে। একাত্মতা অনুভব করিতে থাকে!

গ্রামভিত্তিক জনকল্যাণমূলক সাধারণের কর্ম্মপ্রচেষ্ঠায় সরকারের সক্রিয় সাহায্য ও অর্থানুকূল্য না থাকিলে জন-সাধারণের ঐকান্তিক উদ্যমেও কাজের গতি নিরবিচ্ছিন্ন ও নিয়মিত ভাবে চলিতে পারে না। কিন্তু পাকিস্তানের শাসককুল সাহায্য করা দূরের কথা পরোক্ষে অসহযোগিতা করিতে থাকেন। তাই ধীরে ধীরে ত্রৈলোক্যনাথের সযত্ন রোপিত চারা বৃক্ষে রূপান্তরিত হইবার পূর্ব্বেই শুকাইতে সুরু করিল। অর্থকৃচ্ছতার জন্য কর্ম্মী সংগ্রহে বাধা আসিল। বিদ্যালয় বন্ধ হইতে চলে, দাতব্য চিকিৎসালয় চলিবার সামর্থ্য হারায়, 'ত্রৈলোক্য পাঠাগারের'ও অকাল মৃত্যু হইল।

বহু স্থানে যাতায়াত করিয়া বহু চেষ্টা সত্ত্বেও ত্রৈলোক্যনাথ তদানীন্তন শাসক গোষ্ঠীর নিকট হইতে কোন সাহায্যের প্রতিশ্রুতি পাইলেন না। গঠন মূলক কার্য্যের স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল।

সাম্প্রদায়িকতার উগ্রবিষে ও ছাত্র সমাজকে বেশী দিন মোহগ্রস্ত রাখা চলিল না। ধর্ম্মের ভিত্তিতে এক পথের পথিক হইলেও বাঙলার সংস্কৃতির উপর আঘাতকে বাঙালী যুব ও ছাত্র সমাজ প্রত্যাঘাত করিল। বিজাতীয় উর্দুকে সিংহাসনে বসাইয়া বঙ্গভাষাকে পথে বসাইতে তাহারা রাজী নহে। তাই ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দের একুশে ফেব্রুয়ারী ঢাকায় রাজপথ তারুণ্যের কলকণ্ঠে সোচ্চার হইল।

শাসকের অস্ত্রে তাজা প্রাণ পথে লুটাইল। হারানো বাঙালীদের পুনরাবির্ভাব হইল। ত্রৈলোক্যনাথ নিকষ কালো আকাশে বিদ্যুতের রূপালী রেখা দেখিলেন। তাঁহার মনে পড়িয়া যায় ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দের ২১শে ফেব্রুয়ারীর কথা। আজও ২১শে ফেব্রুয়ারী। ইহা কেবল অসংলগ্ন লগ্ন সমাবেশ নয়, ইহা ইতিহাসের ইঙ্গিত।

ঘাত প্রতিঘাতে ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দ আগাইয়া আসে। উত্তেজিত মোহের ঘোর ধীরে ধীরে কাটিয়া যাইতেছে। নূতন চেতনা, নূতন অভিলাষ নূতন প্রেরণা বাঙালীর মনের কোণে নূতনকথা কহিতে সুরু করিয়াছে।

এমনি সময় সাধারণ নির্ব্বাচন। পাকিস্থানের অন্যতম-জন্মদাতা অবিভক্ত বাঙলার প্রধানমন্ত্রী শহীদ সুরাবর্দ্দী সাহেব ভিন্ন পথের পথিক হইয়া শের-ই-বঙ্গাল জনাব ফজলুল হকের সহিত মিলিত হইয়াছেন বাঙালীর স্বার্থে বাঙলার মানুষের উপর অবাধ লুণ্ঠনকে প্রতিহত করিতে। অনুগামী যৌবরাজ্যের ছত্রপতি শেখ মুজিবর রহমান ও বিপ্লবী বাঙলার চিরজাগ্রত তরুণদল।

চিরদিনের কর্ম্মচঞ্চল ত্রৈলোক্যনাথ আজ কর্ম্মহীন। দেশের জন্য সেই আঠার বৎসর হইতে আত্মনিয়োগ করিয়া আজ পঁয়ষট্টি বৎসরের বৃদ্ধ—ইচ্ছা ও শক্তি থাকিতেও কিছু করিবার তাঁহার উপায় নাই। তদানীন্তন নব-উন্মেষিত বাঙালী মানসিকতার পরিপ্রেক্ষিতে স্থির করিলেন, যদিও পৃথক নির্ব্বাচন তবুও তিনি নির্ব্বাচনে অংশ গ্রহণ করিবেন।

সংখ্যালঘু সম্প্রদায় এই ঘোর দুর্দ্দিনের "একমত হইতে পারেন নাই। তাই বিভিন্ন নামে বিভিন্ন দল নির্ব্বাচন সংগ্রামে মাঠে অবতীর্ণ হইলেন। সংযুক্ত প্রগতিদল, পাকিস্তান জাতীয় কংগ্রেস, সিডিউল্ড কাষ্ট ফেডারেশন হইতে এবং স্বতন্ত্র ভাবে বহু লোক নির্ব্বাচনে দাঁড়াইলেন। আমি সংযুক্ত প্রগতিশীল দল হইতে দাঁড়াইলাম।"

সংযুক্ত প্রগতিশীল দলের নেতা ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত, সভ্যদের মধ্যে কামিনীকুমার দত্ত (কুমিল্লা) ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্ত্তী (ময়মনসিংহ) প্রভাসচন্দ্র লাহিড়ী (রাজসাহী) সাংগ্রাম মাঝি (রাজসাহী) ফণী মজুমদার (মাদারীপুর) রমেশ দত্ত (ভাঙ্গা) দেবেন্দ্রনাথ ঘোষ (বরিশাল) হারাণচন্দ্র ঘোষচৌধুরী (নোয়াখালী) অধ্যাপক পুলিন দে (চট্টগ্রাম) ডাঃ শৈলেন সেন (ঢাকা) আশুতোষ সিংহ (কুমিল্লা) প্রভৃতি।



নির্ব্বাচনে অর্থের প্রয়োজন কিন্তু ত্রৈলোক্যনাথের অর্থ কোথায় ? তাই গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে পায়ে হাঁটিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়ান। তাঁহার নির্ব্বাচনী এলাকা নেত্রকোনা মহকুমার বারটি থানা এবং কিশোরগঞ্জ মহকুমার আটটি থানা। আপন নির্ব্বাচনী এলাকায় পদব্রজে ত্রৈলোক্যনাথ দেড়মাসে সফর শেষ করিলেন। যেখানেই যান সেখানেই অভ্যর্থনা, সেখানেই গ্রামের আবালবৃদ্ধবনিতা আতিথেয়তায় তৎপর হইয়া উঠে। চা, পান, তামাক ঘরে ঘরে লইয়া আসে। তামাক না খাইলেও চা ও পান প্রতি ঘরে গ্রহণ করিতে হয়। সাধারণ মানুষের অন্তরের প্রীতি ও উত্তাপ ত্রৈলোক্যনাথ অনুভব করেন।

কর্ম্মীরা প্রথানুযায়ী ভোজনাদি না পাইলেও প্রবল উৎসাহে নির্ব্বাচনে মাতিয়াছে। ষাটটি নির্ব্বাচন কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ সমাপ্ত

হইল। সর্ব্বসাকুল্যে ত্রৈলোক্যনাথের খরচ হইল আটাশ শত টাকা। এত অল্প ব্যয়ে বোধহয় এই উপমহাদেশের কোন নির্ব্বাচন প্রার্থীই জয়ী হইয়া আসিতে পারেন নাই। ত্রৈলোক্যনাথ জয়ী হইলেন। শহীদ সুরাবর্দ্দী ও তাঁহার সুযোগ্য সহচর শেখ মুজিবর রহমান মুস্লীম আওয়ামি লীগের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করিলেন। ফজলুল হকেরও কৃষক প্রজা পার্টি সাফল্য অর্জ্জন করিল। পূর্ব্ব পাকিস্তানে যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠিত হইল। ত্রৈলোক্যনাথ আশার আলো দেখিতে পাইলেন। ত্রৈলোক্যনাথ দুঃখ করিয়া লিখিয়াছেন "নিজের অক্ষমতা ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার জন্য আমার এলাকায় দুই চারিটি টিউবওয়েল বসান ছাড়া বিশেষ কিছু করিতে পারি নাই। আমার ভোটার ও কর্ম্মীগণ আমার জন্য যথেষ্ট করিয়াছেন, প্রতিদানে আমি তাহাদের জন্য কিছুই করিতে পারি নাই।"

তখন পাকিস্তানের কায়েমী স্বার্থ ও তাঁহাদের ক্রীড়নক রাজনৈতিক নেতার দল দেশ ভুলিয়া, জনতার সুখ দুঃখ ভুলিয়া কেন্দ্রে ক্ষমতার লড়াইয়ে উন্মত্ত। হাত হইতে হাতে শাসন ক্ষমতা ফিরিতে থাকে। পূর্ব্ব বাঙলায়ও তাহার প্রতিচ্ছায়া ঘনায়। অকস্মাৎ প্রধান সেনাপতি জেনারেল আয়ুব খাঁন ক্ষমতা হস্তগত করিয়া পাকিস্তানে মিলিটারী শাসন কায়েম করিলেন।

পরিষদের সকল সদস্যকে বরখাস্ত করা হইল। প্রেসিডেণ্ট আয়ুব খাঁন নূতন অস্ত্র আমদানী করিলেন। E.B.D.O. যাহাকে এক কথায় হইত 'এবডো' অর্থাৎ ভবিষ্যতে নির্ব্বাচনে তাঁহারই দাঁড়াইতে পারিবেন যাহাদের সক্রিয়তার সার্টিফিকেট আছে। সেই সার্টিফিকেট দিবে কে? পাকিস্তান সরকার। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ যাঁহারা তাঁহার ক্ষমতার বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে দেখা দিতে পারেন ও বিরুদ্ধাচরণ করিতে পারেন তাঁহাদের সকলকার সততার সমীক্ষা চলিল। জনতাকে বলা হইল কে কেমন তাহাদের স্বরূপ

নির্ণয় করিয়া রাখিতে। প্রচার চলিল দেশের শাসন ব্যবস্থাকে দুর্নীতি মুক্ত করিবার প্রয়াসে আয়ুব খাঁ বদ্ধ পরিকর। রাজনৈতিক প্রতিবন্ধকদের রঙ্গমঞ্চ হইতে কয়েক বৎসরের মধ্যে বিতাড়িত করিবার উদ্দ্যেশ্যে 'এবডো' প্রযুক্ত হইল।

ত্রৈলোক্যনাথেরও উপর নোটিশ। বক্তব্য, আগামী ৬ বৎসরের মধ্যে কোন নির্ব্বাচনে না দাঁড়ানোর প্রতিশ্রুতি প্রদান করিলে কিছু করা হইবে না নচেৎ ট্রাইব্যুনালের সম্মুখে বিচারের জন্য উপস্থিত হইতে হইবে। প্রতিশ্রুতি দিতে অস্বীকার করায় ত্রৈলোক্যনাথকে ঢাকায় বিশেষ আদালতের সম্মুখে উপস্থিত হইতে হইল।

বিচারপতি জাষ্টিস্ আক্রাম।

অভিযোগ একে একে পাঠ করা শেষ হইল।

ত্রৈলোক্যনাথ দাবী করেন "আমার বিরুদ্ধে যাহারা রিপোর্ট দিয়াছেন তাহাদিগকে কোর্টে হাজির করিতে হইবে; আমি তাহাদিগকে জেরা করিব।"

বিচারপতির নির্দ্দেশ—তাহাদের কোর্টে হাজির করা হইবে না।

এক দফা অভিযোগ, ত্রৈলোক্যনাথ বরিশালে যে সোসালিষ্ট কন্‌ফারেন্স ডাকিয়াছিলেন তাহাতে এমন কতকগুলি লোক ছিল যাহারা পাকিস্থান বিরোধী।

ত্রৈলোক্যনাথ দাবী করেন, তাহাদের নাম কোর্টে প্রকাশ করা হউক।

সরল উত্তর—তাহাদের নাম প্রকাশ করা হইবে না।

দ্বিতীয় অভিযোগ, কলিকাতার আশে পাশে এক সোসালিষ্ট সভায় বক্তৃতা দেবার সময় ত্রৈলোক্যনাথ নাকি বলিয়াছেন 'কাশ্মীর ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ'।

ত্রৈলোক্যনাথ জানিতে চাহেন, সে সভা কোন তারিখে এবং কোন স্থানে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

আবার উত্তর— তাহা বলা হইবে না।

তৃতীয় অভিযোগ, ত্রৈলোক্যনাথ নাকি দুই বাঙলা এক করার চেষ্টা করিয়াছেন।

ত্রৈলোক্যনাথ—প্রমাণ কি!

উত্তর—তাহা বলা হইবে না।

চতুর্থ অভিযোগ, ত্রৈলোক্যনাথ গোপন নাশকতা মূলক কার্য্যের চেষ্টা করিয়াছেন।

ত্রৈলোক্যনাথ প্রশ্ন করেন, 'এতকাল আমাকে গ্রেপ্তার করা হইল না কেন'? দ্বিতীয় বিচারক পাঞ্জাবী মিলিটারী অফিসার আর তৃতীয় বিচারক সিলেটবাসী বেসামরিক ব্যক্তি। তৃতীয় বিচারক জবাব দিলেন—

'আপনি বৃদ্ধ—তাই গ্রেপ্তার করা হয় নাই'।

সর্ব্বশেষ ও জঘন্য অভিযোগ, ত্রৈলোক্যনাথ ফাঁকি দিয়া বহু অর্থ আত্মসাৎ করিয়াছেন। তিনি মাসিক বেতনের টাকা বেশী লইয়াছেন, গাড়ীতে নিম্ন শ্রেণীতে ভ্রমণ করিয়া উচ্চ শ্রেণীর বিল করিয়াছেন। সরকারী উকিলের সওয়াল শেষে তাহাকে জবাব দিতে বলা হইল।

ত্রৈলোক্যনাথ বলেন, "বড় বড় রাজনৈতিক নেতারা পূর্ব্বে যাহাদের দেশে সুনাম ছিল, অবস্থার পরিবর্ত্তনে আজ সকলেই 'এবডোতে' পড়িয়াছেন। পলিটিক্যাল লিডার্সদের পলিটিক্যাল ফিল্ড হইতে দূরে সরাইয়া রাখার ইহা একটী কৌশল কিনা, আমি ট্রাইব্যুনালকে অনুরোধ জানাইতেছি ইহার অনুসন্ধান করা হউক।"

লিখিত বিবৃতি পেশ করা হইলে বিচার শালা ভঙ্গ হইল। রায়ে প্রকাশ পাইল ১৯৬৬ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ত্রৈলোক্যনাথ কোন নির্ব্বাচনে দাঁড়াইতে পারিবেন না।

ইহাতেও নিস্তার নাই। একদিন গ্রামের বাড়ীতে, সরকারী সমন আসিয়া হাজির। প্রাদেশিক শাসন পরিষদের সভ্য হিসাবে যে বেতন ও ভাতা ত্রৈলোক্যনাথ গ্রহণ করিয়াছেন তাহার মধ্যে নাকি বহু অর্থ ফাঁকি দিয়া লওয়া হইয়াছে। সুতরাং অবিলম্বে তাহা প্রত্যর্পণ করিতে হইবে। নির্দ্দিষ্ট তারিখে ট্রেজারীতে জমা হওয়া চাই।

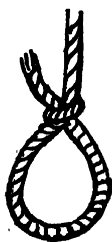
এ, জি অফিস হইতে পরীক্ষার পর তবে বেতন ও ভাতা মঞ্জুর হইয়াছে তবুও রেহাই নাই। সকল সদস্যদের উপর এই আদেশ।

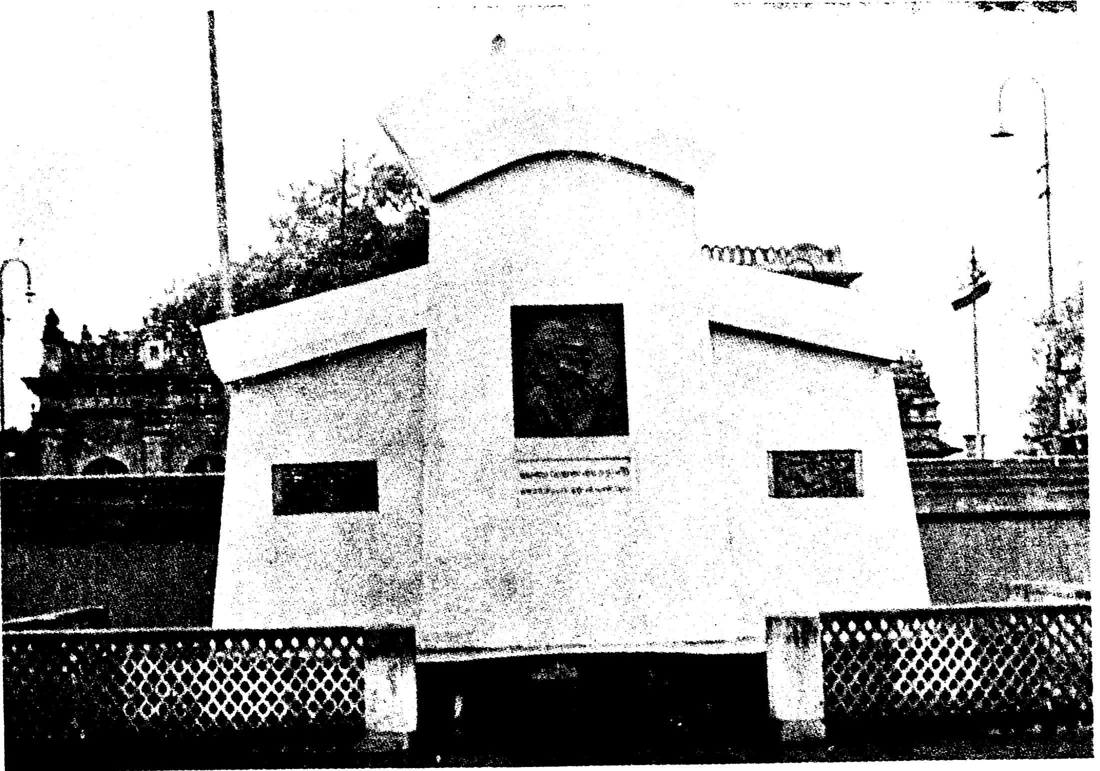
ত্রৈলোক্যনাথের অর্থ নাই কী করিবেন। পৈত্রিক জমি বিক্রয় করিয়া অর্থ জমা করিতে হইল।

"সরকারের দাবী পূরণ করিলাম, এম্. পি, এ হওয়ার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিলাম।"

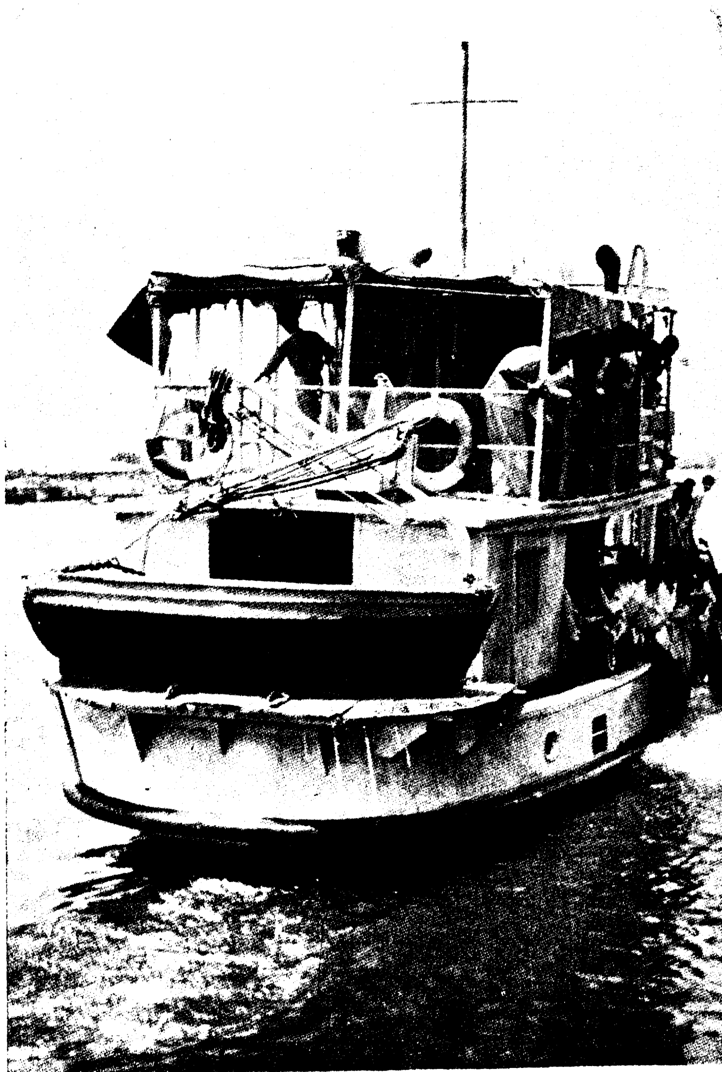
রবীন্দ্রনাথের পংক্তি কানে বাজিতে থাকে।

"বিচারশালার খেলা ঘরে আর
না রহিব অবরুদ্ধ।"





কেওড়াতলা মহাশ্মশানে মহারাজের স্মৃতিসৌধ



ঢাকার বুড়ীগঙ্গা নদীতে মহারাজের চিতাভস্ম বিসর্জ্জন

১৯৬৫ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে আয়ুব খাঁনের সৈন্যবাহিনী আচম্বিতে কাশ্মীরের পথে জম্মুর ছাম্ব এলাকায় ঝাঁপাইয়া পড়িল। তদানীন্তন ভারতের প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রীও নিরুত্তর থাকিলেন না। 'তলোয়ার কা বদলী তলোয়ারের' নীতি গ্রহণ করিলেন। ভারত ও পাকিস্তানের সৈন্যবাহিনী যাহারা একদিন সম্মিলিতভাবে ব্রিটিশরাজ শক্তির জন্য কাঁধে কাঁধ মিলাইয়া জীবন দান করিয়াছিল তাহারাই আজ 'বণ্ঠ পাকড়ি ধরিল আঁকড়ি' এবং পরস্পরের প্রাণ লইতে মরণোৎসবে মাতিয়া উঠিল।

সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব্ব পাকিস্তানের প্রত্যেক জিলায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের শীর্ষস্থানীয় লোক, দেশের উভয় সম্প্রদায়ের লোকের উপর যাহাদের প্রভাব আছে—প্রসিদ্ধ রাজনৈতিক নেতা, উকীল, ডাক্তার, ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রী, এম, পি, এ, ব্যবসায়ী সকলেই নিরাপত্তা আইনে বন্দী।"

স্বাধীনতার দীর্ঘ আঠার বৎসর পর ত্রৈলোক্যনাথ সাতাত্তর বৎসর বয়সে বন্দী হইলেন। বিদেশী শক্তি যাহা করে নাই, আয়ুবশাহী তাহাই করিলেন—তৃতীয় শ্রেণীর বন্দী।

সঙ্গের তোষক ও মশারী জেল গেটে রাখিয়া দিল। ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে দোতলায় ১৪নং ঘর। ভূমিতে শয়ন করিতে হইবে। ঠাণ্ডা ভাত ও ডাল ইহাই খাদ্য। মশারী ব্যবহারের অধিকার নাই। খোরাকী দৈনিক দেড় টাকা। ইহার মধ্যে কাঠ, চা-চিনি, তেল, নুন, চাল, ডাল, মাছ, তরকারী সবই কিনিতে হইবে। জেলের ঠিকাদার এই সব সরবরাহ করিবে।

মাসিক ভাড়া ৫ টাকা, তাহার মধ্যেই সংবাদপত্র, তেল সাবান, বিড়ি সিগারেট সব কিছুই করিতে হইবে। জামা কাপড় পাওয়া যায় নাই, পরে পাওয়া যাইলেও শীতবস্ত্র দেওয়া হয় নাই।

সতের দিনের যুদ্ধ শেষ হইল। কিন্তু সতের মাস পরেও অনেক

বন্দী মুক্তি পায় নাই। শারীরিক অসুস্থতার জন্য ও মাঝে মাঝে অজ্ঞান হইয়া পড়ায় ত্রৈলোক্যনাথকে ১৯৬৬ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে আগষ্ট ময়মনসিংহ জেল হইতে স্বাস্থের কারণে মুক্তি দেওয়া হয়।

পাকিস্তানের ইতিহাস আগাইয়া চলে।

পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় শাসককুলের ক্রমবর্দ্ধমান শোষণে ও পেষণে পূর্ব্ববাঙলার জনসমাজ দিন দিন সর্ব্বস্বান্ত হইয়া আসিতেছে। মহাভারতে ব্রিটীশ স্বার্থ একদা যাহা করিয়াছিল, সেই নীতি অনুসৃত হইতে লাগিল। পশ্চিম পাকিস্তানের কাঁচা-মালের জোগানদার পূর্ব্ব বাঙলা পশ্চিম পাকিস্তানের উৎপন্নের বাজার হইয়া রহিল। ব্রিটীশ রাজত্বের অবসানে যেটুকু অর্থ যেটুকু সামর্থ্য যেটুকু স্বস্তি বাঙলার ঘরে অবশিষ্ট ছিল তাহাও নিঃশেষিত।

পূর্ব্ব বাঙলা সম্পূর্ণরূপে রিক্ত হইয়া পড়িল।

ইতিহাসের চিরাচরিত নিদানে আয়ুব খাঁ অকস্মাৎ অপসারিত হইলেন, আসিলেন তাঁহারই প্রধান-সেনাপতি জেনারেল ইয়াহিয়া খাঁ। পাঞ্জাবী গেলেন, পাঠান আসিলেন কিন্তু বাঙালায় চোখের জল ঘুচিল না।

১৯৬৯ খ্রীষ্টাব্দ। পূর্ব্ব বাঙলায় তারুণ্য আজ জাগ্রত ; নিষ্পেষণের চক্রের গতিরোধ করিতে তাহারা বদ্ধ পরিকর। বিদ্রোহী বাঙলার নেতৃত্বে মুজিবর রহমন ঘোষণা করিলেন পূর্ব্ববাঙলায় আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার।

ধর্ম্মের উপর তিনি সংস্কৃতিকে স্থান দিলেন। পূর্ব্ববাঙলার আপামর জনসাধারণ তাঁহার অনুগামী হইল।

ত্রৈলোক্যনাথ আশীতে পদার্পণ করিলেও মানসিকতায় আজও তরুণ। আজও বিপ্লবী। তিনি পূর্ব্ববাঙলার অঙ্গনে ইতিহাসের নবছন্দ শুনিতেছেন, নূতন যুগের উদয় লগ্নের অপেক্ষায় আছেন। তিনি দেখিয়াছেন পূর্ব্ববাঙলায় তরুণদলের মানসিকতায় নবচেতনার

বোধন, তিনি শুনিয়াছেন তাহাদের অন্তরে নূতন সমাজ প্রতিষ্ঠার উন্মুখ হৃদ্‌স্পন্দন, তিনি বিশ্বাস করেন এইবার সাম্প্রদায়িকতার মোহ-শৃঙ্খল ভঙ্গ করিয়া তরুণ সমাজ ধর্ম্মনিরপেক্ষতার নবসূর্য্যালোকে প্রকাশ পাইবে। সাম্য ও স্বাধীনতায় চিরদীপ্ত রূপরেখা এইবার গহন অন্ধকার হইতে মুক্তি পাইবে। বাঙালী আবার বাঙালী হইবে।

যে রবীন্দ্রনাথ একদিন বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের যুগ হইতে বিপ্লব-বহ্নিতে সমিধ সরবরাহ করিয়াছেন, রবীন্দ্রনাথের সেই বাণী সেই গীতিনির্ঝর নূতন করিয়া পূর্ব্বাঙলার তরুণদের প্রাণে আত্ম-প্রতিষ্ঠার অনুপ্রেরণা জাগাইল। শাসক কুলের কঠোর নিষেধ সত্বেও বাঙলার ঘরে ঘরে রবীন্দ্রনাথের গান, কবিতা, সুর সংক্রামিত হইয়া ফিরিতে লাগিল। সাত কোটী বাঙালী—সমস্বরে গাহিয়া উঠিল—

'সোনার বাঙলা আমি তোমায় ভালবাসি।'

বহু চেষ্টা সত্বেও প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খাঁ সাধারণ নির্ব্বাচন আর স্থগিত রাখিতে পারেন না। ঘোষণা করিতে হইল ১৯৭০ খ্রীষ্টাব্দের শেষ পাদে নির্ব্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে। দেশব্যাপী উত্তেজনা। প্রগতিশীল সত্তজাগ্রত জাতীয়তাবাদী শক্তির সম্মুখে স্থবির ধর্ম্মভিত্তিক ভাবচেতনা তৃণসম উৎক্ষিপ্ত হইয়া চলে। বাঙালীর প্রাণের নেতা বাঙালীত্বের ভাবমূর্ত্তি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর হাল ধরিয়াছেন। বাঙালীর পরিচয় তাহার ভাষায়, তাহার ভাবনায় তাহার বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক মানসিকতায়। সে মুসলমান হউক, হিন্দু হউক, বৌদ্ধ হউক, খৃষ্টান হউক তাহার প্রথম ও শেষ পরিচয় বাঙালী।

অসুস্থ ত্রৈলোক্যনাথকে চিকিৎসার্থে ভারতে আনিবার চেষ্টা বহু দিন ধরিয়া চলিতেছে, কিন্তু পাকিস্তানী শাসক কুল ভিসা মঞ্জুর করিতে নারাজ। ইতিহাসের কোন্ অজ্ঞাত বিধানে ইয়াহিয়া

সরকার ১৯৭০ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে ত্রৈলোক্যনাথকে কিছুদিনের মেয়াদে ভারতে আসিবার অনুমতি দিলেন।

যশোহরের পথে সীমান্তে ত্রৈলোক্যনাথ উপস্থিত। তাঁহাকে অভ্যর্থনা জানাইতে আজ সহগামী অনুগামী ছাড়াও অনুরাগী জনসাধারণের জনস্রোতে উভয় বাঙলার সীমান্ত আনন্দমুখর। ইহার পূর্ব্বেও ত ত্রৈলোক্যনাথ ভারতে আসিয়াছেন। কই সেদিন ত এত উত্তেজনা উল্লাস ও উদ্‌গ্রীবতা ছিল না। কেন? কি কারণ? আজ ত্রৈলোক্যনাথ ব্যক্তিসত্তা নন। আজ তিনি মহাকালের ভগ্নদূত; ইতিহাসের ভেরী বাদক। আসন্ন বিপ্লবের প্রতিচ্ছবি তাঁহার মুখ-মণ্ডলে, আগামী দিনের সংগ্রামের অশুভ পদধ্বনি তাঁহার হৃৎস্পন্দনে। তাঁহার মুখে হাসি চোখে জল।

জনতা জয়ধ্বনি করে প্রণাম জানায়।

সরকারী গাড়ী থাকিলেও তিনি পুরাতন এক বিপ্লবী অনুগামীর গাড়ীতে উঠিয়া কলকাতার উদ্দেশ্যে রওনা হইলেন।



ইয়াহিয়া সরকারের ছাড়পত্র সীমিত জানা থাকিলেও ত্রৈলোক্যনাথ অন্তরে অনুভব করিতেছেন বিশ্ব বিধাতার ছাড়পত্রের মেয়াদও সঙ্কুচিত হইয়া আসিতেছে। তাই কলিকাতায় আসিয়া তিনি বিদ্যুৎ গতিতে না-সারা কাজ শেষ করিয়া চলেন, না বলা কথা শোনাইয়া যান।

শুধু কলিকাতাই নয়, তাঁহাকে দিল্লীও যাইতে হইবে। প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর সহিত তাঁহার আলোচনা একান্ত প্রয়োজন। জীবনের চলার পথে সহযাত্রী, অনুগামী, অনুরাগীর দল তাঁহাকে ঘিরিয়া রাখে; প্রতিটি পরিচিত ব্যক্তির সহিত তিনি মিলিত হ'ন।

বিপ্লব-জীবনের সহযাত্রী, অনুগামী ও অনুরাগীরা মহারাজকে এগুজ বিদ্যালয়ে সম্বর্দ্ধনা জানাইতে মিলিত হ'ন। প্রীতি ও শ্রদ্ধায়, সম্বর্দ্ধনা ও স্মৃতিচারণায় সভাকক্ষ উদ্বেল। দীর্ঘ বিরহের অবসানে প্রিয়-মিলনের স্পন্দনে প্রতিটি অন্তর উদ্ভাসিত ও আনন্দ-মুখর। প্রণাম ও পুষ্পে ত্রৈলোক্যনাথ বন্দিত। চিরদিনের বিপ্লবী স্তুতি-নিন্দার উর্দ্ধে—শিশু সুলভ সারল্যে, সরল হাসিতে, উত্তাপ ও উল্লাসে সবাইকে অভিবাদন, আলিঙ্গন ও আহ্বান করিলেন।

মহাজাতি সদনে বাঙলার বিপ্লবী কন্যা লীলা রায়ের স্মৃতিসভা। ত্রৈলোক্যনাথ শ্রদ্ধা জানাইতে উপস্থিত। মহাজাতি সদনে আসিয়া তিনি তীর্থে আসার অনুভূতিলাভ করেন। মহাজাতি সদন কেবলমাত্র সুদৃশ্য সৌধ নহে—ইহা ইতিহাসের এক পরম ব্যঞ্জনা। উপনিষদের অনন্ত সাগর মন্থন করিয়া যে প্রজ্ঞা ভারতের হৃদয়-কমলে সঞ্চারিত হইয়াছিল তাহারই পরশ-ধন্য রবীন্দ্রনাথ আসিয়াছিলেন ভারতের চিরজাগ্রত স্বপ্ন-বিভোর তারুণ্যের মূর্ত্ত প্রতিচ্ছবি সুভাষচন্দ্রের আহ্বানে এই সৌধের শিলান্যাস উৎসবে। প্রজ্ঞা ও পরাক্রমের সেই দিনের সেই মিলনে যে অমৃত-জীবন উদ্গত হইয়াছিল তাহাই মহাজাতি সদন। এ শুধু বাঙলার নয়, ভারতের নয়, বিশ্বমানবতার মন্ত্র-মন্দ্রিত স্বপ্ন-সার্থক ভাবনা। মহাজাতি সদন অনন্ত কবি সত্তার সহিত অনন্ত কারুকৃৎ-চর্য্যার মিলন স্থল। জ্ঞান ও কর্ম্মযোগের পীঠস্থান।

সেতারার দুর্গ প্রাকারের সানুদেশে একদিন সন্ন্যাসী গুরু

ক্ষাত্রতেজা শিবাজীকে যে দীক্ষা দিয়া গৈরিক-পতাকা হস্তে তুলিয়া দিয়াছিলেন, সেই দীক্ষা নব দ্যোতনায় নূতন পরিবেশে দিলেন যোগীর তপস্যার ঊর্দ্ধে প্রতিষ্ঠিত, স্রষ্টার আসন পাশে যাঁহার বরাসন সেই শাশ্বত কবি-মানস; তারুণ্যের অন্তরাধিপতি সুভাষচন্দ্রের জন্য বহন করিয়া আনিলেন ভারত-আত্মার মর্ম্মবাণী। আগামী দিনের পরিক্রমায় পরম ও চরম পাথেয়।

কলিকাতা নাগরিকবৃন্দের পক্ষ হইতে কলিকাতা পৌরসভা ত্রৈলোক্যনাথকে নাগরিক সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করিলেন। মনে পড়ে অতীতের কত ইতিহাস। বাঙলার পরম আপন প্রিয় নেতাদের চরণ ধূলি এই লাল বাড়ীর ধূলায় ধূলায়। তাঁহাদের কণ্ঠস্বর নীরবতায় আজও এখানে বাঙ্ময় হইয়া উঠে। অভিভূত ত্রৈলোক্য-নাথ অতীতে হারাইয়া যান।

চন্দননগর পৌরসভা আমন্ত্রণ জানাইল। চন্দননগরের অধিবাসীরা বিপ্লবী-শিরোমণিকে শ্রদ্ধা জানাইবে। চন্দননগরে মহারাজ না যাইয়া কি থাকিতে পারেন। বাঙলার বিপ্লবের ইতিহাসে চন্দননগর যে এক অক্ষয় অবিস্মরণীয় নাম। অরবিন্দের আশ্রয়দাত্রী, রাসবিহারীর পালয়ত্রী, কানাইলালের ধাত্রী, প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের প্রাণ-পুরুষ মতিলাল রায়ের বিপ্লব চেতনার সাধনক্ষেত্র, বহু তামসী রাতের দুর্য্যোগে পরম আশ্রয়, বহু প্রেরণায় উৎস, বহু চেতনার উদ্বোধক; শশাঙ্ক হাজরার প্রস্তুত আবরণ এখানেই শ্রীমণীন্দ্র নায়েকের হস্তে বোমায় রূপান্তরিত হইত। সেই চন্দননগর ডাকিয়াছে। বিপ্লব-তাপস বিপ্লব-তীর্থে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

বিভিন্ন সংবাদপত্রের পরিচালক ও কর্ম্মীগণ আপন আপন দপ্তরে সশ্রদ্ধ আমন্ত্রণ জানান। ত্রৈলোক্যনাথ সকলের সম্বর্দ্ধনা গ্রহণ করেন। সভায় উপস্থিত হন। অনাগত দিনের বাণী শোনান।

অনুশীলন সমিতির সভ্যবৃন্দের মিলন কেন্দ্র টালিগঞ্জে কুদঘাটের নিকট অনুশীলন ভবন। নিজেদের ঐতিহ্য ও সংগঠন অনির্ব্বাণ রাখিতে স্বাধীনতার পর বিপ্লবীদের সমবেত প্রচেষ্টায় এই ভবনের প্রতিষ্ঠা। মহারাজের এ যে আপন ঘর এ যে পরমপ্রিয় স্থান। তাই অনুশীলন ভবনে মহারাজ আসিলেন কেবলমাত্র অনুশীলন সমিতির সভ্যদিগের সহিত মিলন কামনায় নয়, আসিলেন অন্যান্য বিপ্লবী সংগঠনের বন্ধু ও সহযাত্রীদের প্রাণের উত্তাপ নিতে ও দিতে। বিপ্লব অনুরাগী সুধী ও বিমুগ্ধ ব্যক্তি বৃন্দের সহিত শ্রদ্ধা বিনিময় করিতে, আপন অনুগামী ও অনুরাগীদের উন্মুক্ত অন্তরের শ্রদ্ধাও প্রীতির অর্ঘ্য লইতে।

নানাকথা, নানা আলোচনা।

সদানন্দ ত্রৈলোক্যনাথ আজ মহানন্দ।

ত্রৈলোক্যনাথ বলেন—সবাই শোনে। সবাই উদ্‌গ্রীব—আকর্ণ।

দেশবন্ধুজায়া বাসন্তী দেবীকে প্রণাম করিতে হইবে। বাসন্তী দেবী কেবলমাত্র দেশবন্ধু সহধর্ম্মিনী নন, 'আপনাতে আপনি বিকাশি' স্বমহিমায় মহিমময়ী। বাঙালার বিপ্লবী ও বিদ্রোহী তারুণ্যের সর্ব্ব-অভয়দাত্রী মাতৃস্বরূপা।

ত্রৈলোক্যনাথ নফর কুণ্ডু লেনে আসিয়া উপস্থিত। শুচিস্মিতা, স্মিতহাস্যাননা বাসন্তী দেবীকে প্রণাম সারিয়া প্রথম কথা ত্রৈলোক্য নাথের মনে উদয় হইল আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলের সেই ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দের দিনগুলি যখন সহবন্দী দেশবন্ধুর জন্য বাসন্তী দেবী প্রত্যহ স্বহস্তে আহার প্রস্তুত করিয়া পাঠাইতেন। সে খাদ্য ত্রৈলোক্যনাথও আস্বাদ করিয়াছেন। তাই প্রথম কথাই বলিলেন, "মা আজও আপনার হাতের ডিম-বেগুনের তরকারীর স্বাদ ভুলতে পারি নি।"

সন্তানের প্রশংসায় মাতা হাসিয়া জানাইলেন—"ও রান্নাটা আমাদের ঘরোয়ানা।"

অশীতিপর বৃদ্ধ হইয়াও ত্রৈলোক্যনাথ যৌবনের সেই মধুস্মৃতি ভোলেন নাই—পরম আগ্রহে অন্তরে লালন করিয়াছেন।

নেতাজী-ভবনে সম্বর্দ্ধনা। আজাদ হিন্দ ফৌজের সর্ব্বাধিনায়কের প্রতিমূর্ত্তির সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। বয়ঃকনিষ্ঠ হইলেও ভারত-ইতিহাসের চরম অধ্যায়ের অধিনায়ককে যুক্ত করে প্রণাম করিলেন। কত স্মৃতি, কত রোমাঞ্চ-রণিত দিন, কত আশা, কত স্বপ্ন, কত নিষ্ঠা, কত তেজ, কত বিশ্বাস তাঁহার স্মৃতি পটে প্রতিফলিত হইয়া চলে। তরুণ সুভাষচন্দ্রের স্বপ্ন-দীপ্ত মুখখানি বার বার চোখের সামনে ভাসিতে থাকে। মান্দালয়ের দিনগুলি সুরভি ছড়ায়। নির্ব্বিকার বিপ্লবী স্থাণুর মত দাঁড়াইয়া থাকেন।

রবীন্দ্র ভারতীতে সম্বর্দ্ধনা। তরুণের দল প্রাণের শ্রদ্ধার্ঘ লইয়া ঘিরিয়া আছে। রবীন্দ্র-জীবন ধন্য লালবাড়ী উদাস ভাবে আজও দাঁড়াইয়া আছে। রবীন্দ্রস্মৃতিপূত কক্ষগুলিতে ত্রৈলোক্যনাথ ঘুরিতেছেন। মনে জাগিতেছে সেই দিনের দুঃখঝরা তামসী রাতের বিচিত্র কাহিনী। সেদিন রবীন্দ্রনাথের অমৃত-স্বরূপ বাণী পথ দেখাইয়াছে, আলোর গান শোনাইয়াছে, আশায় উদীপ্ত করিয়াছে, উৎকণ্ঠায় আগ্রহ দিয়াছে। কবি-বিপ্লবী বার বার পথ হারানোর লগ্নে তাঁহার গানে পথের সন্ধান দিয়াছেন।

বিপ্লব-তাপস সেই মহাকবির চরণে প্রাণের অর্ঘ্য অর্পণ করিলেন। ঘরে ঘরে ঘরোয়া বৈঠক। দুই চারি জন করিয়া আত্মার আত্মীয় অনুগামীরা উপস্থিত থাকেন। নানা কথা, নানা আলোচনা। ত্রৈলোক্যনাথ পূর্ব্ব বাঙলায় আসন্ন ঐতিহাসিক ইঙ্গিতের সন্ধান দেন। ঘোষণা করেন, আগামী নির্ব্বাচনে ভেদাভেদের কলুষমুক্ত পূর্ব্ব বাঙলার বিপ্লবী তারুণ্য বিপুল প্রত্যয়ে জয়লাভ করিবে।

দৃঢ় প্রত্যয়ে ব্যক্ত করেন—"মুজিব খেল্ দেখাবে।"

স্বাধীনতার পর মহাভারতের সমাজ জীবনের ক্রমবর্দ্ধমান অবক্ষয়ে সদ্‌বুদ্ধি প্রণোদিত সাধারণ মানুষ উদ্বিগ্ন, বিভ্রান্ত। সোচ্চার প্রচার সর্ব্বস্ব রাজনীতির তাণ্ডবে সবাই দিক্‌ভ্রান্ত, সংশয়াকুল। তাই প্রশ্নের পর প্রশ্ন আসে—পথ কি ? কর্ত্তব্য কি ?

ত্রৈলোক্যনাথ প্রত্যয় প্রদীপ্ত কণ্ঠে জানান বৃত্তকে সম্পূর্ণ কর। মানুষ গড়ার যে সাধনায় একদিন বাঙালী চেতনা উদ্দীপিত হইয়াছিল, পরদেশী রাজশক্তির শাসনাবসানের পর আবার নূতন করিয়া মানুষ গড়িতে হইবে। যে আত্মত্যাগ, যে স্বার্থবিবর্জ্জিত মানসিকতায় তরুণের দল একদিন গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে দলাধিপতির নির্দ্দেশে সুনিয়ন্ত্রিত, সুশৃঙ্খল ও সংহত হইয়াছিল, আবার সেই নিষ্ঠায় সেই প্রেরণায় নীরবে গ্রামে গ্রামে নূতন প্রজন্ম গড়িয়া তুলিয়া তুলিতে হইবে।

কে করিবে ? নেতা কোথায় ?

'করিবে সবাই, তুমি, আমি।' ত্রৈলোক্যনাথ পরম বিশ্বাসে ব্যক্ত করেন—এত আত্মলিপ্সা, আত্ম প্রতিষ্ঠার নির্ল্লজ্জ প্রয়াসের মধ্যেও মানুষ মরে নাই, আজও মানুষ আছে, আজও ত্যাগ আছে, বিশ্বাস আছে, স্বপ্ন আছে। সৃষ্টি জুড়িয়া অগ্নির অবস্থান। আগুন চতুর্দ্দিকে তবে নয়ন-গোচর নয়। ঘর্ষণে তার জন্ম। তাই পাথরে পাথরে ঘর্ষণে অগ্নির স্ফুলিঙ্গ, লৌহে লৌহে ঘর্ষণে অগ্নির স্ফুলিঙ্গ, কাঠে কাঠে ঘর্ষণে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ। সামান্য দিয়াশলাই কাঠি—তাহারও ঘর্ষণে অগ্নি স্বপ্রকাশ।

সুরু করিতে হইবে—সারা পথ ধরিয়া আপনি আসিবে। ত্রৈলোক্যনাথ তাই সংগঠনের উপর জোর দেন। নিজেকে নিজের পরিবেশকে নিজেরাই গড়িতে হইবে। সকলে মিলিত হইলে ও আন্তরিক সার্ব্বিক চেষ্টায় দেশব্যাপী—কর্ম্মযজ্ঞের পূর্ণ শিখা জ্বলিয়া উঠিবে।

বিপ্লবী নেতৃত্বের সংগঠন-আদর্শের নিদর্শন বনগাঁওয়ের অদূরবর্ত্তী মছলন্দপুর রেল ষ্টেশনের সংলগ্ন দক্ষিণ চাতরা গ্রামখানি। জন বিরল রিক্ত পরিবেশে স্বাধীনতার পর বিপ্লবীনায়কগণ এইখানে নিজেদের কর্ম্মযজ্ঞ সুরু করিলেন। তাঁহাদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ও নিষ্ঠায় ধীরে ধীরে গ্রামখানি শ্রীমণ্ডিত হইয়া উঠিল। মানুষ গড়ার প্রচেষ্টায় বিদ্যালয় স্থাপিত হইল। চিকিৎসা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হইল। কৃষি কর্ম্মের ব্যবস্থা হইল। বাঙলার পল্লীশ্রী পুনর্জীবিত হইল। রবীন্দ্রমোহন সেন, যতীন রায় (ফেগু রায়) বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি নায়কগণ এই কর্ম্ম যজ্ঞের হোতা।—চাতরা তাই বিপ্লবীদের মিলনকেন্দ্র, ত্রৈলোক্যনাথ চাতরার উদ্দেশ্যে রওনা হইলেন।

সেখানে রাত্রিবাস করিতে হইবে।

ত্রৈলোক্যনাথ রিষড়ায় যাইবার অভিলাষ প্রকাশ করিলেন। রিষড়ার হাসপাতাল তাঁহাকে দেখিতেই হইবে। সে যে তাঁহার মনের অপূর্ণ বাসনার সার্থক রূপায়ণ। একদিন চট্টগ্রামের পার্ব্বত্য পরিবেশে অসুস্থ বিপ্লবীদের জন্য আরোগ্য নিকেতন নির্ম্মাণের যে বাসনা তাঁহার মনে উদয় হইয়াছিল তাহাকে রূপ দিতে তিনি পারেন নাই, তাই তাঁহার ক্ষোভ রহিয়া গিয়াছে। সেই ক্ষোভ মিটিয়াছে তাঁহার অনুগামী ও অনুরাগী বিপ্লবীদের প্রচেষ্টায় নির্ম্মিত ও পরিচালিত এই 'হাসপাতাল' পরিদর্শনে। এখানে সেবার মানসিকতা অর্থের হিসাব নিকাশের যাঁতাকলে নীরস হইয়া পড়ে নাই। মানবিকতা এখানে লাঞ্ছিত হইয়া দৈনন্দিন গতানুগতিকতায় সম্ভ্রম ভ্রষ্ট হয় নাই। পরিচালক ও কর্ম্মীর দল এখনও সেবাব্রতের আদর্শে বিশ্বাসী ও আসক্ত।

আনন্দোৎফুল্ল ত্রৈলোক্যনাথ ঘুরিয়া ঘুরিয়া হাসপাতাল পরিদর্শন করেন।

হাসপাতাল সম্মুখেই ব্রহ্মানন্দ কেশব সেনের স্মৃতিপুত: "সাধন কানন" বর্ত্তমানে তাহারই এক বিপ্লবী অনুগামীর বাসভূমি। উদ্যানে নব প্রতিষ্ঠিত মন্দিরে পার্থসারথির মূর্ত্তি। অশ্ববল্গাঘাতে পুরুষোত্তম অর্জ্জুনকে গীতার উপদেশ দিতেছেন।

'সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং-ব্রজঃ'। ত্রৈলোক্যনাথ আভূমি প্রণতঃ হইলেন।

আর দেরী নয়—দিল্লী যাত্রা করিতে হইবে। প্রিয়ভাজনদের অনুযোগ, প্রীতিস্পদদের অনুরোধ ও ডাক্তারের অনুশাসন সত্বেও ত্রৈলোক্যনাথ দিল্লী যাইতে স্থির সঙ্কল্প।

এই অসুস্থ শরীর কি এত পরিশ্রম সহ্য করিতে পারিবে। হৃদ্‌যন্ত্রের বর্ত্তমান অবস্থা ডাক্তারি হিসাব নিকাশের বহির্ভূত।

কখন না জানি কী ঘটিয়া যায়।

ত্রৈলোক্যনাথ হাসেন, শুধু জানাইয়া দেন শেষ কাজ শেষ করিতে হইবে। কী যে কাজ কেহই বুঝেন না। মন্ত্রগুপ্তির আজন্ম সাধক কাহাকেও কোনও ইঙ্গিত দেন না।

যাত্রার দিন আসিল। হাওড়া ষ্টেশন লোকে লোকে, ফুলে ফুলে পূর্ণ। দিল্লী মেল দিল্লীর নির্দ্দেশে প্রথম শ্রেণীর কামরায় তাঁহার আসন সংরক্ষিত কিন্তু তিনি পূর্ব্বাহ্নেই আয়োজিত তৃতীয় শ্রেণীর শয়ন কামরায় আসিয়া উঠিলেন। আজীবনের সংগ্রামী বিলাসে অভ্যস্ত নন, ইচ্ছুকও নন। সাধারণের নেতা তাই সাধারণের সঙ্গে যাত্রা করিলেন। জানাইয়া গেলেন আবার আসিবেন।

হুইশিল বাজিল; গার্ডের হাতের সবুজ নিশান সঙ্কেত দিল; মন্থর গতিতে ট্রেন চলতে সুরু করে।

জনতা অশ্রু সজল নয়নে বিলীয়মান কাল রেখার পানে তাকাইয়া থাকে।

চেষ্টা সত্ত্বেও ত্রৈলোক্যনাথের ঘুম আসে না। আধাজাগরণে তিনি চলিতেছেন। কামরায় সকল যাত্রী গভীর রাতে সুষুপ্ত শুধু ত্রৈলোক্যনাথ জাগিয়া আছেন। অতীতের যত ছবি বর্ত্তমানে রূপ পরিগ্রহ করিয়া চোখের সম্মুখে মিছিল করিয়া চলিয়াছে।

কত ঘটনা কত স্পন্দন; কত রোমাঞ্চ কত বন্ধন। কত চরিত্র কত মুখ। কত আশাহত স্বপ্ন। কত দুর্জ্জয় সঙ্কল্প, কত গভীর প্রত্যয়। ত্রৈলোক্যনাথ ভাবিতে থাকেন। সমাবর্ত্তিত চক্রকুলের ঝনৎকারে জানাইতেছে—আমার সংস্পর্শে জেগে ওঠে ঘুমন্ত নিস্তব্ধ পরিবেশ, প্রাণচাঞ্চল্যে চলিত হয় তারা; কলরোল ওঠে, কলরব জাগে। আমি চলি, আমার সাথে কেউ ঘর ছাড়ে, কেউ ঘরে ফেরে। আমি নির্ব্বিকার।

রাতের অন্ধকার ভেদ করিয়া গাড়ী ছুটিয়া চলে। সম্মুখে, পশ্চাতে, দক্ষিণে, বামে মসীলিপ্ত তামসী রাত্রি। ভ্রুক্ষেপ নাই, ভয় নাই গাড়ী ছুটিয়াছে।

চলার মাঝে ইঞ্জিনের সাঙ্কেতিক ধ্বনি। কখনও তীক্ষ্ণ, কখনও গম্ভীর, কখনও পঞ্চমে, কখনও সপ্তমে।

সে গভীর গম্ভীর—বিশ্ব প্রকৃতিকে হতচকিত করিয়া বলিতেছে, আমি চলি। কখনও যাই, কখনও আসি। যাওয়া আসায় আমার কোন প্রভেদ নাই। দিনের আলোয়, রাতের অন্ধকারে আমার সমানগতি। চলি খরদৃপ্ত গ্রীষ্মের আতপ্ত বাতাস অঙ্গে ধারণ করে, চলি অবিশ্রান্ত বর্ষণে বজ্র ও বিদ্যুতের লীলায় লীলায়, চলি শীতের জড়তায়।

আমাকে চেনে না কে? রাতের নিদ্রায় আচ্ছন্ন মানুষ আমার ঝঙ্কারে জাগে, জানে আমি চলেছি। দিনের আলোয় পথ-প্রান্তে মাঠের বিরাট বট গাছটায় দোলানো দোলায় যে রাখাল বালক পরম পরিতৃপ্তিতে দুলিতে দুলিতে থামিয়া গেল. ও ত আমাকে

প্রত্যহই দেখিতেছে তবুও নিষ্পলক আঁখি তাকাইয়া থাকে। গ্রাম প্রান্তের পুষ্করিণীতে ওই যে কৃষক বধূ আবক্ষ জলে দাঁড়াইয়া পুণ্য কুম্ভে জল ভরিয়া জল ফেলিতেছে ও ত আমার জন্যই অপেক্ষা করিতেছে। আমাকে দেখিবার পরই তবে গৃহে ফিরিবে।

গ্রামান্তে ওই যে আটচালার ঘরে যুথবদ্ধ বালকের দল সমস্বরে পাঠ মুখস্থ করিতেছে, উহাদেরও মন পড়িয়া আছে কখন আমি উহাদের ডাক দিয়া যাইব।

গঞ্জের সাহা মুদির দল তাকাইয়া আছে আমার প্রত্যাশায়। আমি চলিয়া গেলে তবেই ওরা দোকানের ঝাঁপ বন্ধ করিবে।

সবাই আমাকে চেনে কারণ আমি চলি······

আমার সাথে যারা—তারাও চলে।

"যেদিন সুদীর্ঘ রাত্রি পরে
সদ্য জেগে উঠে কাল সংশোধন করে
আপনারে, সে দিন দারুণ দুঃখ দিন।"

-রবীন্দ্রনাথ

সমাপ্ত